৮ম জাতীয় সম্মেলন ২০২২

বিশেষ প্রকাশনা

পাঁচ দশকের বাংলাদেশ বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

পঞ্চাশের পথচিত্র

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

‘পাঁচ দশকের বাংলাদেশ’ বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

পঞ্চাশের পথচিত্র

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সুজন-এর ৮ম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা
'পাঁচ দশকের বাংলাদেশ' বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলন

পঞ্চাশের পথচিত্র

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক
আনোয়ার হোসেন ফরহাদ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
নাবিলা খান
অলিউল ইসলাম
সৈয়দা আহসানা জামান (এ্যানী)
শশাঙ্ক বরণ রায়
সোহেল রানা

প্রচ্ছদ
সাইফুল সারওয়ার

প্রচ্ছদের ছবি
আহসানুল কবির ডলার

প্রকাশকাল
জুন ২০২২

শুভেচ্ছা মূল্য : ন্যূনতম ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক
২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৮১১২৬২২, ০২-৮১২৭৯৭৫
ওয়েবসাইট : www.shujan.org I www.votebd.org

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫
বদিউল আলম মজুমদার

বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসন এবং শ্রম অভিবাসীর বাস্তবতা ৮
সি আর আবরার, ইনজামুল হক, নাজমুল হক

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের নারী ১৩
সাজেদা আমিন, অলিউল ইসলাম

৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : অগ্রগতি ও সংকট ১৯
ড. এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : জাতীয় সংসদ ২৪
নিজাম আহমদ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার : প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ ২৮
ড. তোফায়েল আহমেদ

ব্যাংকের খেলাপি ঋণকে পুরোপুরি কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলা হয়েছে ৩৫
ড. মইনুল ইসলাম

বুদ্ধিবৃত্তির পঞ্চাশ বছর : নতুন ভ্রমে ঢাকা পুরাতন ভ্রম ৪০
সলিমুল্লাহ খান

বাংলাদেশে দুর্নীতি ও তার প্রতিকার ৪৬
মুশতাক হুসেন খান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা : পরিচয় ও প্রান্তিকতার নানা দিক ৪৯
ফিলিপ গাইন

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাস্থ্যখাতে অর্জন ৫৪
ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথ ৫৯
ড. রওনক জাহান

৫০ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কতটা এগুলো বাংলাদেশ! ৬২
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম : আন্তঃসম্পর্ক ৬৯
রোবায়েত ফেরদৌস

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ প্রসঙ্গে ৭১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জনপ্রশাসন ৭৪
আলী ইমাম মজুমদার

সুশাসন অর্জনে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৭৬
বদিউল আলম মজুমদার

বাংলাদেশের তরুণদের গল্প ৮১
মাহবুব মজুমদার

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : সংবিধান ৮৫
বিচারপতি এম. এ মতিন

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : নগরায়ণ ৯০
আকতার মাহমুদ

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : তৈরি পোশাক শিল্প ৯৬
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশে দল-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ ১০০
আলী রীয়াজ

বাংলাদেশের ৫০ বছর : উন্নয়ন-বিস্ময়ের রহস্য সন্ধানে ১০৬
বিনায়ক সেন

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ৫০ বছর ১১১
ড. মোহাম্মদ হাননান

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : পরিবেশ ও জলবায়ু ১১৮
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

বাংলাদেশে ধর্ম, গণতন্ত্র ও জঙ্গিবাদ : কীভাবে এই পর্যায়ে এলাম ১২১
মোবাশ্বার হাসান

সম্পাদকীয়

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। গত বছর এ উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সিপিডি-এর মতো প্রতিষ্ঠান, এমনকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাশ ইনস্টিটিউটও এ উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করেছে। কিছু আন্তর্জাতিক জার্নাল প্রকাশ করেছে বিশেষ সংখ্যা। আমরাও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর পক্ষ থেকে ২৮ জন বিশেষজ্ঞের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি বিশেষ প্রকাশনা 'পঞ্চাশের পথচিত্র' প্রকাশের আয়োজন করেছি।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগুলেও ১৯৭১ সালে, স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রার শুরুতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন না। দারিদ্র্য ও নানা প্রকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে নিয়ে আশাবাদী হওয়াটাও সহজ ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা ও মুক্তিযুদ্ধকালে দেশব্যাপী সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিও অনেককে আশাবাদী হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বস্তুত শুরুতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক, যদিও আমাদের পূর্বসূরীদের একটি গৌরবোজ্জল অতীতের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে বহু হতাশার মধ্যে কিছু ব্যক্তি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা হলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ্যান কুগার। তিনি আশির দশকে *দ্য ওয়াল স্ট্রিট* জার্নালকে বলেছিলেন, "There is an outside chance that Bangladesh may do the Korea thing–they had nothing, Bangladesh has nothing." আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ অনেক ভালো করেছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো চমক দেখাতে পারেনি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থনৈতিকভাবে দুটি দেশ প্রায় একই অবস্থায় থাকলেও–উভয়েরই মাথাপিছু আয় ১০০ মার্কিন ডলার এবং জিডিপির শতাংশ হিসেবে রপ্তানী আয় ও বিনিয়োগের একই হার–২০২১ সালে দাক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় এসে দাঁড়িয়েছে ৩৫,০০০ ডলারে, আর বাংলাদেশের মাত্র ২,৫০০ ডলারে। অর্থাৎ গত ৫০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় যেখানে বেড়েছে ৩৫০ গুণ, সেখানে বাংলাদেশের বেড়েছে মাত্র ২৫ গুণ। তবুও অনেক দেশের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেক সফলতা দেখিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। বিশেষত মানব উন্নয়ন সূচকে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য অমর্ত্য সেনেরও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে ব্যাপক "ডেমোক্রেটিক ডেফিসিট" (গণতান্ত্রিক ঘাটতি), "গভার্নেন্স ফেইলিউর" (শাসন প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতা) ও নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও, যা বাংলাদেশের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এসকল প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্জনকে প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ 'ডেভেলাপমেন্ট সারপ্রাইজ' বা "বাংলাদেশ ধাঁধা" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পেছনে সরকারের নীতি-কাঠামো ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে, যা বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক স্বল্পশিক্ষিত নারীদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। আমাদের বাড়তি জনসংখ্যা থেকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের' সুবিধা ব্যাপকভাবে অর্জন করতে না পারলেও, এ জনসংখ্যার স্বল্পশিক্ষিতদের একটি অংশকে বিদেশে পাঠিয়ে আমরা বিরাট পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পেরেছি, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে। সরকারের উদ্যোগে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিরাট বিরাট অবকাঠামো প্রকল্পও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, যদিও প্রকল্প গ্রহণে অদূরদর্শীতা, অনিয়ম, অপচয়, দুর্নীতি, প্রকল্প ব্যয়ের লাগামহীন বৃদ্ধি ও আপনজনদেরকে নানাভাবে ফায়দা প্রদান এবং অনেক ক্ষেত্রে অনাকর্ষণীয় হারে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের কারণে বড় বড় প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ এবং নানামুখী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে, যদিও সম্প্রতিককালে এগুলো নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গত ৫০ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতা দেখিয়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধ ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা

অর্জিত হয়েছিল, যার পেছনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এর আমাদের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'। আমাদের সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রই ছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। এতে বঙ্গবন্ধুর "জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার" অনুমোদন দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এই ঘোষণাপত্রে "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র ঘোষণা" করা হয়। অর্থাৎ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার হল বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনের আমাদের প্রথম সংবিধান স্বীকৃত আদর্শ ও মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ৭ই মার্চের ভাষণে–"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বহু প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুক্তির স্বাদ বাংলাদেশের জনগণ আজও পায়নি। সংবিধানের মূলনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের পেছনের মূল্যবোধগুলি লিপিবদ্ধ হলেও, বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা আমাদের শাসকদের অনাগ্রহের কারণে এগুলো উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। ফলে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত দিনদিন মুক্তি অর্জনে স্বাধীনতার এসব মূল্যবোধ ও অঙ্গীকার যেন আরও সুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে। গত ৫০ বছরের আমাদের শাসক শ্রেণি কি এর দায় এড়াতে পারবে?

গত ৫০ বছরেও বাংলাদেশের জনগণের মুক্তি অর্জিত না হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হল, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি ভূখণ্ড পেলেও আমাদের জনগণ সেই ভূখণ্ডের নাগরিক তথা মালিক হতে পারেনি–অর্থাৎ রাষ্ট্রের ওপর তাদের মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি–যদিও আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে জনগণকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বরং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক আমলের প্রভু-প্রজার সম্পর্কই আমাদের দেশে অব্যাহত রয়েছে–বিরাজমান প্রভুত্বের কাঠামো আমরা ভাঙতে পারিনি–যার ধারাবাহিকতায় শুরু থেকেই আমাদের শাসক শ্রেণি জনগণের প্রতি প্রজার মতো ব্যবহার করেছে। দীর্ঘমেয়াদী ঔপনেবিশিক শাসনের ফলে আমাদের জনগণ নিজেরাও প্রজার মতো আচরণ করেছে, যা আমাদের সমাজে একটি নতুন পেট্রোন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের উদ্ভব ঘটিয়েছে। ফলে আমাদের সাধারণ জনগণের পাওয়া যেকোনো সরকারি সেবা ও সহায়তা সচরাচর তাদের কাছে পৌঁছে কোনো পেট্রোন বা নব্য প্রভুর–যথা, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোনো প্রতিপত্তিশালীর–বদান্যতায়, নিজেদের অধিকার বলে নয়। আর এ পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী আমাদের জনগণের মধ্যে নাগরিকত্ববোধের অভাব, যা সৃষ্টি করতে স্বাধীনতার শুরু থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। এমকি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও নাগরিকত্ববোধ সৃষ্টির কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি, যদিও স্বল্পসংখ্যক সমাজ সচেতন নাগরিক যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীকে অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা দিতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও এ নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কে নিয়োজিত হননি, যার থেকে কিছু দিকনির্দেশনা সৃষ্টি হতে পারত।

একটি রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ সৃষ্টি রাষ্ট্র গঠনের জন্য তথা রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালনার এবং সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য। কারণ নাগরিকত্ববোধ থেকেই নাগরিক অধিকার উৎসারিত হয় এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। আর নাগরিক অধিকারবোধ সৃষ্টি হলেই জনগণ সক্রিয় ও সোচ্চার হয় এবং তারা শাসকদের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা দাবি করতে পারে এবং তা করে। তারা রাষ্ট্রের কাছে তাদের প্রাপ্য সেবা ও অন্যান্য এন্টাইটেলমেন্ট চাইতে পারে এবং এ ব্যাপারে সক্রিয়তা প্রদর্শন করে। আর নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হলেই তারা অন্যায়, অসঙ্গতি ও অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে পারে। এর মাধ্যমেই তারা রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা রাখে রাখতে পারে। তাই রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনগণের নাগরিকত্ববোধের ভিত্তিতে সক্রিয়, স্বেচ্ছার ও প্রতিবাদী হওয়া আবশ্যক। এর জন্য আরও আবশ্যক তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। আর নাগরিকত্ববোধের ভিত্তিতে জনগণ সচেতন, সক্রিয় ও স্বোচ্চার হলেই রাষ্ট্রে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যার মাধ্যমে সুগম হতে পারে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ। তাই রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বুদ্ধিভিত্তিক বিতর্কে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সমাজ সচেতন নাগরিক সমাজ, যারা জনগণের মধ্যে নাগরিকত্ববোধ সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে সচেতন, সক্রিয় ও স্বোচ্চার করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার শুরু থেকেই আমাদের শাসকদের প্রজ্ঞাহীনতা ও অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নতজানু আচরণ এবং আমাদের নাগরিক সমাজের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নাগরিত্ববোধ সৃষ্টির

কোনো কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয়নি, যদিও অনেক বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে জনগণকে নানা ধরনের সেবা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টির নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে হারিয়ে যায় সেসব আদর্শ ও মূল্যবোধ, যার ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। নাগরিকত্ব ও নাগরিক সচেতনতাবোধের অভাবে জনগণ হয়ে পড়ে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অনেকটা নীরব ও নিষ্ক্রিয়। আর জনগণের সে অসেচতনতা ও প্রতিবাদহীনতারই সুযোগ নেয় আমাদের চতুর ও স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা এবং কেড়ে নেয়, অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করে ও নানা কালাকানুন সৃষ্টির মাধ্যমে, আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার। ধ্বংস করে ফেলে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। বিভক্ত করে আমাদের জনগোষ্ঠীকে নানা সিম্বল ও স্লোগানের ভিত্তিতে। প্রতিষ্ঠা করে ফেলে এক কর্তত্ববাদী কোটারি/গোষ্ঠীতন্ত্র এবং লিপ্ত হয় সীমাহীন লুণ্ঠনে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করলেও বাংলাদেশ আজ যেন নীতি-আদর্শ বিবর্জিত এক পথহারা জাতিতে পরিণত হয়েছে। তবে এ অবস্থায় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রযাত্রা দীর্ঘমেয়াদীভাবে টেকসই রাখা যাবে কি না তা নিয়ে আজ অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আমাদের এ বিশেষ প্রকাশনায় বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জাতি হিসেবে গত ৫০ বছরে আমরা কোথায় পৌঁছেছি তার ওপর লিখেছেন। এসব লেখনিতে তাঁরা তুলে ধরেছেন এ সময়কার আমাদের অনেক সফলতার কাহিনী। তুলে ধরেছেন অনেক অসফলতার কথাও। অনেকে আলোকপাত করেছেন অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যের ওপর। আবার কেউ কেউ কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতে পৌঁছতে বর্তমান করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি যে, এ লেখাগুলো দেশের সাধারণ জনগণকে, বিশেষত সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সদস্যগণকে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ কোথায় পৌঁছেছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা, একই সঙ্গে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবে।

এ বিশেষ প্রকাশনায় যে ২৮ জন ব্যক্তি লিখেছেন তাঁরা শুধু আমাদের সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই নন, তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষও। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে এ লেখাগুলো তৈরি করার জন্য আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা লেখকদের নামের অদ্যাক্ষর ব্যবহার করে লেখাগুলো সাজিয়েছি।

এ প্রকাশনাটির প্রথম ধারণা আসে সুজনের কোষাধক্ষ সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ারের কাছ থেকে। তিনি এটি প্রকাশনার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন, যার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। একইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সকল সহকর্মীকে, যারা এ প্রকাশনাটি প্রস্তুতের ব্যাপরে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

বদিউল আলম মজুমদার

বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসন এবং শ্রম অভিবাসীর বাস্তবতা

সি আর আবরার, ইনজামুল হক, নাজমুল হক

১. ভূমিকা

অভিবাসন মানব সভ্যতায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার ইতিহাস মানব সভ্যতার মতোই সুপ্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কখনো জীবিকার সন্ধানে আবার কখনো প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক নানা কারণে দেশ দেশান্তরে অভিবাসন করে আসছে। যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রম অভিবাসন শুরু হয় ১৯৭৬ সালে, যা যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৮০-এর দশকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রথম দিকে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন মূলত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক হলেও পরে ক্রমান্বয়ে তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৬০-এর শেষে এবং ১৯৭০-এর শুরুতে জ্বালানি তেলের নাটকীয় মূল্য বৃদ্ধি (Oil Boom) তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোয় অর্থনীতিতে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে, ফলে দেশগুলো অবকাঠামো খাতসহ নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এতে করে সেই দেশগুলোতে স্বল্প মূল্যের শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি করে, কিন্তু নিজস্ব শ্রমিক স্বল্পতার কারণে অভিবাসী শ্রমিকদের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকরা উন্নত ও নিশ্চিত জীবিকার আশায় অভিবাসী হিসেবে সেই দেশগুলোতে অভিবাসন শুরু করে। এছাড়াও ১৯৭০-এর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও অভিবাসন শুরুর এবং বৃদ্ধির অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

২. বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসন

২.১. পুরুষ শ্রম অভিবাসন

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে মাত্র ৬ হাজার ৮৭ জন শ্রমিকের অভিবাসনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রম অভিবাসন শুরু হলেও অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ এক দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২১ লাখ শ্রমিক অভিবাসন করেছেন, যা ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ সালে হওয়া মোট অভিবাসনের তিনগুণ। ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক (১০ লক্ষেরও অধিক) শ্রমিক বিদেশ গমন করেন, কিন্তু করোনা মহামারির প্রভাবে ২০২০ সালে তা মাত্র ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬৯ জনে নেমে আসে। যদিও ২০২০ সালের শেষে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং অভিবাসনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ২০২১ সালে মোট অভিবাসীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ২০৯ জন। তবে বাংলাদেশ সরকার অভিবাসিত শ্রমিকের সংখ্যা লিপিবদ্ধ রাখলেও ফিরে আসা অভিবাসীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে না, যার ফলে বর্তমানে কতজন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক গন্তব্য দেশে কর্মরত আছেন তার সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব না। সম্প্রতি আইওএম (International Organization for Migration- IOM) থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী অভিবাসী মিলিয়ে মোট ৭৪ লক্ষ বাংলাদেশি বিদেশে অবস্থান করছেন।[১]

গন্তব্য দেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বড় অংশই অদক্ষ হিসেবে অভিবাসন করে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রকাশিত তথ্য মতে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিকদের প্রায় ৪৬.৫২ শতাংশ শ্রমিকই অদক্ষ।[২] দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩৪.৫৪ শতাংশ এবং স্বল্প-দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫.৫৪ শতাংশ। সম্প্রতি রামরু প্রকাশিত এক রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে যে, ২০২১ সালে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রায় ৭৫.২৪ শতাংশ শ্রমিকই অদক্ষ হিসেবে অভিবাসন করে, যেখানে স্বল্প দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৩.২৮ শতাংশ এবং দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ২১.৩৩ শতাংশ।[৩]

২.২. নারী শ্রম অভিবাসন

পুরুষ শ্রম অভিবাসন ১৯৮০-এর দশকে শুরু হলেও ২ হাজার ১৮৯ জন নারী শ্রমিকের অভিবাসনের মধ্য দিয়ে নারী শ্রম অভিবাসন শুরু হয় ১৯৯১ সালে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত অদক্ষ নারী শ্রমিকের অভিবাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, যার ফলে এই সময়ে শুধুমাত্র দক্ষ নারী শ্রমিকই অভিবাসন করতে পারতেন। তবে, ২০০৪ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে নারী অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট নারী অভিবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার, যা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার প্রথম ৫ বছরেই (২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত) প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে মোট নারী অভিবাসীর

[১] বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০২১ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, রামরু
[২] জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
[৩] বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০২১ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, রামরু

সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩ হাজারের অধিক। পরবর্তীতে নারী অভিবাসীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এ যাবতকালে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী শ্রমিক অভিবাসন করেছেন ২০১৭ সালে, যা সংখ্যায় ১ লাখ ২১ হাজার ৯২৫ জন এবং ২০২১ সালে মোট নারী অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার ১৪৩ জন।

২.৩. প্রধান গন্তব্য দেশ

বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসনের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, এবং বাহরাইন এদের মধ্যে অন্যতম। অভিবাসনের শুরু থেকেই সৌদি আরব ছিল পুরুষ ও নারী উভয়ই অভিবাসী শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য দেশ। ২০২১ সালে মোট শ্রম অভিবাসনের প্রায় ৭৪ শতাংশ অভিবাসনই হয় সৌদি আরবে। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কেন্দ্রিক কয়েকটি দেশে (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া) বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকরা জীবিকার উদ্দেশ্যে অভিবাসন করে আসছে।

৩. প্রবাসীর পাঠানো রেমিটেন্স

অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ বা রেমিটেন্স স্বল্পবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে, যা করোনা মহামারির সময়েও লক্ষ করা গেছে।[৪] বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্রম অভিবাসনের ওপর নির্ভরশীল, কারণ প্রতিবছর শ্রম বাজারে প্রবেশ করা শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশ অভিবাসনের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে এবং অভিবাসীর পাঠানো রেমিটেন্স হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি স্থিতিশীল উৎস। যার ফলে, রেমিটেন্সকে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ অন্যান্য যেকোনো রপ্তানিযোগ্য শিল্পের থেকেও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ২৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে অর্জন করে, যা পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় যা ২০০৯ সালে হয় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বিশ বছরের (২০০১ থেকে ২০২১ সাল) হিসেবে শুধুমাত্র ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে রেমিটেন্স প্রাপ্তির পরিমাণ ঋণাত্মক ছিল। ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনা মহামারির সময়েও বাংলাদেশের রেমিটেন্সের প্রবাহ ছিল গতিশীল যদিও সেই সময়ে অভিবাসী ফেরত পাঠানো, গন্তব্য দেশে অভিবাসী শ্রমিক কর্মহীন হওয়া, এবং অভিবাসী শ্রমিকের মজুরি চুরির মত ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। মহামারীর সময়ে রেমিটেন্সের এই প্রবাহের অন্যতম প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ছিল- বৈধভাবে (হুন্ডির অনুপস্থিতির কারণে) রেমিটেন্স পাঠানো, অভিবাসী শ্রমিক গন্তব্য দেশে জমানো সমুদয় অর্থ দেশে পাঠানো ইত্যাদি।

৪. অভিবাসন সম্পর্কিত আইন ও সরকারি প্রতিষ্ঠান

বিগত চার দশকে অভিবাসনের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে আইন, নীতিমালাও তৈরি হয়েছে। ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামক পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি, দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি নানাবিধ অভিবাসীর জন্য কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশি ও প্রবাসী কর্মীদের তথ্য, সহযোগিতা সংক্রান্ত কার্যক্রমও মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে থাকে।

১৯৭৬ সালে জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) যাত্রা শুরু করে যা বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিভাগ। বিএমইটি বাংলাদেশ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক হিসবে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নকল্পে কাজ করছে। একই সাথে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (Probashi Kollyan Bank Act-2010) প্রতিষ্ঠা করে। ১ বিলিয়ন টাকা মূলধন (যার ৯৫ ভাগ এসেছে প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড থেকে এবং বাকি ৫ ভাগ এসেছে বাংলাদেশ সরকার হতে) নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং দুর্যোগকালীন সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নাস ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয় যাতে করে ওয়েজ আর্নাস ওয়েলফেয়ার ফান্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরবর্তীতে ওয়েজ আর্নাস ওয়েল ফেয়ার বোর্ড এ্যাক্ট-২০১৮ পাস করা হয় ২০১৮ সালে।

[৪] Impact of Migration on Poverty and Local Development in Bangladesh, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৫৩

এছাড়াও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) অফিসের মাধ্যমে বিএমইটি প্রবাসী শ্রমিকদের বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে মোট ৪২টি ডেমো অফিস বিভিন্ন জেলা শহরে কাজ করছে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের সেবা প্রদান করছে। ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের (টিটিসি) মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক তিন দিনের ট্রেনিং (গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ) ছাড়াও প্রায় ৫৫টি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

Emigration Ordinance-১৯৮২ রহিত করে ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ পাস করা হয়। ২০১৬ সালে জানুয়ারিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয় যাতে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলি, ২০১৭ প্রয়ণন করা ২০১৭ সালে।

৫. অভিবাসন পূর্ববর্তী জটিলতা

৫. ১. তথ্যের ঘাটতি এবং দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব

উন্নত জীবনের আশায় অভিবাসী কর্মীগণ বিদেশে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করে থাকলেও তা বাস্তবায়নে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি প্রয়োজন তা অনেকেরই অজানা। কোন দেশে গেলে ভালো কাজ ও উপার্জনের সুযোগ রয়েছে, কোন দেশে অভিবাসন খরচ তুলনামূলকভাবে স্বল্প, কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে বিদেশে কর্মী হিসেবে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, কোথায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যাবে, কীভাবে পাসপোর্ট সংগ্রহ করবে ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় পরবর্তীতে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয় এমনকি প্রতারণার শিকারও হতে হয়। ফলস্বরূপ কেউ কেউ নির্যাতনের শিকার হন বা জড়িয়ে পড়েন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে।

নিয়ম মেনে সঠিক পথে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে ও দক্ষতা অর্জন করে তবেই অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে বিশ্ব শ্রমবাজারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির চাহিদা ব্যাপক রয়েছে যে কারণে স্বল্পদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্যতা ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।[৫] বিদেশ যাওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিষয় যেমন তথ্য প্রযুক্তি, ভাষা, আইনকানুন ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৬]

জরিপে দেখা যায়, এসকল দক্ষতার পাশাপাশি বিদেশগামী ও বিদেশে অবস্থানরত অনেক শ্রমিকেরই যোগাযোগের দক্ষতা, স্বাস্থ্যবিধি, আধুনিক যন্ত্রপাতি চালানোর জ্ঞান ও পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে[৭]। দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে অর্জিত রেমিটেন্সের পরিমাণেও তারতম্য দেখা যায়। দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসী কর্মী সাধারণত অধিক বেতনের চাকুরি প্রাপ্তিতে সক্ষম হন যার ফলে তার প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ একজন স্বল্প দক্ষ বা অদক্ষ কর্মীর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।[৮]

৫. ২. লাগামহীন অভিবাসন খরচ ও কোভিডকালীন সময়ে বাড়তি জটিলতা

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার পরও মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সৌদি আরবে অভিবাসন খরচ দুই থেকে তিনগুণ হারে বেড়েছে।[৯] এর পাশাপাশি অভিবাসীদের ভোগান্তিতে যুক্ত হয়েছে ভিসা ক্রয়, প্রসেসিং খরচ, পাসপোর্ট সংগ্রহ ইত্যাদি।[১০] যার ফলে অভিবাসনের খরচ ফেরত পেতে তাদের দু'বছরেরও বেশি সময় লেগে যাচ্ছে।[১১]

এর পাশাপাশি কোভিডকালীন সময়ে বিমান টিকেটের চড়া মূল্য অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। মধপ্রাচ্যগামী ফ্লাইটের টিকেট বর্তমানে তিনগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে যা কখনই শোভনীয় নয়। কিছু ক্ষেত্রে বিমানের টিকেট ৪০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে এক পর্যায়ে ৮০-৯০ হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।[১২] দুবাইগামী ফ্লাইটের ভাড়া ২০০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৯০০ মার্কিন ডলারে এবং সৌদি আরবগামী ফ্লাইটের ভাড়া ৩০০ মার্কিন ডলার থেকে ১২০০ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।[১৩] এতে করে বিদেশগামী কর্মীগণের অভিবাসন ব্যয় হয়ে দাঁড়ায় আকাশচুম্বী। অনেকে নিরুপায় হয়ে উচ্চহারে বিমানের বিজনেস ক্লাস টিকেট ক্রয় করতেও বাধ্য হয়েছেন কারণ অন্যথায় সময়মত কর্মস্থলে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভিসা নবায়ন জটিলতা, টিকেটের দুস্প্রাপ্যতাসহ আরও অন্যান্য কারণে কিছু সংখ্যক অভিবাসী কর্মী গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে অন্য দেশে পূর্বের চেয়ে স্বল্প বেতন সত্ত্বেও অভিবাসন করতে বাধ্য হন।[১৪]

৫. ৩. অনিবন্ধিত সাব-এজেন্ট এর দৌরাত্ম্য ও মানব পাচার

শ্রম অভিবাসন খাতে সাব-এজেন্টদের ভূমিকা একরকম নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকলেও রামরু-এর গবেষণায় উঠে এসেছে অভিবাসন প্রত্যাশীগণ সাব-এজেন্ট কর্তৃক ১৭ ধরনের সেবা পেয়ে থাকেন।[১৫] মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ করতে সাব-এজেন্ট-এর সাহায্য নিয়ে থাকলেও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে বৈধভাবে যুক্ত রাখার জন্য নিবন্ধন প্রসঙ্গে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধিগণ মনে করেন এতে করে অভিবাসন খরচ বেড়ে যাবে এবং এর জন্য তারা ভর্তুকিও দাবি করেন।[১৬] অথচ

[৫] দৈনিক যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর ২০২১
[৬] বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোর ডটকম, ১৮ নভেম্বর ২০২১
[৭] প্রাগুক্ত
[৮] কালের কণ্ঠ, ১৬ জুন ২০২০
[৯] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৬ মে ২০২২
[১০] প্রাগুক্ত
[১১] প্রাগুক্ত
[১২] দৈনিক ইনকিলাব, ১ জানুয়ারি ২০২২
[১৩] বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০২১ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, রামরু
[১৪] প্রাগুক্ত
[১৫] বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০১৯ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, রামরু
[১৬] ডিবিসি নিউজ, ১৩ নভেম্বর ২০২০

অভিবাসন আইনে নিবন্ধন বা দায়বদ্ধ করার বিধান না থাকার ফলে অনেক অসাধু সাব-এজেন্ট এ বিষয়টির সুযোগ নিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে এবং অভিবাসন প্রত্যাশীদের করছে সর্বস্বান্ত। এসব সাব-এজেন্টদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসাও কষ্টসাধ্য হয়েছে শুধুমাত্র তারা নিবন্ধিত না হওয়ার কারণে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ কতিপয় সাব-এজেন্টদের ফাঁদে পা দিয়ে বুঝে না বুঝে অবৈধ পথে বিদেশে কাজের জন্য পাড়ি জমাচ্ছেন।[১৭] ফলাফল, কেউ কেউ বিপজ্জনক রুটে বিদেশ যাওয়ার পথে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন, আবার কেউ বিদেশে গিয়ে গ্রেফতার হচ্ছেন অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশী হিসেবে এবং শেষ পর্যন্ত কারাগারে প্রেরণ করা হচ্ছে তাদেরকে। অনেক অভিবাসন প্রত্যাশী কিছু সাব-এজেন্টদের প্রতারণার শিকার হয়ে নিজের শেষ সম্বলটুকু বিক্রি করেও অবশেষে বিদেশ যেতে পারছেন না। এক্ষেত্রে আরও উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে অনেকেই বিদেশ যেতে গিয়ে মানবপাচারকারী চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছেন। প্রতি বছর যেসব দেশগুলোতে শ্রম অভিবাসন প্রত্যাশীগণ পাড়ি জমান তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লিবিয়া।[১৮] এমন নজির রয়েছে যেখানে, মানব পাচারকারী চক্রের প্রতারণার শিকার হয়ে অভিবাসীগণ একাধিক রুট ব্যবহার করে লিবিয়া পৌঁছানোর পর কাজ খুঁজে না পেয়ে ইউরোপের দেশগুলোতে পুনরায় অভিবাসনের চেষ্টা করে থাকেন।[১৯] তথ্যমতে ২০২১ সালে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেন ৭৫৭৭ বাংলাদেশি।[২০] ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করে আটককৃত বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের অভিবাসীগণ।[২১]

৬. অভিবাসন পরবর্তী সময়ে গন্তব্য দেশে অবস্থানকালে জটিলতা

৬. ১. আশ্বাস অনুযায়ী চাকুরি না পাওয়া ও ফ্রি ভিসা

অভিবাসী কর্মীগণ সাধারণত বিদেশে কী ধরনের কাজে নিয়োগ পাবেন তা জানতে তারা নির্ভরশীল হয়ে থাকেন সাব-এজেন্ট বা রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর। এছাড়া লাখ লাখ বাংলাদেশি কর্মী ফ্রি ভিসায় ও কোনো নির্দিষ্ট কাজের চুক্তি ছাড়া বিদেশ গমন করে থাকেন।[২২] এই প্রক্রিয়ায় তারা হয়তো বিদেশে পৌঁছানোর ধাপটি ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করে থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোন কাজে নিয়োগ পাবেন তা নিয়ে থাকে সংশয়। অনেকেই দেশে থাকতে যে ধরনের চাকুরির প্রত্যাশায় বিদেশে পাড়ি জমান সে চাকুরি না পেয়ে অন্য জায়গায় কাজ করতে বাধ্য হন। যে সকল অভিবাসী কর্মী বিএমইটি স্মার্ট কার্ড ও কর্মভিসা ব্যতীত অন্যান্য ভিসায় বিদেশ যান তারা দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার অধিকতর ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ কোভিডের মত মহামারী বা অনুরূপ কোনো ঘটনাকালে এ কর্মীগণেরই চাকুরি হারানোর সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো নিয়োগকর্তা না থাকার কারনে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ থাকে না। ফলাফলস্বরূপ তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় অথবা বাধ্যতামূলক দেশে ফেরত আসতেও হতে পারে। এতে করে অনেক সময় তাদের বেতনবাবদ পাওনা টাকা থেকে থাকলেও পরবর্তীতে তা বিসর্জন দিতে হয়, অর্থাৎ তারা মজুরি চুরির শিকার হন।

৬. ২. নারী কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা

বৈদেশিক মদ্রা অর্জনে পুরুষের পাশাপাশি নারী অভিবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু নারী কর্মীদের সম্মান রক্ষার্থে কতটুকু পদেক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা এখনও সংশয়ের সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহসহ নানা দেশে নারী অভিবাসীগণ কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনা নেহাতই কম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হতে হয়।[২৩] কেউ কেউ আবার ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকেন।[২৪] নারী কর্মীদের পাচারের শিকার হওয়ার ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক। নারী অভিবাসী কর্মীগণ সাধারণত যে সকল নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন তার মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন অন্যতম।[২৫] এ সকল কারণে অনেক সময় তাদের বাধ্য হয়ে খালি হাতেই দেশে ফিরতে হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দেশে ফেরত আসেন অনেকে। আবার কারও কারও নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসার সৌভাগ্যও হয় না, অতিরিক্ত নির্যাতনের ফলে প্রবাসেই জীবনাবসান ঘটে।[২৬] এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশে যারা ফেরত এসেছেন তাদের মাঝে ৫৫ শতাংশই শারীরিক ও ২৯ শতাংশ মানসিকভাবে অসুস্থ।[২৭] অনেককেই ধর্ষণের শিকার হয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার ফলে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে।[২৮]

৬.৩. গ্রেফতার ও কারাগারে আটক এবং দূতাবাসের ভূমিকা

বিদেশের মাটিতে কারাগারে আটক হওয়ার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের একটি অংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকালে আটক হয়েছেন।[২৯] এর অন্যতম একটি কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে চুক্তি বা বৈধ ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কর্মীগণ দেশে ফেরত না এসে অন্য কাজে যোগদান করা। এর ফলে কর্মী হিসেবে তাদের বৈধতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ থাকে। এছাড়াও আশানুরূপ কাজের পরিবেশ বা বেতন না পাওয়ার ফলে অনেকেই চুক্তির বাইরে যেয়েও অন্যান্য কাজে যোগদান করছেন। এ সকল কারণে যখন কর্মীদের অনিয়মিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তখনই তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে বা ডিটেনশান সেন্টারে প্রেরণ করা হচ্ছে।[৩০] এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও গ্রেফতারকৃতরা বলেছেন, তারা আটক থাকাকালে দূতাবাস থেকে কোনো রকম যোগাযোগ করা হয়নি।[৩১] নিরুপায় হয়ে ডিটেনশান সেন্টারে অর্থ উৎকোচ হিসেবে প্রদান করে ছাড়া পাওয়ার ঘটনাও রয়েছে।[৩২]

[১৭] বণিক বার্তা, ২৭ জুন ২০২১
[১৮] বিবিসি বাংলা, ২৬ জানুয়ারি ২০২২
[১৯] প্রাগুক্ত
[২০] প্রাগুক্ত
[২১] বাংলা ট্রিবিউন, ৮ আগস্ট ২০২০
[২২] দৈনিক যুগান্তর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
[২৩] প্রাগুক্ত
[২৪] প্রাগুক্ত
[২৫] কালের কণ্ঠ, ৯ মার্চ ২০২১
[২৬] প্রাগুক্ত
[২৭] দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ অক্টোবর ২০২১
[২৮] প্রাগুক্ত
[২৯] বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
[৩০] প্রাগুক্ত
[৩১] প্রাগুক্ত
[৩২] প্রাগুক্ত

৭. প্রত্যাবাসন-পরবর্তী জটিলতা

৭. ১. প্রত্যাবাসনের পর বেকারত্ব বরণ

স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে ফিরে আসার পর অভিবাসী কর্মীগণ দেশে কাজের সংকট উপলব্ধি করতে পারেন। কোভিড মহামারীকালীন ফেরত আসা অভিবাসীগণের নিকট এ সমস্যাটি আরও প্রকটভাবে দেখা দেয়। তখন পরিবারের খরচ চালাতে গিয়ে তারা হিমশিম খান এবং এক পর্যায়ে তাদের বেকারত্বের সম্মুখীন হতে হয়। বিদেশে কর্মরত অবস্থায় তারা যে ধরনের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন অনুরূপ কাজ দেশে বিদ্যমান না থাকায় চাকুরি লাভে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে অনেক কর্মীর। এর ফলে দেশে কর্মসংস্থানের চেয়ে কাজের জন্য পুনরায় বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকেন।[৩৩] প্রত্যাবাসন পরবর্তী বেকারত্বের একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে এর ফলে অভিবাসী কর্মী যখন মরিয়া হয়ে পুনরায় বিদেশ গমনের নানা পথ খুঁজতে থাকেন, এর সুযোগ একটি অসাধু চক্র কাজে লাগায়। যার ফলে অভিবাসী না জেনে বুঝে মানব পাচারকারী চক্রের শিকারও হয়ে যেতে পারেন।

৭. ২. সামাজিকভাবে হেনস্তার শিকার অভিবাসী কর্মীরা

অভিবাসী কর্মীগণের স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেশে ফেরত আসার পর থেকে তাদের ওপর একরকম নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশে ফেরত আসার কারণ হিসেবে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়া, নিয়োগকারী কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণ থাকলেও অনেক সময় অভিবাসীদের নিজ এলাকা এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজ পরিবারের সদস্য কর্তৃক হেনস্তার শিকার হতে হয়। এ বিষয়টি আরও প্রকটভাবে দেখা দেয় কোভিড মহামারীকালে, যখন অভিবাসীগণ চাকুরি হারিয়ে বা কাজ বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছিলেন দেশে, তখন তাদেরকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৩৪] এমনকি কারও কারও বাড়িতে লাল পতাকা দিয়ে বিপদজনক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে একরকম বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে এ আচরণ আরও প্রকট রূপে দেখা যায়। ফিরে আসার পর তাদেরকে বসবাস করতে হয় নানা রকম কটূক্তি, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে।

৭.৩. ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা

অভিবাসী কর্মীগণ দেশে ফেরত আসার পরপরই সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। ফিরে আসা অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণ নীতি হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।[৩৫] এছাড়া সরকারের তৈরিকৃত ৭০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃএকত্রীকরণ তহবিল রয়েছে যা নিঃসন্দেহে অভিবাসী কর্মীদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এ তহবিল থেকে ২০২২ এর মার্চ মাস পর্যন্ত ৩১২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়ে থাকলেও এটি প্রাপ্তির শর্তাবলী ও সহজলভ্যতা নিয়ে অনেকেরই অভিযোগ এবং দ্বিমত রয়েছে।[৩৬] শর্তাবলীগুলো সহজবোধ্য না হওয়ার পাশাপাশি এর স্কিমসমূহেও স্পষ্টতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখার স্বল্পতা ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাব অভিবাসীদের পুনঃএকত্রীকরণ ঋণ প্রাপ্তির ভোগান্তিতে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা।

৮. সুপারিশ

শ্রম অভিবাসন বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ বয়ে আনার প্রত্যাশা থাকলেও ব্যয়বহুল অভিবাসন প্রক্রিয়া থেকে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা তারা পাচ্ছেন না। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সরকার আইন করা সত্ত্বেও তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে নানা কারণে।

অভিবাসনে কর্মীদের দুর্ভোগ হ্রাসে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

১। নিরাপদ অভিবাসন-সংক্রান্ত নানা তথ্য সম্ভাব্য অভিবাসীদের জন্য সহজলভ্য করা;

২। বিদেশ গমনের পূর্বে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অভিবাসী কর্মীদের অবহিত করা;

৩। অভিবাসন-সংশ্লিষ্ট খরচ তথা ভিসা ক্রয়, প্রসেসিং, বিমান ভাড়া হ্রাসের উদ্যোগ নেওয়া;

৪। অভিবাসীদের স্বার্থে বিদ্যমান অভিবাসন আইন সঠিকরূপে প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

৫। অভিবাসনে সাব-এজেন্টদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও নিবন্ধনের আওতায় আনা;

৬। দেশে ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীগণের জন্য নির্ধারিত পুনঃএকত্রীকরণ তহবিলের সঠিক ব্যবহার ও ঋণ প্রাপ্তি প্রক্রিয়া সহজ করা। এক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকগুলোকেও ঋণ প্রকল্প পরিচালনায় সংযুক্ত করা যেতে পারে;

৭। পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের যথাযথ সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ;

৮। বিদেশের মাটিতে সঙ্কটাবস্থায় থাকা অভিবাসীগণের পক্ষে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসসমূহের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করা।

সি আর আবরার, ইনজামুল হক, নাজমুল হক, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

[৩৩] দ্যা ডেইলি স্টার, ২৫ জুলাই ২০২১

[৩৪] বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০২০ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ, রামরু

[৩৫] দ্যা বিজনেজ স্ট্যান্ডার্ড, ২৯ মার্চ ২০২২

[৩৬] প্রাগুক্ত

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের নারী

সাজেদা আমিন ও অলিউল ইসলাম

গত বছর আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করেছি। এই উদ্‌যাপনের সময়, আমরা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস অন্বেষণ করেছি এবং ভবিষ্যতে জাতি কোথায় যাবে তা বিবেচনা করেছি।

বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও একটিভিস্টরা স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রগতি, বিকাশ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নের দিকগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশকে আজকের জাতিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে যে দিকগুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে এই সকল আলোচনায় নারীদের ভূমিকা তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের নারীরা কী ভূমিকা রেখেছে এবং কীভাবে দেশের পরিবর্তনে স্থান করে নিয়েছে–এই মর্মে কিছু কথা বলব। বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

১৯৮০-এর দশক থেকে শুরু করে ২০২২ অব্দি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে (বিআইডিএস) আর পপুলেশন কাউন্সিলে নানাবিধ গবেষণা হয়েছে। যদিও বেশির ভাগ সময় আমরা মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান বা শিক্ষা সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেই, ইদানিংকালে মেয়েদের বয়সন্ধিকাল, যৌন নিপীড়ন আর সহিংসতার ওপরও বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। একদিকে যেমন দারিদ্র্যের মানচিত্রে নারীর অবস্থান, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন উন্নয়নশীল উদ্যোগে মেয়েদের অবদান নথিভুক্ত। বাংলাদেশের নারী বিষয়ক গবেষণার অনেকাংশ সমাজবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যাতত্ত্বের আঙ্গিকে এবং নারী ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে করা। বর্তমানে নারীরা রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল সেক্টরে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন ২০২০ অনুযায়ী, ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম। ফলে খালি চোখেই এখন আমরা বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো দেখতে পাই। তবে এই পরিবর্তন কোনো দল বা গোষ্ঠীর একার অর্জন নয়। ব্যক্তিগত, সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে। সুযোগ ও সক্ষমতার সমন্বয় করতে পারলে নারীরা ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরুর দিকে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নারীর অগ্রযাত্রা শুরু হলেও, তা ছিল সংশয়পূর্ণ এবং কণ্টকময়। সময়ের সাথে অবস্থার উত্তরণে নানা আইন, নীতিমালা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রাও আজ ইতিবাচক ধারায় দৃশ্যমান। তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের মতো জরুরি ক্ষেত্রগুলোতে এখনও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

বাংলাদেশে নারীর বিকাশ ও ক্ষমতায়নের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল নারীকে শিক্ষিত করা। শুরুর দিকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই মেয়েদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু নারী-শিক্ষামুখী বিভিন্ন নীতিমালা, প্রণোদনা ও উপবৃত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষায়ও আমাদের এই সাফল্য রয়েছে। আজ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ শুধু বেড়েছে বললে ভুল হবে, বরং এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের সমতা নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ-সমতা অর্জন করেছে।

সারণি ১ : ১৯৯৫-২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ভর্তি হার (%)

সাল	স্কুল	কলেজ	মাদ্রাসা	বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৫	৪৬.৯৭	৩৩.৬১	৩০.১৪	২২.৭৭
২০০০	৫২.৫৭	৩৯.৭৬	৩৯.৪০	২৪.৭৯
২০০৫	৫২.২৮	৪১.৬৪	৪৭.৭৪	২৪.৪৩
২০১০	৫৩.৩১	৪৪.৯০	৫১.০১	২৮.২৬
২০১৫	৫৩.৩১	৪৬.৪৬	৫১.৬২	৩২.৮৫
২০২০	৫৪.৮৬	৫০.৫৫	৫৩.৭৩	৩৫.২১

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস, ২০২০

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন ফর দ্য ইয়ার ১৯৭০-৭১' প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে দেশের মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২৮.৩ শতাংশ ছিল ছাত্রী। ২০২০ সালের বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস রিপোর্ট বলছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েদের অংশগ্রহণের হারের উত্তরণ ঘটেছে, যা ৫৪.৮৬ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ হার কিছুটা কম, ৩৫.২১ শতাংশ; যদিও ৭০ দশকের শুরুতে ১০-১২ শতাংশ ছিল। এছাড়া, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, যেখানে ২০১১ সালে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ছিল ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ, তা এখন ৭১ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার বাড়ছে বটে, সে অনুপাতে কর্মজীবী শিক্ষিত নারী বাড়ছে না। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি নারী কর্মজীবনে অর্থাৎ চাকরিতে প্রবেশ না করে তাহলে সমাজে তার অবস্থা ও অবস্থানের উন্নতি হয় না। পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম হতে হবে। তাহলেই সে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।

শিক্ষার পাশাপাশি, নারীর বিকাশ ও ক্ষমতায়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান উন্নতির দিকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং এই অংশগ্রহণ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করছে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ৯০ শতাংশ নারী। পোশাকশিল্প শ্রমিক হিসেবে নারীর এই আগমন দেশের সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারের তরুণী ও কিশোরীরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখছে। কর্মসূত্রে অচেনা শহরে এসে তাদের নিজেদের জায়গা করে নিতে হয়েছে। তবে সামাজিক নিরাপত্তা বা অন্য কোনো সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। গার্মেন্টস সেক্টরে নারীদের কর্মসংস্থানের যে পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও, শ্রমশক্তিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি মূলত গৃহ-ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেশিরভাগ কৃষি খাতে পরিচালিত হয়। এই বৃদ্ধি সম্ভবত অর্থনীতি এবং কৃষি উৎপাদনে নারীদের দ্বারা বৃহত্তর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহজতর করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে জরিপ অনুযায়ী প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত।

এছাড়া নারীর অংশগ্রহণ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। আজকের বিশ্বে যে ক্ষুদ্রঋণের কারণে বাংলাদেশ আলোচিত, তার বিশেষত্ব হল ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের ৮০ শতাংশই গ্রামীণ নারী। ক্ষুদ্রঋণের কারণে গড়ে ওঠা পাঁচ লক্ষের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে তিন লক্ষেরও উপরে নারী নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সংগ্রামরত এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক সাফল্যের দাবিদার। গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে বাড়ন্ত শিক্ষার হার, সচেতনতা, প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও অর্থনীতির বাস্তবতায় নারী অংশগ্রহণ সর্বত্র। বিদেশে গিয়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, উদ্যোক্তা হওয়াসহ সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পেশায় আজ রয়েছে নারীর কৃতিত্বপূর্ণ বিচরণ।

নারীর বিকাশে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে পোক্ত করতে নারীর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের নারীরা এগিয়েছে অনেক, বিশেষ করে সর্বোচ্চ পর্যায় নারী নেতৃত্বের সফলতা রীতিমত ঈর্ষণীয়। স্বাধীনতার ৫০ বছরের ২৯ বছর ধরে বাংলাদেশের সরকার প্রধান নারী। নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রোভিসি, রাষ্ট্রদূত, নির্বাচন কমিশনার, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী, কর্মকর্তা বা প্রধান হিসেবে নারীর ভূমিকা সাফল্যমণ্ডিত।

যে কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের এ চিত্র রোল মডেল হিসেবে ধরা হয়। তবে রাষ্ট্রের শীর্ষ পদগুলো নারীর দখলে, এ কথা শুনতে ভালো লাগলেও এটা যে সত্যের পুরোটা নয় তা অনেকেই জানেন। এর অপর পিঠে কিছু অপ্রিয় সত্যও রয়ে গেছে, যা খুব একটা বলা হয় না। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কয়েকজনের শীর্ষ পদে আসীন থাকাকে বোঝায় না। ক্ষমতায়ন আসলে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় নারী তার নিজের জীবনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পেশা নির্বাচনসহ সবক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সমঅধিকারের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বাংলাদেশের নারীর অবস্থানের সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, নারীর ক্রমবিকাশমান ভূমিকা বাংলাদেশের অবস্থানকে যখন ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করছে, বৈশ্বিক সূচকে উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, তখন নারীর বাস্তব অবস্থানের সামাজিক সূচক কোন পর্যায়ে সেই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সূচকে নারীর অগ্রযাত্রার প্রতিফলন সামাজিক সূচকে দৃশ্যমান হচ্ছে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর

ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেলেও তা কখনোই সন্তোষজনক ছিল না। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি শতভাগ। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্রের অভাব ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পিছিয়ে দিচ্ছে নারীর উন্নয়ন যাত্রাকে। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাবও নারীদের পিছিয়ে দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে থাকার একটি অন্যতম মূল কারণ হলো প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় নারীর কম উপস্থিতি। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও রয়েছে। যেমন, আমাদের সমাজে এখনও এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেসব পরিবারের অভিভাবকেরা ছেলেদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে ব্যয় করেন, মেয়েদের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ ব্যয় করতে নারাজ। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশোনায় ব্যয় তুলণামূলক বেশি তাই অভিভাবকেরা চান মেয়েরা বিজ্ঞানে না পড়ে মানবিক বিষয়গুলোতে পড়বে। আর ছেলেরা প্রকৌশল বা প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই মানসিকতার ফলে মেয়েরা প্রযুক্তিতে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উপস্থিতি বেশি।

চিত্র ১: লিঙ্গ ভেদে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

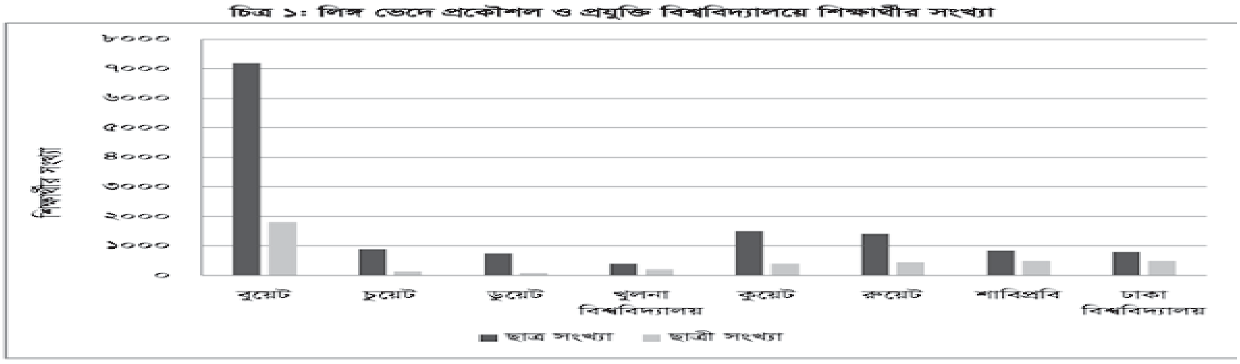

উৎস: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৪।

প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েরা কতোটা পিছিয়ে তা চিত্র ১ থেকে সুস্পষ্ট। আর তাই কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অনেক পিছিয়ে থাকতে হয়। প্রযুক্তিগত কর্মক্ষেত্রে ছেলেদের উপস্থিতি মেয়েদের কয়েকগুণ বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে, টেকনিক্যাল পেশায় নিয়োজিত ১,৪৬৯ জনের মধ্যে ১,১২৯ জনই পুরুষ আর নারী মাত্র ২৪০ জন। নারীদের তাই কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে হবে আর তাহলেই তাদের জন্য প্রসারিত কর্মক্ষেত্র থাকবে। অনেক সময় নারীরা প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী নয় বলে নিয়োগকারীরা তাদের নিয়োগে আগ্রহী হয় না। তাই শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা দায়ী। কারণ অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে একটি কম্পিউটার কেনার সামর্থ্য থাকলে তা পরিবারের পুরুষ সদস্যের জন্যই কেনা হয়। অর্থাৎ নারীরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এমন অনেক বিষয় নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই মেধা বিকাশে নারী পুরুষ উভয়কেই তাদের যথাযথ ও প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে। তাহলেই নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ থাকে।

চিত্র ২ : ১৯৭৪-২০১৭ পর্যন্ত শ্রমশক্তিতে নারী অংশগ্রহণের হার (%)

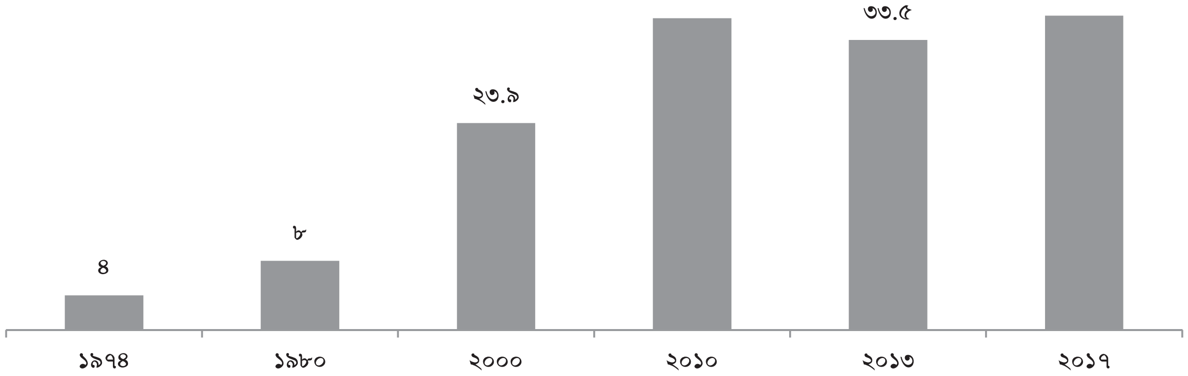

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে ৩৬.১৪ শতাংশ নারী, যারা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতে কাজ করে থাকেন। তবে এখনো নারীদের ৯১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। ফলে সম মজুরি, সম সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা-সব কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীর শ্রম জিডিপিতে যুক্ত হয় না। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ২৩ ধরনের কাজের

মধ্যে ১৮টিতে যুক্ত থাকলেও জমির মালিকানা না থাকায় কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন না নারীরা। পাশাপাশি উদ্যোক্তা হিসেবে যেসব নারী কাজ করছেন, তাদেরকেও নানারকম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিবিএস-এর জরিপে দেখা যায়, ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী নারী, যারা আয়মূলক কাজ করেন, তাদের ১২ শতাংশ উদ্যোক্তা। এই নারী উদ্যোক্তাদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মূলধন সমস্যা এখনো নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া, ঋণ পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে শর্তপূরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়।

ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছে। পুরুষেরা নারীদের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি আয় করতে পারেন। নারীদের মাথাপিছু গড় আয় যেখানে (পিপিপি অনুসারে) মাত্র ২ হাজার ৪১ ডলার, সেখানে পুরুষের গড় আয় ৫ হাজার ২৮৫ ডলার। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ শীর্ষক সূচকে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪১, যা ২০০৬ সালে ছিল ১০৭। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশে নারীর জীবন নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এখনো অত্যন্ত সীমিত। অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন নারী এখনও চাইলেই তার মতামত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান না, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হন। এই বাধা অতিক্রম করেই বাংলাদেশের নারীদের এগোতে হয়েছে। এর মূল কারণ আমরা দুইটা গুরুত্বপূর্ণ সূচকে ভীষণভাবে পিছিয়ে আছি।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেয়ে এখনও বাল্যিবিবাহের শিকার। প্রায় ৬০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সের আগে, যদিও এখন এটা দণ্ডনীয় অপরাধ। বহু বছরের সচেতনতা অভিযান, বিপুল অর্থ ব্যয়ের পরেও এই অবস্থা এখনও রয়ে গেছে। উন্নতি তো দূরের কথা বরং অবনতি ঘটেছে। ২০০০ সালে জরিপে আমরা দেখেছি, আগে বেশিরভাগ বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হতো। বাল্যবিবাহবিরোধী অভিযানের ফলে এখন রেজিস্ট্রেশন কমে গেছে। এখন অভিভাবকেরা অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে তা লুকাবার জন্য নানান উপায় বের করছে। কাজীকে দিয়ে বিয়ে না পড়িয়ে আজকাল জুমা বিয়ে বলে এক নতুন প্রথা শুরু হয়েছে।

অনেকে হয়তো বলবেন বিয়ের হার ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় কমেছে; এটা কিছুটা সত্যি। সেই সময় ৭৩ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হতো। কিন্তু আমরা যদি অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করি তাহলে এটা দেখা যাবে যে, ভারত আর নেপালের তুলনায় এই উন্নতি অনেক কম। আমাদের বাল্যবিবাহের হার যেখানে প্রায় ৬০%, ভারতের হার ২৫% আর নেপালে ৪০%। বাল্যবিবাহের হার এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি

চিত্র ৩: ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে এমন নারীর হার (%)

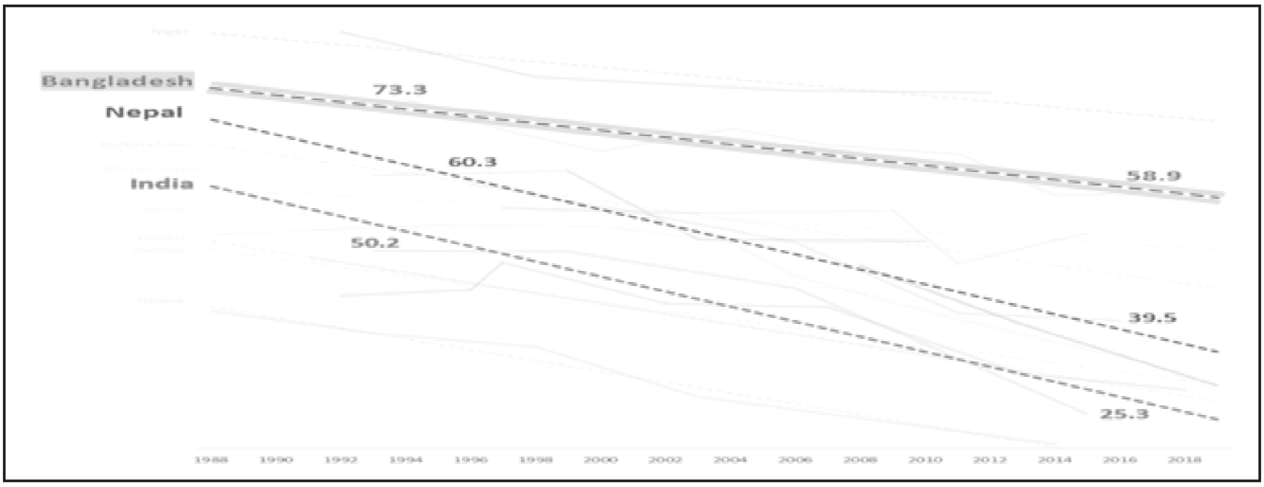

একইভাবে নারী নির্যাতনও আমাদের দেশে অতি মাত্রায় প্রচলিত। নানা রকমের জরিপের তথ্য অনুযায়ী মেয়েরা সচরাচর ঘরে এবং বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে। পথে-ঘাটে মেয়েদেরকে উপদ্রব করা, বউ পেটানো, যৌন নিপীড়ন এতই প্রচলিত যে নারীরা জরিপে একজন সম্পূর্ণ অচেনা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকেও তা বলতে দ্বিধা করে না। অত্যাচারে তারা যেন এতই অভ্যস্ত। নারীদের নিয়ে হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, পাবলিক প্লেসে ৯৭.৯৬ শতাংশ নারী ও কন্যাশিশু এক থেকে একাধিক বার যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। জরিপে অংশ নেয়া ৩৯২ জনের মধ্যে ৩৮৪ জনই বলেছেন, তারা বিভিন্ন সময়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন, যা আমাদের জন্য একটি ভয়াবহ ইঙ্গিত।

করোনাকালীন সময়ে হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালিত আরেকটি জরিপ থেকে জানা যায়, প্রায় শতভাগ নারী নিজ নিজ কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হন। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, এদের মধ্যে ৮.৮৯ শতাংশ নারী ছয় থেকে ১০ বার যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

সাইবার বুলিং/সাইবার অপরাধ

দেশে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষের মধ্যে ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোনের ব্যবহার যত বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধ বা সাইবার বুলিং। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে নারীরা। সাইবার অপরাধ এবং প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সাইবার অপরাধ নিয়ে করা গবেষণায় উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

গবেষণায় বলা হয়, শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ অভিযোগই আসে নারীদের কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী মেয়েরা। শতাংশের হিসাবে তা প্রায় ৭৪। অভিযোগের একটি বড় অংশের অভিযোগ ফেসবুক সংক্রান্ত। এর মধ্যে আইডি হ্যাক থেকে শুরু করে সুপারইম্পোজ ছবি ও পর্নোগ্রাফির মতো ভয়াবহ অভিযোগও রয়েছে। আজকাল সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে নারীরা আর চুপ করে থাকতে না চাইলেও কীভাবে কোন উপায়ে সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদ করতে হবে–এ বিষয়ে জানেন না অনেকেই। হয়রানির শিকার হলেও ভুক্তভোগীদের ৩০ শতাংশই এর বিরুদ্ধে কীভাবে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, এ বিষয়ে জানেন না। বাকিদের মধ্যে ২৫ শতাংশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেও কোনো লাভ হবে না ভেবে অভিযোগ করেন না। এ ক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় নিয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাব এবং লোকলজ্জা ও ভয়-ভীতিকে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী। এতে একদিকে যেমন নারীরা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, তেমনি ব্ল্যাকমেইল ও হুমকির কারণে তাদের ব্যক্তিগত জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশে ২০০৬ সালে প্রথম সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ আইন (আইসিটি অ্যাক্ট) প্রণয়ন করা হয়। এর পর ২০১৩ সালে এই আইন সংশোধন করা হয়। একই বছর ঢাকায় স্থাপন করা হয় দেশের একমাত্র সাইবার ট্রাইব্যুনালটি। এই আইনে কারও অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও তোলা ও তা প্রকাশ করার অপরাধে ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের সঠিক ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি আইনের প্রয়োগ করা হলে সাইবার অপরাধ অনেকাংশে কমে যাওয়ার কথা। এছাড়া, সাইবার হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগে একটি সাইবার হেল্প ডেস্কও রয়েছে। এই হেল্পলাইন (০১৭৬৬৬৭৮৮৮৮) সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ হেল্পলাইনে সরাসরি ফোন করে অথবা এসএমএসের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। এ ছাড়া সাইবার হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে হটলাইন '৯৯৯' চালু করেছে সরকার। যে কেউ সাইবার অপরাধের শিকার হলে এই হটলাইনে ফোন করেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। এখন প্রয়োজন শুধু সাহস করে অভিযোগ জানানো।

এই ধরনের মৌলিক সমস্যার কি কোনো সমাধান আছে?

বাংলাদেশে নারী বিষয়ক গবেষণা অনেক হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে শিক্ষা এবং কাজের সুযোগের ভূমিকা সম্পর্কে হয়েছে বেশ কিছু নিরীক্ষামূলক কাজ। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কী করা যায় আর এই সব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কীভাবে করা যায় তা নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একদিকে যেমন তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক জ্ঞান দরকার অপরদিকে চাই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা। সেই ধারণা পাওয়ার জন্য গবেষকদের মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের তরুণ নারী ও মেয়েদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। বালিকা শিরোনামের একটি গবেষণায় আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দক্ষতা-নির্মাণের উদ্যোগগুলো বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

আমরা যেই ৭২টা গ্রামে প্রাথমিক উদ্যোগ নেই, সেখানে প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে দুইজন মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হতো। আমাদের ১৮ মাসের কার্যক্রমের পর সেখানে বাল্যবিবাহ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমরা দুটি সরকারি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই সফল প্রোগ্রামগুলোকে স্কেল করছি। কোভিডের প্রকোপের একই রকম ফল পেয়েছি। কেবল সেমিনারকক্ষে বা পত্রিকায় নিবদ্ধ না থেকে গবেষণা-থেকে-প্রোগ্রাম-টু-পলিসির জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার একটি ভাল

উদাহরণ এই গবেষণাটি। অনুরূপ আরেকটি গবেষণায় আমরা ঢাকার বস্তিতে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস করার পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করেছি এবং সচেতনতা এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের প্রচারের জন্য আউটরিচ ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব প্রদর্শন করেছি। এই প্রোগ্রামগুলো বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে আমাদের প্রাসঙ্গিক আর সফল উপায় দেখাতে সাহায্য করেছে। বালিকাদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর তথ্য আর উপাত্তের সাথে উন্নয়ন মাঠকর্মীদের উপদেশ ছিল অতি মূল্যবান।

যাই হোক, লিঙ্গসমতা অর্জনের জন্য আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে। মেয়েদের অক্ষমতার প্রধান সামাজিক সূচকগুলো বিবেচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয় বাল্যবিবাহের কথা। মেয়েরা বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে প্রতিনিয়ত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলা করে চলেছে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি এবং বিশ্বের তালিকায় বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে।

এ ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি?

আমরা মনে করি, আজ অব্দি আমাদের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা অনেক ইতিবাচক। এই অর্জন আমাদের আত্মবিশ্বাসের দিক। এর জন্য সঠিক ধরনের সামাজিক অঙ্গীকারের প্রয়োজন, বিনিয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন একটা সমষ্টিগত উপলব্ধি: নারী ও মেয়েদের জন্য এই মৌলিক প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করা সার্বিক উন্নয়নের জন্য অনিবার্য। আমরা বিশ্বাস করি যে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে মেয়েদের জন্য সুযোগ প্রসারিত করা "Is not only the right thing to do, but the smart thing to do"।

নারীর ক্ষমতায়ন জীবনের প্রথম দিকে শুরু করা জরুরি। মেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায় তখন তাদের স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া, যৌন সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সহিংসতা কমাতে এবং বাল্যবিবাহ কমাতে কী কী করা প্রয়োজন তা নিয়ে বাংলাদেশে আজ অব্দি অনেক কাজ করা হয়েছে আর সেই কার্যক্রমের উপযুক্ত মূল্যায়নও করা হয়েছে। এই সব এটাও প্রদর্শন করে যে আমরা যথেষ্ট ক্ষমতা রাখি। এখন প্রয়োজন সারা দেশে এর বাস্তবায়ন করা। এর জন্য দরকার এক দিকে প্রত্যয় আর অপর দিকে যথাযোগ্য বিনিয়োগ। কৌশলগুলো প্রণয়নের সাথে সাথে দেখা দরকার কেন কার্যকর হয়েছে বা হয়নি ও তা বোঝার চেষ্টা।

বাল্যবিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা নারী-পুরুষ বৈষম্যের একটা মৌলিক সূচক। আমাদের দেশে মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে অহরহ এই সামাজিক ও যৌন নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়। এর ফলে স্বাস্থ্য, প্রজনন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো যতটা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারতো ততটা প্রভাব ফেলেনি। যেমন, মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রকল্প শিক্ষার হার বৃদ্ধি করলেও, ২৫ বছর পরেও বাল্যবিবাহে কোনও প্রভাব ফেলেনি। মেয়েদের নিরাপদ করার জন্য এই জাতীয় প্রোগ্রামগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সমর্থন করা দরকার। অধিকন্তু, শহর এলাকায় এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মতো নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যার জন্য অনুরূপ প্রোগ্রামগুলো প্রসারিত করা দরকার।

নারী ও মেয়েদের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য নিরাপত্তা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং মেয়ে আর নারীদের নিরাপত্তা সকল কর্মসুচিতে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এর সাথে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে বিশেষ স্বীকৃতি দিতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মতো, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়া সম্প্রদায়গুলো উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দেশের একটি বিশাল অংশ পরিবেশগতভাবে দুর্বল উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো উপকূলীয় ক্ষয় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানেও বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার সর্বোচ্চ হার রয়েছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়বে নারীদের ওপর।

এই ধরনের পদক্ষেপ না নিলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন বিপর্যস্ত হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, নারীদের অগ্রতির প্রতিকূলতা নিবারণের মাধ্যমে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। সমাজের অনেক দিকে নারীদের অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে দৈহিক ও সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করা অমানবিকও বটে।

সাজেদা আমিন, সিনিয়র সহযোগী, পপুলেশন কাউন্সিল ও অলিউল ইসলাম, সংবাদকর্মী

৫০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : অগ্রগতি ও সংকট

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ

বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ এমডিজি সময়কালে মানব উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির এক সফল উদাহরণ হিসেবে সমাদৃত। স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকে পাকিস্তান ও ভারতের তুলনায় বিবিধ সামাজিক সূচকে (যেমন: মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, জনসংখ্যার উর্বরতা হ্রাস, শিশু টিকাদান কর্মসূচি, নারীর গর্ভনিরোধক ব্যবহার এবং জন্মদান ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানপ্রীতি হ্রাস) বাংলাদেশের অর্জনসমূহ ব্যতিক্রমী। এর সবটুকুই অর্জিত হয় সাম্প্রতিক সময়ের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বে। সেই বিচারে এই অগ্রগতি সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের 'অসামান্য উন্নয়ন'-এর প্রমাণপত্র।[১]

পাকিস্তানি শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) আমাদের অর্থনীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় (বিশেষত পাকিস্তান) ব্যাপক অগ্রগতি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশ্চিত হয়নি মানসম্পন্ন শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার। শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়লেও বৃদ্ধি পায়নি সাক্ষরতার হার এবং কর্মদক্ষ জনশক্তি। ন্যূনতম দক্ষতাবিহীন সনদধারী জনশক্তির প্রবৃদ্ধি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিচ্যুতির বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি; শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি এবং প্রস্তাবিত রূপরেখা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এসব মিলিয়ে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বড় সংকটের মুখোমুখি। এই প্রবন্ধে শিক্ষা খাতে অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা মানের এবং নীতির সংকট বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

শিক্ষার প্রসার এবং প্রবৃদ্ধি

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোত্রের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। চার দশক আগে যেখানে এক তৃতীয়াংশেরও কম শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করত সেখানে আজ তা ৮০%। ছেলেদের তুলনায় শ্রেণিকক্ষে মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। মাধ্যমিকে মেয়েরাই অধিকতর হারে ঝরে পড়ত। পাকিস্তানের তুলনায় শ্রেণিকক্ষে লিঙ্গসাম্য এসেছে স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকের মধ্যে।[২] ২০০০ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হার ছিল ৯০ শতাংশের উপরে। কিন্তু অধিক সংখ্যায় শিশু ঝরে পড়ায় প্রাথমিক চক্রের সম্পূর্ণ করার হার ছিল মাত্র ৫০ শতাংশ। ২০১৫ সাল নাগাদ প্রাথমিক সমাপ্তি বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে পিইসিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৫ শতাংশের বেশি আজ অন্তত একটি পাসের সনদধারী। শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির হারের বিস্ফোরক প্রবৃদ্ধি এবং অধিকমাত্রায় সমাপনী পরীক্ষা পাসের বিচারে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকটাই নজরকাড়া।

এই অর্জনের পিছনে ১৯৯০-এর দশকের একাধিক সামাজিক উদ্ভাবনী নীতির অবদান ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' এবং মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে উপবৃত্তি-প্রকল্প শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টি পরিবর্তনে সফল হয়। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা কম খরচে ও আনুষ্ঠানিক মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) চালু করে প্রাথমিক চক্রের শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ গ্রেডের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে প্রাথমিক সমাপ্তির হারে এক নাটকীয় প্রবৃদ্ধি ঘটে।

সফলভাবে স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি ও তালিকাভুক্তি হারের প্রবৃদ্ধি এবং স্কুল ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে পারলেও শিক্ষার মান বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী স্কুলে পড়ায় দক্ষ নয় এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের এক চতুর্থাংশেরও বেশির শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নেই।

শিক্ষা এবং শেখার মধ্যে অসঙ্গতি

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট "শেখানো এবং শেখা : সকলের জন্য গুণগত মান অর্জন" প্রতিবেদনটি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও অশগ্রহণের হারের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করে। তার পাশাপাশি একটি আসন্ন সংকট বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। উদ্বেগটি হলো 'শেখার সংকট' (লার্নিং ক্রাইসিস)। এমডিজি-পরবর্তী ২০১৫-২০৩০ সময়ের এসডিজি ক্যাম্পেইনের প্রস্তুতি হিসেবে ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারকদের স্কুলে নিবন্ধনের পাশাপাশি শ্রেণি কক্ষে শেখার ও সাক্ষরতা বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধির সুপারিশ করে।

[১] Asadullah, M Niaz, Antonio Savoia and Wahiduddin Mahmud, 2014. "Paths to Development: Is There a Bangladesh Surprise?" World Development. Volume 62, October, Pages 138-154.

[২] Asadullah, M Niaz & Chaudhury, Nazmul 2009. "Reverse Gender Gap in Schooling in Bangladesh: Insights from Urban and Rural Households," The Journal of Development Studies, 45(8):1360-1380.

একই সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদালয় থেকে প্রকাশিত 'কম্পারেটিভ এডুকেশন রিভিউ' জার্নালে আমার লিখিত একটি গবেষণা প্রবন্ধ বের হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল "গ্রামীণ বাংলাদেশে শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং সাক্ষরতা অর্জনের অসঙ্গতি" ।[৩] ২০১৫ সালের এই প্রবন্ধে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার ঘাটতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। ১০-১৭ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক মানের ন্যূনতম গণনার যোগ্যতা বিচারে একটি বিশাল অসঙ্গতি ফুটে উঠে। দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে একটি বছর সমাপ্তি সাপেক্ষে সংখ্যাতাত্ত্বিক দক্ষতার বৃদ্ধি হয় মাত্র ৬.৩ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ধারার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কম-বেশি এই ঘাটতির শিকার। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রমোশন অনুপাতে শেখার প্রবৃদ্ধি আশাজনক নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে গ্রামীণ বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলগুলোর 'লার্নিং প্রোফাইল' দুর্বল।

সাম্প্রতিক সময়ের সরকারি তদারকিতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী 'লার্নিং প্রোফাইলে' তেমন বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি দুই বছর অন্তর 'জাতীয় ছাত্র মূল্যায়ন (এনএসএ)' সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের বাংলা পড়ার এবং মৌলিক পাটিগণিত সক্ষমতার মূল্যায়ন করে। দুর্ভাগ্যবশত, ২০১১ থেকে ২০১৭ সময়কালের মধ্যে সমাপ্ত মূল্যায়নের ফলাফল বিবেচনায় তেমন কোনো পরিবর্তন দৃশ্যমান নয় উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালের এনএসএ সমীক্ষায়, ৫ম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর অর্জন ছিল 'মৌলিক' বা 'বেসিকের' নিচে স্তরে।

পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের 'শেখার দারিদ্র্য (লার্নিং পভার্টি)'-এর সামষ্টিক মূল্যায়নে আমাদের শিক্ষা-দুর্যোগ ব্যাপ্তির প্রমাণ মিলে। এই সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশে স্কুলে যাচ্ছে এমন ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকেরই প্রাথমিক স্তরে ন্যূনতম মানের বিচারে একটি গল্প পড়তে অক্ষম। সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে আনুমানিক লার্নিং পভার্টির হার ৫৮ শতাংশ, তুলনামুলক বিচারে মালয়েশিয়ায় যা মাত্র ১২ এবং শ্রীলঙ্কায় ১৫ শতাংশ।

শিক্ষাবর্ষ সম্পন্ন এবং পরবর্তী শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে শেখার হারের অপর্যাপ্ত প্রবৃদ্ধি আমাদের গ্রামীণ শিক্ষাব্যাবস্থার অন্তর্নিহিত গভীর সংকটের প্রতিফলন। পাসের হার উচ্চ এবং জিপিএ-৫ এবং ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না কর্মদক্ষতা। এর মূল কারণ হলো প্রাথমিক স্তরে ন্যূনতম দক্ষতা শূন্য ও জ্ঞানহীন শিক্ষার অপরিকল্পিত এবং একতরফা প্রসার ।

বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যূনতম দক্ষতা ও সাক্ষরতা জ্ঞানের সংকটের (যাকে বিশ্বব্যাংক বলছে 'লার্নিং ক্রাইসিস') কারণ একাধিক। এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষক স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত শিক্ষা বাজেট, অবকাঠামো ঘাটতি এবং শিক্ষা খাতে অব্যবস্থাপনা ও বৈষম্য।

শিক্ষক স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত শিক্ষা বাজেট এবং অবকাঠামো ঘাটতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে (১৯৭০-১৯৯০) পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশ শিক্ষা বিনিয়োগকে পুঁজি করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক চমক সৃষ্টি করে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং হংকং–এই দেশগুলোতে শিক্ষামুখী উন্নয়ের বহুল সমাদৃত মডেলের মূলে ছিল রাষ্ট্র চালিত মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। এই ধারার অনুসরণে অপেক্ষাকৃত কম উন্নয়নশীল দেশ যেমন, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়া খুব অল্প সময়ে শিক্ষা ও অর্থনীতি দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। ১৯৭০-এর দশকে ইন্দোনেশিয়ার ৬১ হাজারেরও বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণপ্রকল্প একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই দেশগুলোতে সরকার সবসময় শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং জাতীয় আয় অনুপাতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

কিন্তু উন্নয়নের এরকম আঞ্চলিক সাফল্যের অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করে ১৯৭১-২০২১ সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রসর হয় অনেকটাই উল্টো পথে। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালীন সৃষ্ট বৈষম্যে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাপেক্ষে বিদ্যালয়ের ব্যাপক স্বল্পতা দেখা দেয়।[৪] কিন্তু অধিক সংখক নতুন সরকারি বিদ্যালয় নির্মাণের পরিবর্তে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে কেবল ৩৭ হাজারের বেশি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তী দশকগুলোতে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি স্কুলের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। এই ঘাটতি পূরণ করতে ব্যক্তি মালিকানায় ব্যাপক হারে স্থাপিত হয় বিভিন্ন ধারার বেসরকারি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা। সাময়িকভাবে এই বহুমুখী ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করলেও পরবর্তীতে তা নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার চার দশক পরে ২০১৩ সনে প্রায় ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখেরও বেশি শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়।

[৩] Asadullah, M Niaz and Chaudhury, N. (2015) "The Dissonance between Schooling and Learning: Evidence from Rural Bangladesh", Comparative Education Review. 59(3), 447-472.

[8] Asadullah, M Niaz (2010) "Educational Disparity in East and West Pakistan, 1947-71: Was East Pakistan Discriminated Against?" Bangladesh Development Studies, vol. 33(3), 1-46.

কেবল জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে মূল অবকাঠামোগত অসামঞ্জস্য ও বিদ্যমান ঘাটতিগুলো পূরণ হয়নি। একদিকে জিডিপি অনুপাতে শিক্ষকদের বেতন কম, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাপেক্ষে শিক্ষকের স্বল্পতা। উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে শিক্ষার্থী মাথাপিছু শিক্ষকের সংখ্যা বাংলাদেশে সর্বনিম্ন–মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে ৪৫ জন ছাত্রকে সামলাতে হয়। শিক্ষকের মান ও সংখ্যার অপর্যাপ্ততা এই দ্বৈত সংকট সর্বজনীন শিক্ষার নিম্নগতির অন্যতম কাঠামোগত কারণ। ইউনেস্কো প্রস্তাবিত জিডিপির ৪-৬% ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে বাংলাদেশের শিক্ষায় ব্যয় জিডিপির ২.১%, যা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় কম।[৫] শিক্ষা ব্যয়ের কত অংশ অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে আসে, সেই পরিসংখ্যানও হিসাবহীন।

বৈদেশিক রেমিটেন্সের স্থির প্রবাহ, তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় এবং অর্থনীতির স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি হার–এসব কিছুর বিবেচনায় অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। অথচ সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট আর্থিক উদ্বৃত্ত এবং শিক্ষা বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়ার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষা খাতে রয়েছে ব্যাপক বাজেট ঘাটতি। অতীতের তুলনায় মোট শিক্ষা ব্যয়ে বৈদেশিক সহায়তার অংশ ইতিমধ্যেই কমে দাঁড়িয়েছে ৬%। দেশব্যাপী সরকারি বিদ্যালয়ের অপর্যাপ্ততা এবং সরকারি ভর্তুকিপ্রাপ্ত (এমপিও) স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা শিক্ষা অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান ঘাটতিরই প্রতিফলন।

শিক্ষা খাতে অব্যবস্থাপনা ও বৈষম্য

শিক্ষা খাতে অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি রয়েছে ব্যয়ের অস্বচ্ছতা ও অকার্যকারিতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক দুর্নীতি ও অদক্ষতা। মানসম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে রাজনীতিকরণের সংস্কৃতি শিক্ষা খাতে বাড়তি সংকট সৃষ্টি করে। বিগত দশকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে জবাবদিহিতার অবনতি এসব সমস্যা সমাধানের পথ আরও সংকুচিত করেছে।

সীমিত সরকারি বরাদ্দের অপব্যবহার ও অপচয় এবং ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের অনুপস্থিতি আরেকটি কৃত্রিম শিক্ষা সংকট সৃষ্টি করেছে, যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ঘাটতি বা অপ্রতুলতায়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা, অনিয়ম এবং ব্যাপক দুর্নীতি–সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষকদের মান নিম্নগামী। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক স্তরের মাসিক পে-অর্ডার (এমপিও) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারীদের শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৩.৫০ লাখ টাকা থেকে ১৫ লাখ টাকা দিতে হয়।

গ্রামীণ বাংলাদেশে বেশিরভাগ শিশুই শিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ বেতনভোগী কর্মীদের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিতির হার সর্বাধিক। শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতাজনিত কাঠামোগত সমস্যা উপেক্ষা করে জাতীয়করণ-পরবর্তী সময়ে শিক্ষা মানে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন আসেনি। 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির অর্জন বিদ্যালয়ে নিবন্ধন ও সমাপনী পরীক্ষা পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সর্বজনীনভাবে শিক্ষার মান নিম্ন, যার প্রমাণ মিলে শিক্ষা এবং শেখার অসঙ্গতির মধ্যে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারী মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে। এক হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৫৮% বোঝা বহন করে স্কুলগামী শিশুদের পরিবারগুলো। ইউনেস্কোর সমীক্ষা অনুসারে, ধনী পরিবারগুলো দরিদ্র পরিবারের তুলনায় সরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের জন্য কয়েকগুণ বেশি এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ১৫ গুণ বেশি প্রাইভেট টিউশনে ব্যয় করে। এর সামষ্টিক ফলাফল হলো শিক্ষা খাতে সামাজিক বৈষম্য এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা মানের ব্যবধান বৃদ্ধি।

ভ্রান্ত শিক্ষানীতি, অকার্যকর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর একটি কার্যকর ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। ১৯৮৮ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে আরও পাঁচটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। এই নীতিগুলোর মধ্যে খুব কমই শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও উন্নতি আনতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ গঠিত ২০09 সালের শিক্ষা কমিশন বেশ কিছু পরিবর্তনের পর ২০১০ সালে আরো একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করে। কিন্তু প্রস্তাবিত নীতির অধিকাংশই এখনও অকার্যকর রয়েছে।

[৫] Asadullah, M Niaz, Antonio Savoia and Kunal Sen (2020) "Will South Asia achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs experience," Social Indicators Research, 152, 165-189.

নীতিমালা অনুযায়ী, পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬, ৭, এবং ৮ অন্তর্ভুক্ত করার কথা। 'সকলের জন্য শিক্ষা'র আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে শিক্ষা ব্যয়ের সুপারিশকৃত মাত্রা বিবেচনায় প্রেক্ষিত (২০১১-২১) পরিকল্পনার সময়সীমায় জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশে বৃদ্ধি করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটাই হয়নি।

২০১০ সালের শিক্ষানীতির এক দশক পরেও একদিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, অন্যদিকে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়নি। ২০১০ সালের নীতিমালা অনুসারে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরেই শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হবার কথা ১:৩০। অথচ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:৩৭, মাধ্যমিক স্তরে ১:৪৫। শিক্ষক সংখ্যার সংকটের সাথে যুক্ত হয়েছে যোগ্য শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক সূত্র মতে, ৪৬% মাধ্যমিক শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না।

২০১০ সনের শিক্ষা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ও কোনো উন্মুক্ত আলোচনা ছাড়াই বাস্তবায়িত হতে চলেছে নতুন পাঠ্যক্রম/সিলেবাস। অতি সম্প্রতি ২০২২ সালে নীতিমালা সংস্কার করা হচ্ছে যার মূল ভিত্তি হলো একটি যোগ্যতা-ভিত্তিক (কমপিটেন্সি বেসড) জাতীয় স্কুল পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং একইসাথে প্রাথমিক ও জুনিয়র মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষার বদলে থাকবে বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতার মূল্যায়ন। প্রয়োজনীয় দক্ষতা তৈরি এবং অযৌক্তিকভাবে পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার সংস্কৃতি বন্ধের জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে চলেছে এই নতুন পাঠ্যক্রম।

মূল লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতি-বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত এবং একুশ শতকের উপযোগী কর্মশক্তি গড়ে তোলা। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা অর্জন, যেমন কাঠের কাজ, গ্রাফিক ডিজাইন, গাড়ির মেকানিক্স, চাইল্ড কেয়ার এবং প্লাম্বিংয়ের মতো বৃত্তিমূলক বিষয়। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতার বিচারে এই পরিবর্তনগুলো অনেকটাই আকস্মিক ও শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা সাপেক্ষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিগত ঘাটতি উপেক্ষা করে অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী পাঠ্যসূচির সংস্কার হবে হিতে বিপরীত। যেখানে কার্যকর ও ন্যূনতম স্বাক্ষরতাই নিশ্চিত করা হয়নি, জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিশাল ঘাটতি এবং সরকারি বিদ্যালয়ের অভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর শিক্ষা নির্ভর করছে অনিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা ব্যবস্থার ওপর, তখন পাঠসূচিতে কম্পিউটার কোডিং চালু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা ছাড়া কিছু নয়। ৫০ বছর পরে এসে শুধুমাত্র পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংকট মোকাবিলা বিদ্যমান বাস্তবতার একটি সংকীর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নের প্রতিফলন। এছাড়া নাগরিক সমাজকে পাশ কাটিয়ে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এরকম নীতির একপেশি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে একটি দ্বৈততা সুস্পষ্ট। একদিকে নীতিমালার বিপরীতে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় সর্বস্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার সরকারি প্রতিশ্রুতির প্রতি নাগরিক আস্থাহানি ঘটেছে এবং আর্থিকভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠী ব্যক্তি খাতের বেসরকারি শিক্ষার দ্বারস্থ হচ্ছে, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বৈষম্যের সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে ২০১১ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ২০২২-এর একপাক্ষিক ঝটিকা সংস্কার নীতি প্রণয়নে জনপ্রতিনিধিত্ব ও গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্বের ব্যাপারে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। ১২ বছর আগে শিক্ষার সংকট নিয়ে ৫ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নাগরিক সমাজের পক্ষে যেই ৯ দফা প্রস্তাব করেছিলেন সেটাও পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছে। এক অর্থে এসবকিছুই নীতি প্রণয়নে অতীতের গাফিলতি এবং দায়বদ্ধতাহীনতা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পরিচয়।

নীতি পরিবর্তন ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতার এবং এর মূলনীতি থেকে বিচ্যুতির একটি বড় কারণ হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং দৃশ্যমান কিংবা জনপ্রিয় খাতে অর্থের অপচয়। এর আরেকটি দিক হলো 'ডায়াগনিস্টিক ফেইলুর' বা সমস্যা নির্ণয়ে ব্যর্থতা- অত্যাবশকীয় ও ভিত্তিগত দক্ষতা ঘাটতি উপেক্ষা করে উচ্চভিলাষী ও বাস্তবতা-বিবর্জিত লক্ষ্য নির্ধারণ।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের লক্ষ্য দেশের তরুণ কর্মশক্তিকে একুশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত করা। এর জন্য প্রয়োজন 'বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম' কর্তৃক শনাক্ত বিবিধ/বহুমুখী দক্ষতার অর্জন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই তালিকায় রয়েছে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, যোগাযোগ দক্ষতা, সৃজনশীলতা, সমস্যা-সমাধান, সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা, বিশ্ব ও বৈশ্বিক সচেতনতা, সামাজিক দক্ষতা, নাগরিক সাক্ষরতা, সামাজিক দায়িত্ব, উদ্ভাবন দক্ষতা এবং চিন্তা করার দক্ষতা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো আমরা এখনো সর্বজনীনভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী মানের সাক্ষরতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। এই বিবেচনায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালে পরিকল্পিত সংস্কারের অনেকটাই উচ্চাভিলাষী ও অবাস্তব।

উপসংহার

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল সর্বজনীন গুণগতমানের শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য নিরসন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাপক সম্প্রসারণ হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে বাণিজ্য এবং শিল্পায়নে কাঠামোগত কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়লেও সাক্ষরতা, সংখ্যাগণনা, গবেষণা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সূচকে এশিয়ার উচ্চ-মধ্য আয়ের রাষ্ট্রসমূহের সাপেক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে নিচের/পিছনের সারিতে। সরকারি পরিকল্পনা ও নথিপত্রে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা অগগ্রযাত্রার এই অসঙ্গতি স্বীকৃত হলেও এর নিরসনে রাজনৈতিক ঐকমত্য ও ইচ্ছাশক্তির ঘাটতি রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, গত এক দশকে প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমের অনেক পরিবর্তন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের বর্তমান মানব উন্নয়ন অবকাঠামো অত্যন্ত ভঙ্গুর, যা বর্তমান পূর্ব এশিয়ার উন্নয়ন মডেলের সঙ্গেও সংঘাতপূর্ণ।

এই পরিপেক্ষিতে প্রস্তাবিত শিক্ষার্থীমুখী নতুন পাঠ্যক্রম আশাজনক। তবে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজন একাধিক সম্পূরক সংস্কার –শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন, শিক্ষা ব্যবস্থার অরাজানীতিকীকরণ, সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা। এসব কাঠামোগত ঘাটতি উপেক্ষা করে নীতির বিক্ষিপ্ত পরিবর্তন ফলপ্রসূ হবে না। বাংলাদেশের শিক্ষার নীরব সংকটের শিকড় শিক্ষার ও রাজনীতি উভয়ের সাথে বিবিধভাবে সম্পৃক্ত। তাই সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজন মৌলিক ও বহুমুখী পদক্ষেপ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও বর্ধিত পরিসরের কৌশল। তাহলেই নতুন পাঠ্যক্রম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিবাচক প্রমাণিত হবে এবং ২০৪১ এর মধ্যে মেধা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফল হবে।

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ, অধ্যাপক, মোনাশ ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (niaz.asadullah@monash.edu)

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : জাতীয় সংসদ

নিজাম আহমদ

যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের রাজনীতিতে আইনসভা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আইনসভা সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান এবং এর গুরুত্ব সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। আইনসভাকে কেন্দ্র করেই গণতান্ত্রিক রাষ্টের রাজনীতি আবর্তিত হয়। এটা গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং নীতি নির্ধারণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হয়। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করা, বিশেষ করে স্বাধীনতার ৫০ বছরে জাতীয় সংসদ একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন গড়ে উঠতে পারেনি তা ব্যাখ্যা করা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১১টি সংসদ নির্বাচিত হয়েছে – প্রথম দু'দশকে চারটি (১-৪), এবং শেষের তিন দশকে ৭টি (৫-১১)। শেষোক্তদের তুলনায় প্রথম দু'দশকে নির্বাচিত সংসদগুলোর বিভিন্ন কারণে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম ছিল, বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সামরিক শাসনের কারণে। প্রথম চারটি সংসদের কোনোটিই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদ সামরিক বাহিনী বাতিল করে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ জনগণের চাপের মুখে এরশাদ সরকার বাতিল করতে বাধ্য হয়। বিগত তিন দশকে নির্বাচিত সংসদসমূহের প্রায় সবগুলো ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছে। তবে সবগুলো সমভাবে বৈধতা পায়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচিত সংসদগুলো (৫,৭, ৮, ৯) দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদসমূহের (৬, ১০, ১১) চেয়ে অধিকতর বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এগুলো সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকরকরণ ও সংসদকে গতিশীল করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে এগুলো আলোচিত হলো।

অন্য যে কোনো আইনসভার মতো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ তিনটি: আইন প্রণয়ন (Legislation), নজরদারীকরণ (Oversight) এবং নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকরণ (Representation)। প্রত্যেক সংসদই কম–বেশি এ কাজগুলো করেছে। তবে ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের 'নব যাত্রার' পর থেকে এ কাজগুলো পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর 'যৌক্তিক'ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন, পূর্বে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা সংসদে 'হ্যাঁ'/'না' বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সদস্যদের সত্যিকার অর্থে আইন প্রনয়ণে অবদান রাখার সুযোগ ছিল না। সরকার অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিলগুলো পাস করিয়ে নিতেন। কিন্তু বর্তমানে সংসদে উত্থাপিত সকল বিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটিতে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। কমিটিগুলো 'সর্বদলীয়'। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কমিটিগুলো মোটামুটি দায়িত্বশীলতার সাথেই বিলগুলো পর্যালোচনা করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। এ সব কমিটি প্রয়োজনে বিলে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন/পরিবর্ধন সুপারিশ করতে পারে। বিলের ওপর দেওয়া রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এগুলোর বেশির ভাগের ক্ষেত্রে কমিটিগুলো বিভিন্ন পরিবর্তন সুপারিশ করে সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রেরণ করেছে এবং সংসদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ আকারে প্রেরিত বিল পাস করেছে। কমিটি প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। পূর্বে (১-৬ সংসদ) বিল উত্থাপনের পর কমিটিতে প্রেরণের তেমন কোনো উদাহরণ নেই।

সংসদকে শক্তিশালী করার জন্য সপ্তম সংসদে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মন্ত্রণা-লয়-সম্পর্কিত কমিটিগুলোর সভাপতির পদ থেকে মন্ত্রীদের বাদ দিয়ে সাধারণ সদস্যদের (Backbenchers) সভাপতির দায়িত্ব প্রদান এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্য-পরিধি পুনর্নির্ধারণ। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি এখন মন্ত্রণালয়ের যে কোনো অনিয়ম অথবা এর বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগ তদন্ত করতে পারে। কমিটিকে প্রতি মাসে কম পক্ষে একটা সভা করতে হয়। মন্ত্রণালয়ের কোনো কার্যক্রম কমিটির আওতার বাইরে নেই। এ পরিবর্তনের ফলে কমিটিগুলোর শক্তিশালী নজরদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরপর্ব চালু সপ্তম জাতীয় সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে একদিন অর্ধ–ঘণ্টা সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। ব্রিটেন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ বিধান নেই। এছাড়া (নিয়মিত) প্রশ্ন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্পীকারের ক্ষমতা হ্রাস করে তা এখন ব্যালটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এর ফলে প্রশ্ন নির্বাচনে 'সুযোগের সমতা' সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সংসদের কার্যক্রম রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রথম হাসিনা সরকারের একটি বড় অর্জন। এর ফলে সংসদকে অধিকতর উন্মুক্ত এবং দায়বদ্ধ করার ক্ষেত্রে একটা বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন এবং স্বাধীন জাতীয় সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্যতম প্রধান অবদান। প্রথম খালেদা জিয়ার শাসনামলে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা দু'টো গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালুর প্রায় দেড় যুগ পর আবার সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হল। খন্দকার মোস্তাকের সরকারের আমলে একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করা হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রস্তাব আসে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। দুটো বিষয়ে দুটো বেসরকারি সদস্যের বিল উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা। বিল দুটো উত্থাপনের পর তৎকালীন সরকার দলীয় সদস্যরা (বিএনপি) সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। অনেকটা বাধ্য হয়েই তৎকালীন সরকার উভয় বিষয়ে সরকারি বিল উত্থাপন করে। পরবর্তীতে ঐকমত্যর ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন দলের মতানৈক্যের অবসান ঘটে। অন্যদিকে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে শুধুমাত্র সরকার দলীয় সদস্যদের ভোটে জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিল ১৯৯৪ পাস হয়। এর ফলে এবং জাতীয় সংসদ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

জাতীয় সংসদের সদস্যদের জন-সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে ঢাকায় এবং নির্বাচনী এলাকায় অফিস দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাদেরকে অফিস দেওয়া সম্ভব হয় না, তাঁদেরকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক অফিস ভাতা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক সদস্যের কাজের সহায়তার জন্য একজন করে পিএ রাখার বিধান চালু আছে। প্রত্যেক সংসদ সদস্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিতে পারেন এবং প্রতি বছর থোক বরাদ্দ হিসেবে ৫ কোটি পান, যা তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায়, বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার বিধান চালু হওয়ার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সদস্যদের নির্বাচনী এলাকাবিমুখ হবার কোনো সুযোগ ছিল না। বেশির ভাগ সংসদ সদস্য অবশ্য ঢাকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, মূলত ব্যবসা ও অন্যান্য কারণে। তবে প্রায় সকলে অন্তত সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে এলাকায় যান।

উপর্যুক্ত সংস্কারের অবশ্য বড় ধরনের প্রভাব এখনো লক্ষণীয় নয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একমাত্র ব্রিটেন ব্যতীত অন্য কোনো সংসদীয় গণতন্ত্রে এই ধরনের বিধান দেখা যায় না। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এ ব্যবস্থা এখনো কার্যকর হয়নি প্রধানত বিরোধীদলীয় নেতার অনাগ্রহের কারণে। সপ্তম সংসদে চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি প্রধানমন্ত্রীর কোনো প্রশ্নোত্তর পর্বে কোনো বিরোধীদলীয় নেতা উপস্থিত থাকেননি। অথচ ব্রিটেনে প্রধান বিরোধী দলীয় নেতাই প্রধানমন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করে থাকেন। নিয়মিত প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পর্কে সাংবাদিক হারুন-আল-রশিদ–এর মন্তব্য নিম্নরূপ:

"সংসদ জবাবদিহির জায়গা। কিন্তু কোনো প্রশ্ন সরকার, দল বা নিজের জন্য বিব্রতকর হলে মন্ত্রীরা সংসদে তার জবাব দেন না। হত্যা, গুম, খুন বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রশ্ন হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব এড়িয়ে যান। সীমান্তে বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি হত্যার প্রশ্ন হলে জবাব দেন না পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিব্রতকর প্রশ্নের জবাব এড়াতে মন্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো স্থানান্তর করে দিচ্ছেন। পরবর্তী নির্ধারিত কার্যদিবসে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বিধান থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেন না (*প্রথম আলো*, জুন ১৭, ২০১২)।"

সংসদীয় কমিটি কর্তৃক বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এর গুণগতমান বৃদ্ধির সুযোগ এসেছে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় বিল পাসের পর বাস্তবে এর প্রয়োগ সম্পর্কে সংসদ ও কমিটির খুব বেশী অবহিত থাকার সুযোগ নেই। বিশেষ করে আইনের আওতায় যে (প্র)বিধি প্রণীত হয় সেগুলো সংসদ/কমিটির নিরীক্ষণের আওতামুক্ত থেকে যায়। বাংলা দৈনিক *প্রথম আলো* পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে (২৮/০৫/২০২২) কমিটিগুলোকে অনেকটা প্রাণহীন ও নিষ্ক্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি সদস্যদের মধ্যে কমিটি সভায় যোগদানে আগ্রহ অত্যন্ত কম। এছাড়া কমিটি প্রায়শ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না।

সামগ্রিক বিচারে, জাতীয় সংসদ এখনও বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে বিরোধী দলের অবিরাম সংসদ বর্জন এবং সরকার ও বিরোধী দলের বৈরী সম্পর্ক, সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে বিবেচিত হয়। আইন প্রণয়ন ও নজরদারী–এ দু'টো প্রধান কাজের ক্ষেত্রে সংসদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তেমন কোনো অগ্রগতি লক্ষণীয় নয়। বিরোধী দলের অনুপস্থিতেই সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদের অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালিত ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির খুবই কম। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি–এর মধ্যে এক ধরনের সমঝোতার মনোভাব দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে পঞ্চম সংসদে। কিন্তু পরবর্তীতে দু'দলের মধ্যে এক ধরনের অনাস্থার মনোভাব সৃষ্টি হয়। একে অপরকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করা শুরু করেন এবং উভয় দলই নিজেদের দাবি আদায়ে সংসদকে জিম্মি করার চেষ্টা করে। সংসদকে কার্যকর করার ব্যবস্থা না করে সংসদ বর্জনকে দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করে।

বিরোধী দলের সংসদে অবস্থান এবং সংসদ বর্জন উভয় ক্ষেত্রে পঞ্চম সংসদকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায়। বিরোধী দলগুলো পঞ্চম সংসদে প্রথম ১২ অধিবেশনে ২৬৭ কার্যদিবসের মধ্যে ২৫১ দিন উপস্থিত ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আওয়ামী লীগ (অন্যান্যরা) নয় মাস লাগাতার সংসদ বর্জন করে এবং পরবর্তীতে বিরোধী সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ উদাহরণ বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটায়। এক হিসাব মতে, বিরোধী দলগুলো সপ্তম সংসদের ৩৮২ কার্যদিবসের মধ্যে ১৬৩, অষ্টম সংসদে ৩৭২ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ এবং নবম সংসদের প্রথম ৩৭০ কার্যদিবসের মধ্যে ৩১৬ দিন সংসদের কার্যক্রম বর্জন করে। সংসদ অধিবেশনে যোগ দিলেও কারণে/অকারণে বিরোধীরা ওয়াকআউট করে।

খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর মরিস জোনস-এর মতে, কোনো সংসদ কার্যকর হবে কি না তা প্রধানত নির্ভর করে দু'টো বিষয়ের ওপর। প্রথমত সংসদ কীভাবে নির্বাচিত হয় এবং দ্বিতীয়ত সংসদ কিভাবে পরিচালিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে জটিলতা দেখা যায় এবং অতি সত্ত্বর এ জটিলতা থেকে মুক্ত হবার সম্ভাবনাও কম। তথ্য–উপাত্ত অনুযায়ী দেখা যায় যে, যেসব সংসদ তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার অধিকাংশই নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচিত হয়েছে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদ-সমূহ (দশম এবং একাদশ) তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেনি অথবা চেষ্টা করেনি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। এসব সংসদ অন্য সংসদ অপেক্ষা, বিশেষ করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচিত সংসদ থেকে অধিকতর বৈধ বলে বিবেচিত হয়। বাস্তবে এদের বৈধতা নিয়ে তেমন কোনো অভিযোগ আসেনি। অথচ দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন (দশম ও একাদশ) নিয়ে দেশ ও বিদেশে সরকারকে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলে জনগণের রাজনৈতিক আচরণে এক ধরনের স্বকীয়তা লক্ষণীয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে প্রতি ১০ জন ভোটারের মধ্যে ৬ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে ভোট দিয়েছিল। অথচ ২০০১ এবং ২০০৮ সালে ১০ জন ভোটারেরর মধ্যে ৮ এর অধিক ভোটার এ দুটো দলকে সমর্থন দিয়েছিল। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ফলে বহু নাম-সর্বস্ব রাজনৈতিক দল বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের সুস্থ রাজনৈতিক উন্নয়নে নিরপেক্ষ সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

অথচ বর্তমানে বাংলাদেশর দু'টো প্রধান দলের মধ্যে এ বিষয়ের কোনো ঐকমত্য নেই। উচ্চ আদালতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ সরকার দ্রুত এর বিলোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ কোনো ক্রমেই নির্দলীয় পন্থায় নির্বাচন করতে নারাজ। সরকার বলছে, আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা যাবে না। কারণ এ সুযোগ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রায়ে বাতিল হয়ে গেছে। বিএনপি বলছে, তারা দলীয় সরকারের অধীনে কোনো ক্রমেই নির্বাচনে যাবে না। তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের চেয়ে অনেক শ্রেয়। বাংলা দৈনিক *আমাদের সময়*-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাবার সুযোগ প্রসঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক বলেন:

"তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা আগে যেমনটি ছিল হুবহু তেমনটি রাখতে চাইলে রাজনৈতিক দলগুলো তা আলোচনা করে সংবিধান সংশোধন করে তা আবার করতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই। বিএনপি আবার সে প্রথায় ফিরে যেতে চাইছে। এটা সরকার মেনে নিলে সমস্যা নেই। এখন তারা চাইলে আগামী নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য আগের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা করতে পারেন। ফর্মুলাও একই করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি তা যেতে না চান, তাহলে তারা নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে পারেন। অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলায় সংশোধনী এনেও ভুল-ত্রুটিগুলো বাদ দিয়েও করতে পারেন। তারা যে সরকারই যে নামেই গঠন করতে চান না কেন, এজন্য সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে ।"

কোন ফর্মুলাটা সবচেয়ে ভালো–এরকম এক প্রশ্নের জবাবে বিচারপতি খায়রুল হক বলেন: "রায়ে তিনটি অপশন দিয়েছি। এ তিন অপশনের মধ্যে একটি অপশন বেছে নিতে পারেন। কোনো অপশনকেই সবচেয়ে ভালো বলব না। তাহলে তো একটি অপশন দিতাম। তিনটিই মনে হয়েছে ভালো। এখন তারা আলোচনা করে যে কোনো একটি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। তারা রায়ের অপশন না মানলেও নিজেরাও সমঝোতা করে একটি সরকারের ফর্মুলা বের করতে পারেন। সমাধানটাই জরুরি।"

সংসদ শক্তিশালীকরণের অপর এক পূর্বশর্ত হলো এটা কীভাবে পরিচালিত হয়, বিশেষ করে স্পীকার কীভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন, তা দেখা। বাংলাদেশের স্পীকারদের দলীয় আনুগত্যের উদাহরণ প্রচুর। বিভিন্ন কারণে তাঁরা দলের বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না বা নেন না। কিন্তু ভারত এর ব্যতিক্রম। ওখানে স্পীকার দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়, কিন্তু তারা দলীয় স্তাবক হিসেবে কাজ করেন না। উদাহরণ হিসেবে সবাই Mavalankar-এর নামে উল্লেখ করেন। লোকসভার শুরুতে বিরোধী দল যখন অনেকটা 'সংখ্যাহীন' অবস্থায় ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং স্পীকার Mavalankar বিভিন্নভাবে বিরোধীদের মূল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। বিরোধীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। বিরোধীদলের বিশেষ সুবিধা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি 'একক আধিপত্যশীল দল' (One-dominant-party) দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ ধরনের সরকার অবশ্য নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধরনের সরকার আছে।

ভারতে স্বাধীনতার পর প্রথম অনেক বছর এ ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। নেহেরু এবং প্রথম স্পীকার Mavalankar–উভয়ের রাজনৈতিক উদারতার কারণে বিরোধী দলের সদস্যরা সম্মানজনকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এ ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। সরকার দলীয় রাজনীতিবিদদের বিচক্ষণতার কারণে সাদা–কালো উভয় সম্প্রদায়ই সহাবস্থান করছেন। বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ বিরোধীদলকে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এর মূল কারণ নির্বাচন। যেহেতু নির্বাচনে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই, সেহেতু নির্বাচনকে ছোট করে দেখারও কোনো কারণ নেই। প্রতিটি ভোট মূল্যবান যা অর্জন করতে হয়–জোর করে আদায় করা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশ ভিন্ন। এখানে বর্তমানে রাজনীতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দল আছে, সরকার এমন কথা মানতে নারাজ। সরকারি–বিরোধী দল একে অপরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ (political opponent) মনে না করে শত্রু (enemy) হিসেবে ভাবে। এখানেই ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে বাংলাদেশের মৌলিক পার্থক্য। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করেই টিকে থাকতে চায়। এ ধারা যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন সংসদ ও সংদীয় কার্যক্রমের তেমন কোনো প্রভাব মানুষের ওপর পড়বে না। সংসদের থাকা/না থাকা সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে ও জনগণের কাছে ভোটার-বিহীন নির্বাচিত সংসদের তেমন কোনো মূল্য থাকবে না।

নিজাম আহমদ, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার : প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ

ড. তোফায়েল আহমেদ

"A nation may establish a free government but without municipal institutions it cannot have the spirit of liberty"- Alexis de Tocqueville

পটভূমি

'সরকার ব্যবস্থা'র (Govermental System) বিদ্যমান ধারণা মানব মানসে উদয়ের পূর্ব থেকে মনুষ্য সমাজে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার একটি রূপ, কাঠামো ও আদল তৈরি হয়ে যায়। সেটি যতই প্রাচীন, আদিম, অগঠিত হোক, ওই কাঠামোই ছিল মানুষের আদি শাসন কাঠামো, যার উত্তরাধিকার যুগে যুগে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তা আদিম পশু শিকারি, মৎস্য শিকারি, পশু পালক, যাযাবর, যুথবদ্ধ 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ', কৌম সমাজ যাইই হোক, তা ছিল মূলত একটি ক্ষুদ্র এলাকাজুড়ে তাদের জীবনযাত্রা সম্পৃক্ত একটি স্বাভাবিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোর আদি রূপ ছিল এই ব্যক্তি-গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত 'স্থানীয় শাসন'। একটি যুথ প্রধান, দল প্রধান বা একজন বা এক দল শক্তিশালী ব্যক্তির অধীনে জীবনযাত্রাকে চালিয়ে নেয়ার এ নিয়মই ছিল তখনকার শাসন। ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রম সম্পর্ক ও পুঁজির বিকাশ হয়। শিকারি ও পশুপালক হয় কৃষক। কৃষির সঙ্গে দাস শ্রম যুক্ত হয়ে পত্তন ঘটে দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজের। তখনও সমাজ ও রাষ্ট্র থাকে মূলত 'স্থানীয়' এবং তার পরিসর ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কৃষি সভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে বা প্রয়োজনে কেউ হয়ে যায় দাস শ্রমিক, কেউ দাস মালিক। কৃষি আরও বিকশিত হলে কৃষির ভিতর থেকেই পত্তন ঘটে শিল্প সভ্যতার। কৃষি সভ্যতা বিকাশের একটি পর্যায়ে গড়ে উঠে কুশলী শিল্পী-কারিগর গোষ্ঠী। শিল্পী-কারিগরদের সাথে বণিকের মেলবন্ধনে গড়ে উঠে 'নগর'। নগরে গড়ে উঠে শিল্প-কল-কারখানা। এভাবে রাষ্ট্র-সমাজ বড় হতে থাকে। রাষ্ট্র অবশেষে একটি অধিপতি শ্রেণির করতলগত হয়। রাষ্ট্রের একটি শ্রেণি চরিত্র প্রকাশ পায়, সাথে পরিবর্তিত হয় তার আদল, রূপ, কাঠামো ও বিস্তৃতি। স্থানীয়তা জাতীয়তার এবং জাতীয়তা বহু জাতীয়তার প্রভাবাধীন হয়। আদিম সাম্যবাদী যুগ, দাস যুগ, সামন্ত যুগ পেরিয়ে বণিক যুগ, পুঁজিবাদী যুগ এবং হয়ত এখন আমরা উত্তর-পুঁজিবাদী যুগে বাস করছি। কিন্তু ক্ষুদ্র-স্থানীয়তা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়তার একটি পরিসর সবাই সর্বত্র লালন করি।

এককালের ক্ষুদ্র 'নগর রাষ্ট্র' এখন অনেক গ্রাম, নগর, জনপদ, অঞ্চল, দেশ, জাতি নিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র। সমসাময়িককালে তাই 'সুশাসনে'র প্রয়োজনে রাষ্ট্রসমূহ তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভিতরেও ক্ষুদ্রাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। ঊনবিংশ শতক থেকে স্ব-শাসন ও সু-শাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারসমূহের একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সুশাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সাথে সাথে 'স্থানীয়তা'র কদরও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে কেন্দ্রীয় বা জাতি-রাষ্ট্র দুর্বল হয়নি। বরঞ্চ তাতে জাতি-রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে। কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র থেকে বিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র অধিক সক্ষম ও শক্তিশালী, এটি একটি ধ্রুব সত্য হিসাবে শ্রমাণিত। আধুনিক উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রসমূহ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্রের পৃথক ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 'জাতীয় রাষ্ট্র' মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া (Capitalist Production Process) নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করে এবং 'স্থানীয় রাষ্ট্র' (Local State) সামাজিক পুনরুৎপাদন (Social Reproduction) প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো পুঁজিবাদী সমাজ ও উৎপাদন কাঠামো স্থিতিশীল ও পুঁজির স্বার্থে ব্যয় সাশ্রয়ী রাখা। স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তারা স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করায় শ্রমিকের মজুরি ব্যবস্থার ওপর মালিকের বাড়তি চাপ কমে, তাই বলা হয় ব্রিটিশ স্থানীয় সরকার একজন নাগরিকের 'মাতৃ জঠর থেকে গোরস্থান পর্যন্ত সকল সেবা স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের আওতায় দিয়ে থাকে।'

ব্রিটিশ স্থানীয় রাষ্ট্র একজন নাগরিকের পুরো জীবনচক্রব্যাপী নানা প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে। এতে পুঁজিপতির শ্রম ব্যয় কম হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভালো করতে পারে। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে পুঁজিপতি শ্রেণির জন্য অব্যাহতভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক, শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির যোগান নিশ্চিত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ সহনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য শ্রমিকের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ-যানবাহন, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি সামাজিক ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় রাষ্ট্র দেখাশোনা করে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে শুধু অর্থ যোগান দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। নানা সামাজিক সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র চাপ, তাপ ও ভারমুক্ত থাকে। মোট কথা, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্র পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে কাজ করে। পরস্পরের তাপ ও চাপ ভাগাভাগি করে গহণ করায় সমাজ স্থিতিশীল থাকে।

কর্ম ও দায়িত্বের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন হলে কর্ম সম্পাদন দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। সব দায়িত্ব একক স্কন্ধে বহনের ফলাফল হয়, পরিশেষে অনেক কর্ম অসম্পাদিত বা অর্ধ-সম্পাদিত থাকা। উন্নত পশ্চিমা সমাজে নগর শাসনের স্ব-শাসিত কাঠামো তাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই দেখা যায় ব্রিটিশ রাজনীতির দুইটি ধারা–একদিকে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে 'হোয়াইট হল' দখল অপরদিকে স্থানীয় নির্বাচনের রাজনীতির মাধ্যমে 'টাউন হল' দখল। জাতীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয় যাতে তারা কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অপরিহার্যভাবে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধারণা, এতে অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি সাশ্রয় হয়, জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়, স্থানীয় ও জাতীয় গণতন্ত্র উভয়ই শক্ত ভীতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজও রাষ্ট্র পুঁজির নির্বিঘ্ন বিকাশের স্বার্থে সুশাসনকে অপরিহার্য মনে করে। সুশাসনের অন্যতম উপায় হিসাবে স্ব-শাসিত বিকেন্দ্রায়িত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সক্ষম ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সে সুশাসনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পশ্চিমা উদারনৈতিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ বিশেষত জন স্টুয়ার্ড মিল (১৮৫৯), এলেক্সি ডি. টকিয়াভেলি (১৮৩৫), হেরল্ড লাস্কি (১৯৩১), জেরেমি বেনথাম, সিএইচ উইলসন (১৯৪৮) প্রমুখ দার্শনিকগণ জাতীয় গণতন্ত্র বিকাশের পূর্বশর্ত হিসেবে স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে একটি প্রধান উপজীব্য হিসেবে ভেবেছেন। সমাজে স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠশালা হিসেবে স্থানীয় সরকারকে মূল্যায়ন করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশরা যে স্থানীয় শাসন কাঠামো ভারতে চালু করে তাতে সত্যিকার অর্থে ব্রিটেনের স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আদল কোনটারই প্রতিফলন ঘটেনি। এখানে রাজ-অনুগত তথা রাজ কর্মচারি অনুগত বশংবদ একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি ভিতরগতভাবে প্রকৃত অর্থে গুরুত্ব পায়। ব্রিটেনে তৎকালে 'হুইগ ও ইউটিলিটারিয়ান'দের দ্বন্দ্ব ভারতে এসে 'মনরো এবং কর্ণওয়ালিশ' স্কুলের দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ পেলেও উদারভাবাপন্ন 'মনরো স্কুল' ভারতে পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের সংকীর্ণ কর্তৃত্ববাদী ধারাটি জয়লাভ করে। তৎকালে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে মেকেলের প্রাচ্য পদ্ধতি ও বেন্টিকের পাশ্চাত্য পদ্ধতির দ্বন্দ্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখরা ভারতীয় হয়েও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ অবলম্বন করায় শিক্ষাক্ষেত্রে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার যে সুফলটা পাওয়া যায়, স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বিষয়টি সেভাবে উপলব্ধি করেনি। শুরুতেই ভারতের স্থানীয় শাসন কাঠামো ও কার্যক্রম দুটোই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ পথেই বিকশিত হতে থাকে এবং পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক ধারার চর্চা ব্যাহত হয়।

ভারতে স্বাধীনতার পর গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ' আন্দোলন, জওহরলাল নেহেরুর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আধুনিক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও এস কে দে (নেহেরু মন্ত্রীসভার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার) নামক আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙ্গালির অবদানে ভারতে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট'-এর পথ ধরে গান্ধীর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্বপ্ন তার অনুপস্থিতিতেও একটি ভিন্নতর গতি ও মাত্রা লাভ করে। যদিও ভারতীয় সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর অম্বেদকার স্থানীয় সরকার বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সংবিধানে যথাযুক্ত স্থান দেননি। তার বিশ্বাস ছিল ভারতে পঞ্চায়েত প্রথা শক্তিশালী করা হলে তাতে কর্তৃত্ববাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। দলিতসহ সকল নিচু বর্ণের মানুষ সাংবিধানিকভাবে উচ্চবর্ণের শাসনের একটি স্থায়ী ফাঁদে পড়ে যাবে। ভারতের রাজ্য স্তরের রাজনীতিতে উদার ও বামদের সফলতার হাত ধরে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চায় 'স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, উড়িষ্যাসহ বেশ কিছু বাম ও অ-বাম শাসিত রাজ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখার পর ১৯৮৯ সালে কংগেস সরকার লোকসভায় একটি বিল পেশ করে। বিলটি লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হলেও রাজ্যসভায় পরাস্ত হয়। কংগ্রেস তখন সংসদ বাতিল করে নতুন নির্বাচন দিলে ভিপি সিং এর নেতৃত্বে 'ইউনাইটেট ফ্রন্ট' সরকার পুনরায় বিলটি সংসদের মুখোমুখি করে। একমাসের মাথায় ভিপি সিং সরকারের পতন হলে পুনরায় বিলটির ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সনে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হবার পর বিলটি পুনরায় উঠানো হয়। দীর্ঘ আলোচনা এবং অনেক পরিবর্তনের পর ২২ ডিসেম্বর ১৯৯২ সনে লোকসভায় বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় এবং পরের দিন একইভাবে রাজ্য সভায়ও বিলটি পাস করা হয়। তারপর সারা ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলোর অর্ধেকের বেশি এ বিল অনুসমর্থন করার পর রাষ্ট্রপতি ২০ এপ্রিল ১৯৯৩ সনে সংশোধনী বিলে স্বাক্ষর করেন, এটি আইনে পরিণত হয় এবং 'ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী ১৯৯২' হিসাবে গেজেটভুক্ত হয়। একইভাবে সম্পূরক আরও একটি সংশোধনী ৭৪তম সংশোধনী হিসেবে পাস করা হয়। এভাবে সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকারের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভিত্তি ভারতে গঠিত হয়। তবে তা ছিল অনেকদিন ধরে অনেক লোকের চিন্তা, কর্ম ও সংগ্রামের ফসল।

ভারতের নানা স্তরের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক চিন্তকগণ এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন লেখালেখি ও আন্দোলন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, উড়িষ্যার নবীন পটনায়ক, কেরালার ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, কর্ণাটকের নাজির সাহেব এ বিল রচনা ও এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। প্রবীণ কংগ্রেস রাজনীতিবিদ এবং সে সময়কার ইউনিয়ন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মণি শংকর আয়ার মন্ত্রী হবার পূর্বে এবং মন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সকল দল সর্বসম্মতভাবে সংবিধানের এ সংশোধনী বিল পাস করে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এ সংশোধনী বলে ভারতের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় সরকারের স্বপক্ষে কিছু 'গ্যারান্টি ক্লজ (Clouse)' যুক্ত হয়। ভারতে স্থানীয় সরকার রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হস্তান্তরিত বিষয়। স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনসমূহ স্ব স্ব রাজ্যের বিধান সভায় পাস করা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের পর সকল রাজ্যের জন্য সংবিধানের স্থানীয় সরকার বিষয়ক সাংবিধানিক বিধানসমূহ মানা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। নতুবা রাজ্য স্তরের বিধানসভার সদস্যগণ বাংলাদেশের মতো স্থানীয় সরকার নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে নতুন শক্তিকেন্দ্র হিসাবে সহজে গহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে অনেক আপোষ-রফা করা হয়েছে। বিশেষত স্থানীয় সরকারের জেলা ও ব্লক পর্যায়ের এককে তাদের সদস্যপদ দান ও ভোটাধিকার প্রয়াগের বিধান তার একটি উদাহরণ। ভারতে স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ:

১. ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি রাজ্যে গ্রাম, মধ্যবর্তী পর্যায় ব্লক বা মণ্ডল ও জেলা এ তিন পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ থাকবে। শুধু ২০ লাখের কম জনসংখ্যা সম্বলিত রাজ্যসমূহে স্ব স্ব বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই স্তর স্থানীয় সরকার হতে পারবে।

২. পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও নজরদারির জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় 'গ্রাম সভা' বা 'গ্রাম সংসদ' গঠিত হবে।

৩. সংবিধান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শাসন ইউনিট যথা কেন্দ্র বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকারের (পঞ্চায়ত রাজ প্রতিষ্ঠান ও পৌর এলাকা) কর্ম এলাকা ও বিষয় বিভাজন করে পৃথক চারটি বিষয় তালিকা করে দিয়েছে, যথা- ফেডারেল বিষয়াবলি, রাজ্য সরকারের বিষয়াবলি, স্থানীয় সরকারের বিষয়াবলি এবং যৌথ বিষয়াবলি বা কনকারেন্ট সাবজেক্ট, এভাবে রাষ্ট্রের তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাজের বিষয়সমূহের পরিষ্কার বিভাজন রয়েছে। এভাবে স্থানীয় সরকারের জন্য ২৯টি বিষয় নির্ধারণ করা আছে, যেখানে রাজ্য সরকার বা ইউনিয়ন সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

৪. অর্থায়নে ন্যায্যতা ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রতি পাঁচ বছর পরপর রাজ্য পর্যায়ে 'স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন' গঠিত হবে। এ কমিশনের সুপারিশের আলোকে রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করবে।

৫. প্রতিটি জেলায় একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (District Planning Authority) গঠিত হবে, যার সভাপতি থাকবেন জেলা পরিষদ সভাপতি এবং সদস্য-সচিব হবেন জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (DC& DM)। এ কর্তৃপক্ষ জেলার সকল পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও অর্থায়ন মূল্যায়ন ও মনিটরিং করবে।

৬. নারী, সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ ও তা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে। নারীর জন্য সদস্যপদ, সহ-সভাপতি ও সভাপতির পদও সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে একটি একীভূত আইনের অধীনে গঠিত হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। একীভূত আইনের কারণে গাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নির্বাচন একটি একক তফশিলে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সব রাজ্যে সমানভাবে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে তা বলা যাবে না। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ভারতে একাডেমিক ও রাজনীতিবিদরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় এবং প্রতিনিয়ত এর নানামুখী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ উপমহাদেশের বিভক্তি ও স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের উত্তরাধিকার নিয়ে স্থানীয় সরকার শুরু করলেও প্রদেশ ও কেন্দ্রের সরকার ও সংবিধান নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার কারণে স্থানীয় সরকারের বিষয়টির ওপর স্পষ্ট আলোচনা শুরু হয়নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের বিধান করা হলেও সেটি কার্যকর হয়নি। ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসন জারি হবার পর ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়। সামরিক ফরমানে দেশ চলতে থাকে এবং ১৯৬২ সনে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি 'সংবিধান' প্রণীত হয়। সে সংবিধান ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মূলনীতিসমূহের আমূল পরিবর্তন করে সর্বময় ক্ষমতার আধার একটি 'রাষ্ট্রপতি শাসিত'

সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলুপ্ত করে একটি নতুন নির্বাচনী পদ্ধতি সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটদানের ৮০,০০০ (৪০,০০০+৪০,০০০) মৌল একক বা ৮০,০০০ নির্বাচক মণ্ডলীর (etectoral college) রূপরেখার অধীনে একটি নতুন রাজনৈতিক (শাসন) কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। যার নাম দেয়া হয় 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy)। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে চার স্তরের একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সারা পাকিস্তানে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে আংশিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। সে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ছিল কেবল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা মেম্বার নির্বাচন। এই নির্বাচিত মেম্বার বা সদস্যরাই সারা পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে মোট পাঁচটি নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী হিসাবে ভোট দিতেন। তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, জেলা কাউন্সিলের সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (East Pakistan Provincial Assembly), জাতীয় পরিষদের সদস্য (Pakistan National Assembly) এবং দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকারী ছিলেন। আর চার স্তরের স্থানীয় সরকারসমূহ ছিল মূলত ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। থানা ও বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল পুরোপুরি সরকারি কর্মচারি নিয়ন্ত্রিত। থানা কাউন্সিলের সভাপতি থাকতেন এসডিও এবং সংশ্লিষ্ট থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস চেয়ারম্যান। জেলা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন, তবে চেয়ারম্যান ছিলেন পদাধিকার বলে ডেপুটি কমিশনার। বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার।

১৯৫৮ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ উত্তরাধিকার হিসেবে যে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড ব্যবস্থা ছিল তা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা থেকে জনপ্রতিনিধিত্ব ও কার্যক্রমের দিক থেকে ছিল অনেক অগসর, গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় সমস্ত জাতীয় রাজনীতির ভার ক্ষুদ্র, অসহায় ও রাজনৈতিকভাবে অসংগঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের ওপর অর্পিত হয়। দেশের বাকি জনগণ ভোটাধিকার বঞ্চিত রাখা হয়। এ দুর্বহ রাজনীতির ভার তারা শেষ পর্যন্ত বইতে ও সইতে পারেননি। ড. আখতার হামিদ খানের ভাষায়, "আয়ুব গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর মতো মাস্টার বিল্ডার হতে চেয়েছিলেন, মাও এর সেই রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য, সংগঠন ও দূরদর্শিতা তার ছিল না। তিনি স্থানীয় সরকারের ভেঁড়ার উপর জাতীয় রাজনীতির ষাঁড়কে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে নিরীহ ও দুর্বল ভেঁড়া মারা যায়।"

১৯৭০ সালে জনগণ ভোটাধিকার ফেরত পায়। ১৯৭০ এ প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দল নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে আইনগতভাবে প্রাপ্য ক্ষমতা হস্তান্তরের অস্বীকৃতির কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার মানুষ রুখে দাঁড়ালে সেখানে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। এ যুদ্ধে জয় লাভ করে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তৈরি হয় সংবিধান এবং ১৯৭৩ সালে নতুন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন হয়। বাকি বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে ১৯৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার গঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের ভৌত ও সাংগঠনিক অবকাঠামো থাকলেও স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসাবে জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন করা হয়নি। বিভাগীয় কাউন্সিলের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। থানা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল কোনো কাঠামো সৃষ্টি না করে নানাভাবে সরকারি সার্কুলার দিয়ে তা চালানো হয়। অবশ্য এরই মধ্যে ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার 'জেলা গভর্নর'এবং পরবর্তীতে বিএনপি সরকার ১৯৮৯ সালে এমপিদের মধ্য থেকে একজনকে 'জেলা উন্নয়ন সমন্বয়ক' নিয়োগ করে। একসময় 'জেলা মন্ত্রী'রও পদ সৃষ্টি করা হয়। আদালতের রুলিংয়ে জেলা মন্ত্রীর পদ বাতিল হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে দশ বছর থানা পর্যায়ে 'উপজেলা পরিষদ' চালু হয় ও কার্যশীল থাকে। ১৯৯১ সনে বিএনপি সরকার গঠন করে উপজেলা বাতিল করে; বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাতে কোনো আপত্তি করেনি। বিলুপ্ত হবার ১৮ বছর পর ২০১০ থেকে আবার আওয়ামী সরকার নতুন একটি আইন (১৯৯৮) করে উপজেলা পরিষদ চালু করে (২০০৯)। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর প্রথমবারের মতো ২০১৬ সালে জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়। এখন দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এ তিন স্তরের স্থানীয় সরকার চালু আছে। নগর অঞ্চলে চালু আছে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন।

ব্রিটিশদের বিকৃত ও বিকলাঙ্গ স্থানীয় সরকার ও শাসন যা ভারতে চালু করা হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষ সেখান থেকে বের হবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং অন্তত ৪৫ বছর পর সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে একটি নিজস্ব নতুন পথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান ব্রিটিশদের বিকলাঙ্গ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে। তার নাক, মুখ, হাত, পা সব ঠিক রেখে একটি চোখ কানা করে রাখে এবং তার মাথাটি নষ্ট করে কেটে ফেলে; সে শুধু একদিকে দেখতে পেত, কিন্তু কোনো কিছু চিন্তা করার মতো মাথাটি তার ছিল না। তাদের হয়ে সকল চিন্তার দায়িত্ব ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের। তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যেন তারা শুধু আয়ুব খান আর মুসলিম লীগ ছাড়া আর কিছু দেখতে, শুনতে ও বুঝতে না পারে এবং স্থানীয় আমলারা তা নানাভাবে নিশ্চিত করতেন।

স্বাধীনতার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নতুন রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোতে তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। বাঙ্গালি রাজনৈতিক নেতা এবং আমলারা ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানের রেখে যাওয়া 'জুতা পায়ে এবং টুপি মাথায়' দিয়ে একই কায়দায় শাসনকার্য চালানোতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন। ক্ষমতা ও কাজ সবাইকে নিয়ে সবার সাথে নির্বাহের ধারণা দ্রুত ভুলে গিয়ে সকল ক্ষমতা এককভাবে হস্তগত করার একটি নেশা জাতির অধিপতি (elite) শ্রেণির একটি মনোরোগ বা অবসেশনে পরিণত হয়। স্থানীয় কোনো ক্ষমতা কেন্দ্র গড়ে উঠুক, সমাজে বহুত্ববাদিতার বিকাশ হোক, শত ফুল ফুটে উঠুক, সবার হাতে শক্তি ও মাথায় সৃজনশীল বুদ্ধি জাগত হোক–তা উপলব্ধি করার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা নতুন নেতৃত্ব দেখাতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর রচিত ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থানীয় সরকারের যে শাসন কাঠামো, ভূমিকা ও আইনগত ব্যবস্থার নির্দেশনা দেওয়া হয় (১৯৭২ এর সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ) তা পুরোপুরি উপেক্ষিত থাকে। সকল প্রশাসনিক স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার গঠনের নির্দেশনা থাকলেও শুধুমাত্র ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। বাকি উপরের তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় এবং ওই তিনটি স্তর বা এককে আমলা শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। স্বাধীনতার পর ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অদল-বদল করলেও কাজের বিধানগুলোই কার্যকর থাকে। যাকে বলা যায় 'নতুন বোতলে পুরাতন মদ'। দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হলেও ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসমূহে আয়ুব প্রণীত 'রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি' বহাল রাখা হয়। ভারতের সংবিধান সংশোধন বিতর্কে স্থানীয় সরকারের কাঠামো বিষয়ক বিতর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাঠামো যেহেতু সংসদীয়, তাই স্থানীয় সরকার কাঠামোও হতে হবে সংসদীয়। তাই সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানগণ সরাসরি নির্বাচিত না হয়ে সদস্যদের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্য হতে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ আইন ১৯৭৩-এর বেশির ভাগ ধারা উপধারা মৌলিক গণতন্ত্র আইনের 'অবিকল নকল'। স্বাধীনতা ও সংবিধানের মূল দর্শনকে ধারণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়নি। 'বিসমিল্লায় গলদ' দিয়ে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে যে স্থানীয় শাসনের সূচনা এখন বারে বারে তার পুনরাবৃত্তি ও জটিলতা। তার ওপর বিকৃতিকে বহু গুণ বৃদ্ধি করেছে পর পর দুটি সেনা শাসন (জিয়া ও এরশাদের ১৯৭৬-১৯৯০ সময়কাল)। ১৯৯১-এর পরিবর্তনের পর জনমনে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা জাগিয়ে তা আবারও ধীরে ধীরে 'স্বৈরতান্ত্রিকতা'র চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার দর্পণে বিষয়টিকে দেখলে তাকে নৈরাশ্যজনকও অন্ধকার যুগের পুনঃসূচনা বলা যায়।

স্বাধীনতার ৫০ বছর। এখন দেশ পার করছে 'স্থানীয় সরকার'-এর অলীক ও ভ্রমাত্মক স্বপ্ন কল্পনার এক বিমূর্ত সময়। জনঅংশগহণমূলক নির্বাচন নির্বাসিত। জনবান্ধব ও ত্যাগী নেতৃত্ব পাবার সকল পথ রুদ্ধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি সামরিক ও বাংলাদেশি সামরিক একনায়কতান্ত্রিক ও অ-সামরিক স্বৈরশাসনকালসমূহে যে বশংবদ স্থানীয় সরকার কাঠামো ছিল এবং আছে তাতে যতটুকু গণতন্ত্র ও জনঅংশগহণের নাম-গন্ধ অবশিষ্ট ছিল, বাংলাদেশের ২০১৪ পরবর্তী বেসামরিক নির্বাচিত সরকারের শাসনকালে তার ছিটে ফোঁটাও আর থাকল না, এটি ছিল কল্পনারও অতীত। কিন্তু বাস্তবে তাই-ই হলো।

২০১৬ এবং ২০২১ সালের দু'টো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদগুলোর রাজনৈতিক ও সামাজিক অপ্রাসঙ্গিকতা ও অন্তসারশূন্যতায় আর আশাবাদী হবার কোনো অবকাশ নেই। উপজেলা পরিষদ কার্যত অকার্যকর। সাম্প্রতিককালের উপজেলা পরিষদ নিয়ে উচ্চ আদালতের দুটি রায়, পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা দেখলেই তা বোঝা যায় এটিও কাজ করছে না। জেলা পরিষদ কার্যত কাজ-কর্মহীন একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং মূলত একটি রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনর্বাসন কেন্দ্র। জেলা পর্যায়ের কোনো সরকারি দপ্তরের সাথে তার কোনো সংযোগ নেই। নেই এ প্রতিষ্ঠানের কোনো জনসম্পৃক্ততা। স্থানীয় নির্বাচনে এত খুন-জখম ও নির্বাচনী অনিয়ম ও সন্ত্রাস, তা নিয়ে সরকার উচ্চবাচ্য করছে না। দেশের বুদ্ধিজীবী-গবেষকগণ কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত, বাকি বুদ্ধিজীবীরা হতভম্ব-হতবুদ্ধি। জনগণ নির্বিকার-নির্লিপ্ত, ভীতি-কাতর ও বিমূঢ় দর্শক।

এখন এ রকম একটি অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, স্থানীয় সরকারের এ দশা সম্পর্কে সরকার, রাজনীতিবিদ, আমলা, বুদ্ধিজীবী এবং খোদ স্থানীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে কি না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার তাড়না অন্তত সবার বিবেকের থাকত। এখন আপাতত সে রকমের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তারপরও বলা যায়, আমাদের রাজনীতিবিদ ও একাডেমিয়া ভারতের স্থানীয় শাসন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন একান্তভাবে কাম্য। এ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে একটি নতুন বিপ্লব সাধন করতে পারে। সে লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি সুপারিশ দেয়া হলো। এগুলো ইতোপূর্বে আমার এবং আরও অনেকের গবেষণায় এসেছে।

১. দেশের খ্যাতনামা একডেমিক ও রাজনীতিবিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করে স্থানীয় শাসন (Local Governance Reform) সংস্কারের বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সুপারিশ সরকার গহণ করতে পারে;

২. দেশে যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আদল, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত হোক। তাতে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচিত হবে;

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে একীভূত একটি শাসন ও সেবা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণীত হোক;

৪. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হোক। এখন দেশের পরিকল্পনা কাঠামোতে জাতীয়-স্থানীয় কোনো যোগসূত্র নেই;

৫. স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন ও অর্থায়নের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক অর্থায়ন ও পরিকল্পনা চালু করা হোক।

উপসংহার

উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ ও দেশসমূহের বিকেন্দ্রায়িত স্থানীয় শাসন ও সেবা পদ্ধতিও ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার একটি কারণ, আমাদের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়ে সহায়তা করা। বি আর অম্বেদকার যে কারণে ভারতীয় সংবিধানে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন, আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার তথা তৃণমূলে বর্তমানে (২০১৪-২০২২) সেরকম একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তৎকালীন ভারতের বর্ণভেদ প্রথা ও দলিত নিপীড়ন প্রভৃতিকে সামনে রেখে গ্রাম ও গ্রাম স্বরাজ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'a sink of localism' and 'a den of narrow mindedness'। আমাদের ২০১৬ এবং ২০২১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যে চিত্র তা কোনোভাবে স্থানীয় গণতন্ত্রের কোনো সুখকর চিহ্ন বহন করে না। সহিংস 'চর দখলের মহোৎসব'-এর মতো একটি অবস্থা। শত মানুষের মৃত্যু ও হাজার মানুষ জখম হচ্ছে। নির্বাচন মানে যেন একটি খুন-জখমের মৌসুম! সরকার, নির্বাচন কমিশন–কেউ এ বিষয়ে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাই বলে এ অবস্থাটিকে একটি অনিশ্চিত এবং আরও একটি অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়া যায় না। জাতি হিসেবে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের বের করতে হবে। সে জন্য উপরের পাঁচটি সুপারিশ পত্রস্থ করা হলো, এ সুপারিশগুলো যথাযথ মনোযোগ পেলে আমাদের স্থানীয় সরকার, স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে।

ড. তোফায়েল আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসনের সাবেক অধ্যাপক

webpage: tofailahmed.wordpress.com; e-mail:tofail101@gmail.com

ব্যাংকের খেলাপি ঋণকে পুরোপুরি কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলা হয়েছে

ড. মইনুল ইসলাম

জনাব মোস্তফা কামাল অর্থমন্ত্রী হিসেবে ২০১৯ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ২০১২ সাল থেকে প্রচলিত তিন ধরনের শ্রেণিকরণের নিয়ম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের অনাদায়ী ঋণকে শ্রেণিকরণের নূতন নিয়ম চালু করেছে: এক, পূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদের তিন মাস পর যেসব ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হতো, সেগুলোকে 'সাব-স্ট্যান্ডার্ড ঋণ' শ্রেণিকরণ করা হতো, নূতন নিয়মে তিন মাসের পরিবর্তে সময়টা ছয় মাস করা হয়েছে; দুই, পূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদের ছয় মাসের বেশি যেসব ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হতো, সেগুলোকে 'ডাউটফুল ঋণ' বলা হতো, নূতন নিয়মে নয় মাস মেয়াদোত্তীর্ণ হলে 'ডাউটফুল' শ্রেণিকরণ হচ্ছে; এবং তিন, আগের নিয়মে নয় মাসের বেশি কোনো ঋণ খেলাপি হলে 'মন্দঋণ' শ্রেণিকরণ করা হতো, এখন এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য ঋণ অনাদায়ী হলে 'মন্দঋণ' বা 'লস' শ্রেণিকরণ করা হচ্ছে। ২০১২ সালের নিয়মটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর চাপে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরানো শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে ফিরে গেল। এরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক মন্দঋণ 'রাইট অফ' বা অবলোপনের নিয়মনীতি অনেকখানি শিথিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করল: আগের নিয়মে যেখানে পাঁচ বছরের খেলাপি মন্দঋণ 'রাইট অফ' করার যোগ্য বিবেচিত হতো, সেক্ষেত্রে নতুন নিয়মে দুই বা তিন বছরের মন্দঋণও 'রাইট-অফ' করায় এখন কোনো বাধা নেই। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, মন্দঋণ 'রাইট-অফ' বা অবলোপন করার মানে হলো ওই অবলোপনকৃত মন্দঋণের হিসাবটা ব্যাংকের মূল ব্যালেন্স শিট থেকে অপসারণ করে আরেকটি লেজারে হিসাবটা সংরক্ষণ করা। 'রাইট-অফ' করার দুটো শর্ত হলো: ১) ওই ঋণ সুদাসলে আদায়ের জন্য ব্যাংক মামলা দায়ের করবে, ২) যে পরিমাণ ঋণ 'রাইট-অফ' করা হয় তার সম-পরিমাণ অর্থ 'প্রভিশনিং' বা 'সঞ্চিতি' করতেই হবে। প্রভিশনিং মানে হলো, ওই পরিমাণ অর্থ অন্য কাউকে ঋণ দেওয়া যাবে না। রাইট অফ করার ফলে ব্যাংকের ক্লাসিফাইড লোনের পরিমাণ ঠিক অতটুকু কম দেখানো যায়। অতএব, নতুন নিয়ম চালু করে ক্লাসিফাইড লোন কমানোর হাতিয়ার ব্যাংকগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হলো। আর একটা সুবিধে ঘোষিত হলো, মামলা করার বাধ্যবাধকতার জন্য আগে যে সর্বনিম্ন সীমা (ফ্লোর) ছিল ৫০ হাজার টাকা, ওটাকে বাড়িয়ে দুই লাখ টাকা করা।

তারপর ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, মাত্র ২ শতাংশ খেলাপি ঋণ প্রথম কিস্তিতে শোধ করলে ঋণ খেলাপিকে ১০ বছর সময় দেওয়া হবে, যার মধ্যে তিন মাসের কিস্তিতে মাত্র ৭ শতাংশ সুদে বাকি ঋণ শোধ করা যাবে (পরে তিনি বললেন সুদের হার ৯ শতাংশ হবে)। এরপর ৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তিনি বললেন, "আমি খেলাপি ঋণের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে কীভাবে জেলে পাঠাব?" (দুর্নীতির দায়ে যদি দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী জেল খাটেন, তাহলে 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি' ব্যবসায়ীরা আইন মোতাবেক শাস্তি পেলে তার প্রাণ কাঁদবে কেন? ব্যবসায়ীরা কি আইনের উর্ধ্বে?)

২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তিনি সংসদে বললেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন কার্যকর করার মাধ্যমে ঋণ খেলাপিদেরকে মাফ করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। সর্বশেষ, যে ১৫ জন খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে ২০১৫ সালে মন্দঋণ রিস্ট্রাকচারিং-এর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল যে ওই সুবিধা গ্রহণ করলে আর কখনো নতুন করে ঋণ রিশিডিউলিং-এর সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু, ১৫ জনের মধ্যে মাত্র চারজন ওই শর্ত মেনে সুযোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। বাকি ১১ জনকে আর রিশিডিউলিং সুযোগ দেওয়া হবে না বলা হলেও অর্থমন্ত্রীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে আবারও ঋণ রিশিডিউল করার অনুমতি দিয়েছে।

উপরের পদক্ষেপগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, একজন 'ব্যবসায়ী অর্থমন্ত্রী' তার ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী বন্ধুদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দরদ দেখিয়ে চলেছেন। অর্থমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, তিনি আর খেলাপি ঋণ এক টাকাও বাড়তে দেবেন না। অতএব, একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্টের চাল প্রয়োগ করে তিনি মন্দঋণ রাইট-অফ করার পদ্ধতি সহজ করে দিয়েছেন, যাতে ক্লাসিফাইড লোনের এই শিথিল পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ব্যাংক 'মন্দঋণ রাইট-অফ করা' বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। তিনি মন্দঋণ আদায়ের জন্য খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে দুই শতাংশ ঋণ প্রাথমিক কিস্তিতে পরিশোধ করে যে ১০ বছরের সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, সে সুবিধা নিয়মনিষ্ঠ ঋণ ফেরত দাতারা পান না। কিন্তু, এ-ধরনের পরিবর্তন খেলাপি ঋণ সমস্যাটিকে আড়াল করার পন্থা হলেও মন্দঋণ আদায় করার কোনো নিষ্ঠাবান প্রয়াস এর মাধ্যমে জোরদার করার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০০২ সালে মন্দঋণ রাইট-অফ সিস্টেম চালু হওয়ার পর ২০১৯ সালের জুনের শেষে রাইট-অফ করা ঋণের পরিমাণ ৫৪ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা। ২৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখের *দৈনিক প্রথম আলোয়* প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ক্লাসিফাইড লোন ২০১৯ সালের ৩০ জুন তারিখে এক লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। উল্লেখিত এই অংকের চাইতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ অনেক বেশি–এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে

বলছি। কয়েকটা উদাহরণ: ১) ব্যাংক মালিক, পরিচালক ও বড় ঋণ খেলাপিদের অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে যেসব খেলাপি ঋণ রিশিডিউলিং (পুনঃতফশিলীকরণ) এর নিয়মানুগ সীমা তিনবারের বেশি, এমনকি নয়/দশবার পর্যন্ত, রিশিডিউল করা হয়েছে সেগুলো লুকিয়ে ফেলা হয়েছে; ২) যেসব খেলাপি ঋণের মামলা অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন, সেগুলোকে খেলাপি ঋণ বলা যায় না; ৩) যেসব পুরানো মন্দঋণ অবলোপন করা হয়, সেগুলোর ওপর সুদ ধার্য হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে অবলোপনকৃত মন্দঋণের সুদাসলে পরিমাণ প্রকাশিত হয় না; ৪) খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে রায় হওয়ার পর যারা উচ্চতর আদালতে আপিল করে আপিল মামলাগুলোকে নিজেদের অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছে তাদের খেলাপি ঋণকে আপিল মামলা চলার সময়ে খেলাপি ঋণ অভিহিত করা যায় না। দেশের সিংহভাগ খেলাপি ঋণ এই কয়েকটি কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাসিফাইড লোনের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর মানে, খেলাপি ঋণ সমস্যা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি সংকটজনক। উপরন্তু, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের *দি ডেইলি স্টার* পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যে ২০১৮ সালে যেখানে পুরো বছরে ২৩ হাজার ২১০ কোটি টাকা ঋণ রিশিডিউল করা হয়েছিল, সেখানে ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসেই ২১ হাজার ৩০৮ কোটি টাকার ঋণ রিশিডিউল করে ফেলেছে ব্যাংকগুলো, এবং মাত্র তিনবার কোনো ঋণ রিশিডিউল করার নিয়ম থাকলেও সেটা মানা হয়নি। আরও মারাত্মক হলো, তৃতীয়বার রিশিডিউল করার জন্য ঋণের ৫০ শতাংশ ফেরত দেওয়ার শর্ত থাকলেও তা মানা হয়নি। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের *দি ডেইলি স্টার* পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন খবরে জানা যাচ্ছে, আইএমএফ ২০১৯ সালের জুনের শেষে বাংলাদেশের খেলাপি ঋণ দুই লাখ ৪ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে বলে জানিয়েছে, যার মধ্যে উল্লিখিত এক লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা ক্লাসিফাইড লোনের সাথে আদালতের ইনজাংশানের কারণে ঝুলে থাকা ৭৯ হাজার ২৪২ কোটি টাকা, স্পেশাল মেনশান একাউন্টের ২৭ হাজার ১৯২ কোটি টাকা এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে রিশিডিউলিং করা ২১ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অংকের সাথে রাইট-অফ করা মন্দঋণ যোগ করলে ওই সময়েই মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ তিন লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস মহামারি আঘাত হানার পর ক্লাসিফাইড ঋণের হিসাব আর প্রকাশ করা হচ্ছে না। সুতরাং, এসম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য আমাদের জানা নেই।

প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অর্থনীতি

ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের গুরুতর সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ না নিয়ে বরং ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার সরকার দফায় দফায় নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। দেশে এখন ৬৫টি ব্যাংক চালু রয়েছে। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ একবাক্যে স্বীকার করবেন যে দেশে এখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এবং যেসব বিবেচনায় ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তাতে অর্থনীতির স্বার্থ কিংবা জনগণের আর্থিক লেনদেনের যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চাইতে বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তারকে উৎসাহিত করা হলে অনেক কম ব্যয়ে ওই সুবিধা অর্জন করা যেতো, আসলে প্রয়োজনাতিরিক্ত জেনেও নূতন নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্রেফ স্বজনপ্রীতির তাগিদে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তিকে বারবার অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এমনকি, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত আবুল মাল আবদুল মুহিতের প্রকাশ্য আপত্তিকেও পাত্তা দেওয়া হয়নি। ব্যাংকের মালিকানার লাইসেন্স অনেক ভাগ্যবানের জন্য কোটিপতি হওয়ার সহজ পথ করে দিয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে তিন বছর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর মহাপরিচালক থাকার সময় থেকেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং বিষয়ে আমার গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। সে জন্যই প্রাইভেট ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের হাঁড়ির খবর আমার জানা আছে।

অনেকেই হয়তো খেয়াল করেন না যে, এদেশের ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ সংকট যত গুরুতরই হোক, দেশের প্রায় প্রতিটি প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে যাচ্ছে। অতএব, ব্যাংকের লাইসেন্স যারা বাগাতে পেরেছেন তারা এদেশে অতি সহজেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান ওই মুনাফার ভাগ পাওয়ার কারণে। সেজন্যই 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' ক্লাসিক নজির হলো ব্যাংকের মালিকানা বণ্টনের এই রাজনৈতিক দুর্নীতি। আর, এই ব্যাংক-উদ্যোক্তাদের অনেকেই তাদের রাজনৈতিক কানেকশনের জোরে বা প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়তার পরিচয়ে কিংবা তার প্রিয়পাত্র হওয়ায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স পেয়ে বিনা মূলধনে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের অর্থে তাদের ব্যাংকের উদ্যোক্তা-পরিচালক বনে গেছেন। মানে, তাদের শেয়ারের জন্য বিনিয়োজিত পুঁজিও হয়তো ব্যাংকের অন্যান্য পরিচালকরা পরিশোধ করে দিয়েছেন। এই পরিচালকদের সিংহভাগ আবার দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, যারা ব্যাংকের মালিকানা পেয়ে এদেশের ব্যাংকঋণের ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যাংক কোম্পানি আইনে নিজেদের ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে তাদের ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলেও একে অপরের ব্যাংক থেকে দেদারসে ঋণ গ্রহণের সংস্কৃতি (লোন সোয়াপ) এদেশে ভয়াবহ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছে। দেশের কয়েকজন রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ী বিভিন্ন পন্থায় এসব রাজনৈতিক কানেকশনওয়ালা ব্যাংক-লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে

নানা নামে একাধিক ব্যাংকের বিপুল শেয়ার কিনে নেওয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যাংকঋণ নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর দখলে নিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ী নাকি এখন সাতটি ব্যাংকের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন! একজন ব্যক্তিকে এতগুলো ব্যাংকের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দিয়ে পুরো ব্যাংকিং খাতকে বড়সড় ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ব্যাংকের মালিকানায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এত সহজ সুযোগ অন্য কোনো দেশে চালু আছে কি না আমার জানা নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাংকের এসব মালিকদেরকে অভিহিত করা উচিত 'কথিত মালিক', কারণ ব্যাংকের আসল মালিক আমানতকারীরা। ব্যাংকের উদ্যোক্তারা কিংবা পরিচালকরা এমনকি শেয়ার হোল্ডাররা ব্যাংকের 'প্রকৃত মালিক' নন, কারণ একেকটি ব্যাংক যে হাজার হাজার কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে ঋণপ্রদানের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে তার তুলনায় সম্মিলিতভাবে উপর্যুক্ত তিন ধরনের মালিকদের বিনিয়োজিত পুঁজি (paid-up capital) ১০ শতাংশের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটি আধুনিক অর্থনীতির সুস্বাস্থ্যের জন্যে সুস্থ ও সবল (robust) ব্যাংকিং সিস্টেম যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দার পর এখন বিশ্ববাসীর জানা হয়ে গেছে। বিশেষত, আমাদের দেশে পুঁজিবাজার যেহেতু অনুন্নত এবং গুরুত্বহীন রয়ে গেছে তাই ব্যাংকিংকে এদেশে এখনো স্বল্পমেয়াদী ঋণের পাশাপাশি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রধান যোগানদাতার ভূমিকাও পালন করে যেতে হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির যে সুবাতাস বইতে শুরু করেছে সেটাকে বেগবান করতে হলে জাতীয় সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করতেই হবে। আর, এজন্য প্রয়োজন সবল ও স্বচ্ছ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও বেশি শৃঙ্খলাধীন ও সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রক্রিয়াকে জোরদার করা। নূতন নূতন ব্যাংক চালু হওয়ায় এখন আমানত নিয়ে যে অসুস্থ কাড়াকাড়ি পরিদৃষ্ট হচ্ছে তার ফলে ব্যাংকাররা মরিয়া হয়ে নানা ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিচ্ছেন, যা ব্যাংকিং খাতের পরিবেশ দূষিত করে চলেছে।

সমাধান চাইলে কোন পথে যেতে হবে?

আসলে দেশে ব্যাংকঋণ নিয়ে একটা 'পাতানো খেলা' চলছে। সমস্যার প্রকৃত রূপটি সরকার, ব্যাংকার এবং ঋণখেলাপি সবারই জানা আছে। সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কেও এই তিন পক্ষের সবার স্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু, জেনেশুনেই সরকার সমাধানের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছে না। ফলে, এখনো দেশের ব্যাংকিং খাতের প্রধান সমস্যা রয়ে গেছে রাঘববোয়াল ঋণ খেলাপিদের কাছে আটকে থাকা বিপুল খেলাপি ঋণ। এই ঋণ খেলাপিদের প্রায় সবাই 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি', যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, তারা তাদের ঋণ ফেরত দেবেন না। কারণ, তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং আর্থিক প্রতাপ দিয়ে তারা শুধু ব্যাংকিং খাত নয়, দেশের সংসদকেও দখল করে ফেলেছেন। ২০১৮ সলের নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ৬১.৭ শতাংশই ব্যবসায়ী। তাদের সিংহভাগই ব্যাংকের মালিক/পরিচালক। সংসদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য প্রকৃতপক্ষে ঋণখেলাপি হলেও প্রবন্ধে উল্লিখিত পন্থাসমূহ অনুসরণ করে তারা তাদের খেলাপি ঋণ আড়াল করে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন! তবুও বলছি, খেলাপি ঋণ সমস্যার সমাধান চাইলে নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১) খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য বিদ্যমান বিচার প্রক্রিয়া বাংলাদেশে এতই অকার্যকর ও দীর্ঘসূত্রতার শিকার রয়ে গেছে যে, ২০০২ সালে 'রাইট-অফ' সিস্টেম চালু হওয়ার পর অনেক 'রাইট-অফ' করা মন্দঋণ গত ২০ বছরেও আদায় করা যায়নি। এটা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে এদেশের রাজনীতি 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কালচারকে' লালন করে চলেছে। অতএব, সংশোধনও শুরু করতে হবে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকেই। আর, এজন্য জরুরি প্রয়োজন হলো তিন বছরের জন্য একটি খেলাপি ঋণ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক ব্যাংকের শীর্ষ দশজন ঋণখেলাপিকে চূড়ান্ত বিচারে দ্রুত শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ব্যবস্থা হয় রদ করতে হবে, নয়তো আপিলের ক্ষেত্রে রায়ে উল্লিখিত ঋণের অর্থের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ব্যাংককে ফেরত দিলে আপিলের সুযোগ দেওয়া যাবে মর্মে শর্ত আরোপ করতে হবে। আপিলের সুযোগ দেওয়া হলে শুধু এই আপিল মামলাগুলোতে সর্বোচ্চ দু'মাসের মধ্যে রায় প্রদান করার বাধ্যবাধকতাসহ হাইকোর্টের এক বা একাধিক বেঞ্চকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে (designated bench)। অর্থঋণ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল দায়ের করে বিচার প্রক্রিয়াকে বছরের পর বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাচ্ছে বলেই খেলাপি ঋণ সমস্যার কোনো সুরাহা হচ্ছে না, এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েই বলতে চাই। আমি মহাপরিচালক থাকার সময়ে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত প্রথম 'নুরুল মতিন মেমোরিয়াল লেকচারে' তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবউদ্দীন সর্বপ্রথম প্রত্যেক ব্যাংকের শীর্ষ দশজন ঋণখেলাপিকে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। পরের বছর ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় নুরুল মতিন মেমোরিয়াল লেকচারে দেশের আরেকজন প্রধান বিচারপতি ও

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সর্বজনশ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপস বিচারপতি হাবিবুর রহমান ঋণখেলাপি ট্রাইব্যুনাল গঠনের আহ্বানটির পুনরুক্তি করেছিলেন। কিন্তু, দেশের একজন রাষ্ট্রপতি এবং দু'দুজন প্রধান বিচারপতির ওই আহ্বানটি তদানীন্তন সরকারের কিংবা পরবর্তী ২৩ বছর ধরে ক্ষমতাসীন দেশের কোনো সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। আরও মারাত্মক, ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীরা তাদের খেলাপি ঋণের সিংহভাগ যে দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছেন সেটাও ক্ষমতাসীন মহলের অজানা নয়। আর, ওই পাচার হওয়া অর্থ যে কস্মিনকালেও ব্যাংকে ফেরত আসবে না তা-ও সরকার এবং উচ্চপদে সমাসীন ব্যাংকারদের জানার কথা। অতএব, এই 'ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের' যথোপযুক্ত বিচার যদি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা না যায়, এবং অর্থঋণ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় যদি উচ্চতর আদালতে আপিল করে বছরের পর বছর আপিল মামলাকে অর্থশক্তি ও রাজনৈতিক শক্তির জোরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়, তাহলে 'রাঘববোয়াল ঋণ খেলাপিদেরকে' বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে শায়েস্তা করে খেলাপি ঋণ আদায় অসম্ভব থেকে যাবে। শত শত কোটি টাকা মন্দঋণ অনাদায়ী রেখে বেশ কয়েকজন 'রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি' মারা গেছেন, অন্যরা হয়তো বিদেশে ভেগে গেছেন। তবে, তাদের অধিকাংশই উচ্চ আদালতের মামলাগুলো বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রেখে বহাল তবিয়তে দেশের ব্যবসা ক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে দাবড়ে বেড়াচ্ছেন। তাদের অনেকেই ব্যাংকের মালিক বনে গেছেন, পরিচালক হিসেবে বছরের পর বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে ব্যাংকিং খাতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এফবিসিসিআই এর বেশ কয়েকজন সভাপতিও এই 'রাঘববোয়াল ঋণখেলাপি' হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এর মানে, এদেশের রাজনীতি 'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি কালচারকে' সযতনে লালন করে চলেছে।

২) একইসাথে, ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য আলাদাভাবে ন্যায়পাল নিয়োগেরও ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায়। ন্যায়পাল মহোদয় শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের কাছে রিপোর্ট করবেন। তাকে সহায়তা করার জন্য প্রতিটি ব্যাংকে 'এথিকস অফিসার' থাকবেন, যিনি শুধু ন্যায়পালের কাছে দায়ী থাকবেন। ন্যায়পাল অফিসের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।

৩) মন্দঋণ আদায়ের জন্য 'ডেট রিকভারি এজেন্সি' কিংবা 'এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি' গঠন জরুরি। এই এজেন্সি বা কোম্পানিকে আদায় করা মন্দঋণের ১০ শতাংশ কমিশন দেওয়া হবে, এবং প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪) অর্থঋণ আদালতে কিংবা ট্রাইব্যুনালে কোনো ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় হলে সহ-জামানত বা বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম করার জন্য বর্তমানে যে আবারও মামলা করতে হয় সে নিয়ম বাতিল করতে হবে। রায়ের পর সরাসরি সম্পত্তি জব্দ করার আইন রয়েছে মালয়েশিয়ায়।

৫) প্রতিটি ব্যাংকের শীর্ষ দশটি ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম মন্দঋণের জন্য এক বছরের বেশি সময়ের জন্য তালিকাভুক্ত হলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর key person(s) কে গ্রেফতার করতে হবে এবং/অথবা তাদের পাসপোর্ট জব্দ করতে হবে। গ্রেফতার করা হলে তাদের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ওই আটককে জামিন-অযোগ্য করতে হবে। তাদের ভিআইপি/সিআইপি মর্যাদা বাতিল করতে হবে। তাদেরকে কোনো সরকারি দায়িত্বে নিয়োগ করা যাবে না, কোনো সরকারি ডেলিগেশনেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এমনকি, কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ করা যাবে না। ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নামের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি ব্যাংকের শীর্ষ দশটি ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের key person(s) এর নামও প্রতি মাসে একবার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করবে।

৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত করার প্রয়োজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে বাতিল করা প্রয়োজন, যাতে সরকারি-বেসরকারি-বিদেশি সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শুধুই বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে।

৭) আরও বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যক ব্যাংক চালু করে যেসব নেতিবাচক অভিঘাত ডেকে আনা হয়েছে সেগুলো নিরসনের একটা পথ খুলে দিতে পারে অদূর ভবিষ্যতে বেশ কিছু দুর্বল ব্যাংককে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কয়েকটি ব্যাংকের সাথে একীভূত করার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ-ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপটি হতে পারে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কয়েকটি ব্যাংককে 'মার্জারের' মাধ্যমে বড় ব্যাংকগুলোর সাথে একীভূত করার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাথে অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে একীভূত করলে তেমন কোনো নেতিবাচক অভিঘাতের সৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। এমনকি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকেরও আলাদা অস্তিত্বের এখন প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে একীভূত করে একটি ব্যাংকে পরিণত করলেও তেমন ক্ষতির আশংকা নেই। অন্যদিকে, দেশে এতগুলো 'ইসলামী ব্যাংকের' আবশ্যকতা নেই।

৮) আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, বড় বড় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে পুঁজির জন্য শেয়ারবাজারে যেতে। পুঁজিবাজারের দুর্বলতার জন্য এদ্দিন যাবত দীর্ঘমেয়াদী বড়সড় ঋণের জন্য যেভাবে ব্যাংকিং খাতকে বিকল্প পুঁজির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে আমাদেরকে সরে আসতেই হবে। নইলে খেলাপি ঋণের সমস্যা থেকে দেশ পরিত্রাণ পাবে না। 'সর্বোচ্চ সিলিং' আরোপের চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে মনে করি। আমাদের দেশের উদ্যোক্তারা পুঁজির জন্য এখনো পুঁজিবাজারে যেতে বড়ই অনাগ্রহী রয়ে গেছে। একই কারণে, এদেশের ৯৫ শতাংশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পারিবারিক গণ্ডিতে গড়ে ওঠা 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি' থাকতেই বেশি পছন্দ করে, 'পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি' হলে যে নিয়ম-নীতির আওতায় আসতে হবে সেগুলো এড়াতে চায় বেশিরভাগ শিল্পপতি-ব্যবসায়ী। কিন্তু, ব্যাংকিং খাতকে যদ্দিন আমরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে বাধ্য করব, তদ্দিন ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে না। অতএব, এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে আমাদেরকে।

৯) ব্যাংক মালিক ও ব্যাংকের পরিচালকদের 'ইনসাইডার লেন্ডিং' এবং 'লোন সোয়াপ' বন্ধ করার আইনকে সুনির্দিষ্ট ও কঠোর করতে হবে। ব্যাংকের মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অব ব্যাংকস'-কে হয় বেআইনি ঘোষণা করতে হবে, নয়তো ওই সংগঠনের কার্যক্রম কোনোমতেই যাতে দেশের আর্থিক নীতিকে কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে না পারে তার জন্য তাদের 'লবিয়িং তৎপরতার' ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল করতে হবে।

উপরে যেসব সংস্কারের কথা উল্লিখিত হলো, সেগুলোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে পথ দেখানোর প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাংকিং সংস্কার কমিশন গঠন করা হোক।

ড. মইনুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বুদ্ধিবৃত্তির পঞ্চাশ বছর : নতুন ভ্রমে ঢাকা পুরাতন ভ্রম

সলিমুল্লাহ খান

'বুদ্ধিজীবী' কথাটি বাংলা ভাষায় ঠিক কখন হইতে চালু হইয়াছে জানি না, তবে সে বেশিদিন আগের কথা নয়। ঢাকায় ১৯২০ সালের দশকে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' সে আন্দোলনের দুই প্রধান নেতার একজন কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯৫১ সনে প্রকাশিত তাঁহার বিশালকায় 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থে বুদ্ধিজীবী শব্দটি পাওয়া যায় না। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা আজও বুদ্ধির মাঠে মোটের উপর আমদানিনির্ভর। শুদ্ধমাত্র শব্দের ক্ষেত্রে নয়, ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেও তাঁহাদের এই আমদানি-নির্ভরতা–একান্ত অন্ধ না হইলে–আপনার চোখে না পড়িয়া যাইবে না।

প্রশ্ন উঠিবে বুদ্ধিজীবী কে বা কে নয়। এক প্রস্তাব অনুসারে সকলেই বুদ্ধিজীবী নয়। মাত্র কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী। আরেক প্রস্তাব মোতাবেক মানুষ মাত্রেই বুদ্ধিজীবী। কেননা একমাত্র বুদ্ধির–যাহার অবিসংবাদিত প্রকাশ ভাষা–বলেই মানুষ প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে। তবে কাজের কথা এই, বুদ্ধিজীবীর কাজ সকলেই করেন না। বুদ্ধিজীবীর কাজ কী? বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলিতে লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতি উচ্চ ব্যবসায়ী লোকদের বোঝানো হয়। তাঁহাদের পংক্তিতে শিল্পী, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও ধরা হইয়া থাকে।

আবার উল্লেখ থাকে যে লেখক মাত্রেই বুদ্ধিজীবী বলিয়া গণ্য হইবেন না। 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি এস্তেমাল না করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার বিশিষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' নিবন্ধে তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন: "যদি এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিয়াছে বুদ্ধিজীবী কি বিশেষ কোনো শ্রেণীর নাম? অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ইহার উত্তর দিয়াছেন–না। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক শ্রেণীরই নিজস্ব বুদ্ধিজীবী থাকে। যাহাদের নিজস্ব (ইংরেজি জবানে যাহাকে বলে অর্গানিক) বুদ্ধিজীবী থাকে না তাহারা বুদ্ধির জন্য অন্য কোনো শ্রেণীর উপর নির্ভর করেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও সঙ্গত কারণে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং একই কারণে তাঁহারা দলে দলে শাসক শ্রেণীর সহিত যুক্ত হইয়াছেন। যে সকল সমাজে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা বিপ্লবী আন্দোলন সফল হইয়াছে সেইসব সমাজের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে বুদ্ধিজীবীরাই আপন আপন শ্রেণীর নেতৃত্ব দিয়াছেন। আর যে সকল সমাজে স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে–অন্তত আপোসরফায় পৌঁছিয়াছে–সেখানে বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের তল্পিতল্পা বহন করিয়াছেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা অতিমাত্রায় রাষ্ট্রনির্ভর। এই নির্ভরতা শুরু হইয়াছিল পরাধীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকার সময়। ইহার একটি কারণ এদেশে জাতীয় চেতনা বা জাতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিবার আগেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতিবিকশিত রাষ্ট্রের এই ঐতিহ্যটা শুদ্ধমাত্র ইংরেজ আমলের নয়, তাহার ঢের আগের। ইংরেজরা এই দেশে যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ভারত, পাকিস্তান কি বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীগুলি সেই কাঠামোটাই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সত্যকার অর্থে নতুন রাষ্ট্র কেহই গঠন করেন নাই। আজও এই উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের অধীনস্ত কর্মচারীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। ভারত আর পাকিস্তানে কিংবা বাংলাদেশেও এখন পর্যন্ত সেই ঐতিহ্যই সমানে চলিতেছে।

মধ্যখানে–১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর–বাংলাদেশে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের একাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ বিদেশি সাহায্য সংস্থা বা ফাউন্ডেশনের সরাসরি কর্তৃত্বে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহার পরিণতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ের জন্যই সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। দেখা যাইতেছে, বুদ্ধিজীবীরা এখন হয় নিজস্ব (অর্গানিক) কিংবা পরগাছা (বা প্রাতিষ্ঠানিক) এই দুই চরিত্রের কোনো একটিতে–অথবা উভয়ের একটা খিচুড়িতে বিভক্ত হইয়া–বিরাজ করিতেছেন।

১) 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন, শুনলে বাঙলাদেশ স্বাধীন হতো না। এখন যা বলছেন, শুনলে বাঙলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।'–পঞ্চাশ বছর আগে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন আহমদ ছফা। গত পঞ্চাশ বছরে তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন তো দূরের কথা, বিদ্যমান কাঠামোই বরং আরো পাকাপোক্ত হইয়াছে।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত মোট সতেরটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধের সংকলন আহমদ ছফার 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস'। প্রথম নিবন্ধেই তিনি যোগ করিয়াছিলেন: "আগে বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানী ছিলেন, বিশ্বাসের কারণে নয়–প্রয়োজনে। এখন অধিকাংশ বাঙালী হয়েছেন–সেও ঠেলায় পড়ে। কলাবরেটরদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা অন্ধভাবে হলেও ইসলাম পাকিস্তান ইত্যাদিতে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে। আবার স্বাধীন বাঙলাদেশে চতুঃস্তম্ভের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, এমন অনেক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, যাঁরা সারা জীবন কোনো কিছুতে যদি নির্দ্ধিধায় বিশ্বাস করতে পেরেছেন–সে বস্তুটির নাম সুবিধাবাদ।" গ্রন্থের ভূমিকা উপলক্ষে বদরুদ্দীন উমর মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' "মূলতঃ বাঙলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদেরই একজনের স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা নিঃশঙ্ক সমালোচনা"। 'মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের একজন' হওয়া সত্ত্বেও আহমদ ছফাকে এই সমালোচনা বাবদ কম মূল্য পরিশোধ করিতে হয় নাই। প্রথমবারের পঁচিশ বছর পর–১৯৯৭ নাগাদ–গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশ উপলক্ষে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন: "মাঝে মাঝে এমন চিন্তাও মনে আসে, লেখাটি যদি না লিখতাম, হয়তো আমার জীবন অন্যরকম হতে পারতো। এই লেখাটির জন্যই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর রোষ আমাকে পেছন থেকে অভিশাপের মতো তাড়া করেছে। অদ্যাবধি আমি জীবনে তৃপ্তি কি বস্তু তার সন্ধান পাইনি। আগামীতে কোনদিন পাবো, সে ভরসাও করিনে।" এই লেখার চারি বছরের মাথায়–২০০১ সালে–আহমদ ছফা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। লাশে পরিণত হইবার পরও 'একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর রোষ' হইতে তিনি পরিত্রাণ লাভ করেন নাই। অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়াও আমরা তাঁহাকে কবরস্থ করার মতো সাড়ে তিন হাত জায়গা মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরগাহে পাই নাই।

এই 'একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী' সম্প্রদায়ের পেছনে রাষ্ট্রের পরোক্ষ হাতটাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ১৯৯৭ সালে–'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থের নতুন ভূমিকাচ্ছলে–তিনি লিখিয়াছিলেন: "এই গ্রন্থে যে সকল মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো বাহাত্তর সালে যতটা প্রাসঙ্গিক এবং সত্য ছিল, এই সাতানব্বই সালে তাদের তাৎপর্য ক্ষুন্ন না হয়ে বরং অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।" পঁচিশ বছর পর–অনেকটা রোমন্থনের ভঙ্গিতে–ত্রিকালদর্শী তিরেসিয়সের মতো আহমদ ছফা যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত–পরবর্তী পঁচিশ বছরেও–সমান অকাট্য রহিয়াছে।

"সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে", আহমদ ছফা লিখিয়াছিলেন, "জাতীয় মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা–এই রাষ্ট্রীয় চতুঃস্তম্ভের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ফেলেছিলেন। রেডিও টেলিভিশনে তোষামোদ, চাটুকারিতা, নির্লজ্জ আত্মপ্রচার মানুষের সুস্থ কাণ্ডজ্ঞানকে একরকম মুছে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সন্ত্রাস, গুম, খুন, ছিনতাই, দস্যুতা, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচার হত্যা–এগুলো একান্তই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের হনন প্রবৃত্তি, লোভ-রিরংসার এরকম নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের সিংহদুয়ার খুলে দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই ধরনের একটি মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই একটি পালনীয় ভূমিকা ছিল, একটা দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা সেদিন তাঁদের ওপর আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে যাবতীয় অমানবিক কর্মকাণ্ডে সরকারের মদদ দিয়ে নিজেদের আখের গোছাবার কাছে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

১৯৯৭ সালের পর–এই ২০২২ সাল নাগাদ–আরো পঁচিশ বছর পার হইয়াছে। চারিপাশে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া মহাপ্রাণ আহমদ ছফা ঐ বছর যাহা লিখিয়াছিলেন পরের পঁচিশ বছরে কি তাহার কোনো গুণগত পরিবর্তন হইয়াছে? যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা নেহায়েতই পরিমাণগত পরিবর্তন। বৃদ্ধি পাইয়াছে শুদ্ধ কণ্ঠস্বরের উত্তাপটুকুন। আহমদ ছফার রচনা–যাহাকে বলা যায় ইতিহাসের প্রগাঢ় সমাচার–আরো একটু উদ্ধার করার দরকার আছে: "বর্তমানে সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকাটি পালন করছেন, তা কিছুতেই বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে আওয়ামী-বাকশালী বুদ্ধিজীবীরা যে কাপুরুষোচিত ভূমিকা পালন করেছে, তার চাইতে বেশি আলাদা নয়। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় বাহাত্তর-তেয়াত্তর সাল থেকে টাইম মেশিনে চড়ে তাঁরা এই সাতানব্বই সালে পদার্পণ করেছেন। বাহাত্তর সালে তাঁরা যেভাবে, যে ভাষায় অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলতেন, বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলতেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতি অঙ্গীকার প্রকাশ করতেন–এই সাতানব্বই সালেও তাঁরা একই ভাষায় সেই পুরোনো বুলিগুলো উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে [তা এই:] তাঁদের কণ্ঠস্বর এখন অধিকতরো দ্বিধা এবং জড়িমাহীন।" পরের পঁচিশ বছরে এই কণ্ঠস্বরটি শুদ্ধ দ্বিধাহীন নয়, পরম নির্লজ্জ, এবং বেপরোয়াও হইয়াছে।

২) এই অপরাধজনক মনোভাবের–এই কপট কণ্ঠস্বরের–ফলাফল কি হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ সংক্ষেপেই করা যাইতে পারে। বর্তমানে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' পরম অপমানিত হইয়াছে, আর স্বভাবতই তাহার সত্য ইতিহাস চরম উপেক্ষিত হইতেছে। এই অপরাধে মধ্যশ্রেণীভুক্ত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের দায়ও কম নয়। বুদ্ধিজীবীরা কতগুলি সত্য যেন বেশি বেশি আড়াল করিতেই বেশি তৎপর। কি রাষ্ট্রের উদ্যোগে কি বুদ্ধিজীবীদের প্রবর্তনায় ১৯৪৭ সালের আগের–অনেক দীর্ঘদিনের–পরাধীনতা বিরোধী

গণবিদ্রোহ কিংবা সর্বসাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রামের কোনো খবর পর্যন্ত নাই, উদ্‌যাপন তো দূরের কথা। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মাত্র ১৯৪৭ সালের পর শুরু হয় নাই।

সুদূর অতীতে না গিয়া অন্তত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের আর কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস আমল করা ছাড়া আজিকার বাংলাদেশের আগা কিংবা গোড়া কোনোটাই বোঝা যাইবে না। এখন যে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এই দেশের পরিসর তাহা তো ১৯৪৭ সালেই নির্ধারিত হইয়াছিল। সেই সীমানা শুদ্ধমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দান বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না, মানিতে হইবে ইহার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হইতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদেরও একটা ভূমিকা ছিল। ভুলিলে চলিবে কি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত–'আমার সোনার বাংলা'–১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল?

১৯৪৭ সালের উত্তাপের মধ্যে ১৯০৫ সালে সৃষ্ট পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রবল আবেগে–বুঝিয়া বা না বুঝিয়াই–পাকিস্তানে যোগ দিয়াছিলেন। তাহারা চাহিয়াছিলেন স্বাধীনতা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার। আর মাত্র পাইয়াছিলেন 'পোকায় কাটা' পূর্ব পাকিস্তান। গালিচার নিচে চাপা দিয়া নয়, এই সত্য বিশ্লেষণ করিয়াই বুদ্ধিজীবীরা আগাইবেন। ইহা আশা করা কি অন্যায়? পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় 'ধর্মতান্ত্রিকতা' বা ঐ জাতীয় কোনো আদর্শের জয় ছিল না। ছিল বাংলাদেশের জনসাধারণের জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় আত্মপরিচয় আদায়ের লড়াই মাত্র। ১৯৪৯ সালের পর যাঁহারা আওয়ামী মুসলিম লীগ–কিংবা খানিক পরে আওয়ামী লীগ–গঠন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তো পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ছিলেন। এ কথা অস্বীকার করিয়া চলা মানে কল্পনার রাজ্যেই বসবাস করা–বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার, জাতীয় স্বাধীনতার সত্যকার একটি গোড়ার কথা অস্বীকার করা।

আরো একটা কথা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাষ্ট্রস্বরূপ পাকিস্তান ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় নাই। ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় নাই বলিয়াই–চূড়ান্ত অবিচার, নির্যাতন এবং কদাকার শোষণ চালু থাকার কারণেই–অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের মোহভঙ্গ হইয়াছিল। এতদিনে পরিষ্কার হইয়াছে যে কোনো ধর্মই পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল না। ধর্মই যদি পাকিস্তানের ভিত্তি হইত তো অত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত না। তাহার আরেক প্রমাণ–পাকিস্তান গিয়াছে, কিন্তু ইসলাম ধর্ম যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ন্যায়বিচারের দাবি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বাংলাদেশের জাতীয় চেতনা। আমার এই যুক্তির পক্ষে প্রমাণ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণাপত্রে উচ্চারিত তিন অঙ্গীকার : 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'।

আহমদ ছফার পর্যবেক্ষণ যদি অসত্য না হইয়া থাকে তবে মানিতে হয়, বাহাত্তর হইতে পঁচাত্তর সালে সরকার এই জাতীয় চেতনার বা জাতীয় স্বাধীনতার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করিতে কিংবা–তাঁহার জবানে বলিতে–'একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে' পর্যন্ত পারেন নাই। এই ঘটনার ফলাফল শুদ্ধ ১৯৭৫ সালের ট্রাজেডি নয়, সেই ফলাফল আরো সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। বুদ্ধিজীবীরা এই ট্রাজেডি হইতে কোন শিক্ষাটা গ্রহণ করিয়াছেন? যদি আদৌ কোনো শিক্ষা গ্রহণ করিতেন তবে এখন তাঁহারা যে প্রহসনে অভিনয় করিতেছেন তাহা অন্তত করিতেন না।

আহমদ ছফার অপরাধ তিনি এই নির্জলা সত্য কথাগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়াছিলেন : "একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে একটা জাতির সমগ্র জনগণের জাগ্রত আকাঙ্ক্ষার যখন পরাজয় ঘটে, তখন স্বভাবতই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা যে আদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতির ভবিষ্যত নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে ভিতটিই ছিল নাজুক, দোদুল্যমান এবং দুর্বল। আওয়ামী লীগ দলটি শুরু থেকে জাতির গঠন প্রক্রিয়ায়, জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে, সমাজের আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়, সমাজের অবহেলিত এবং নির্যাতিত অংশের মানুষকে দেশগঠন এবং জাতিগঠনে অংশভাগী করে তোলার ব্যাপারে কোনরকম রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেনি।"

আওয়ামী লীগের অদূরদর্শিতা এবং সংকীর্ণ দলীয় বা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে 'মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার' মাঠে মারা গিয়াছে। সামরিক শাসন বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ব্যবসায় কোনোটাই মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল না–হইতেও পারিত না। সত্য বলিতে কি বাহাত্তর হইতে পঁচাত্তর সালের মধ্যে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা কার্যত মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে দীর্ঘদিন–একভাবে না অন্যভাবে–সামরিক শাসকেরা ক্ষমতা দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা শক্তিশালী করিবার জন্য দক্ষিণপন্থী ও ধর্ম-ব্যবসায়ী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন আর মুক্তিযুদ্ধের সময় যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা যথানিয়মে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিলেন।

৩) দক্ষিণপন্থী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতার পথ হইতে সামরিক শাসকদের উত্তরসুরিরাও সরিয়া আসেন নাই–আহমদ ছফার এই পর্যবেক্ষণ বড়ই তীক্ষ্ণধী, একান্তই ব্যতিক্রমধর্মী। মনে রাখা প্রয়োজন, ‘বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা বলেন’–কথাটি যিনি বলিয়াছিলেন তিনিও ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী। এখন আপনিই স্থির করুন বুদ্ধিজীবীরা আসলে কি বলেন–তাঁহারা কি মিথ্যা বলেন, নাকি বলেন না? ‘বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা বলেন’–এই কথাটি যদি মিথ্যা না হয় তো ‘বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা বলেন’–কথাটা সত্য নয়, কেননা অন্তত একজন বুদ্ধিজীবী তো মিথ্যা বলেন নাই। আর উদ্ধৃত কথাটি যদি মিথ্যা হয় তো সিদ্ধান্ত করিতে হয় ‘বুদ্ধিজীবীরা মিথ্যা বলেন না’। অর্থাৎ আপনি যাহাই ধরিয়া লইবেন আপনার সিদ্ধান্ত হইবে তাহা নয়, তাহার বিপরীত। এই ধাঁধা হইতে বাহির হইবার পথ কি? পথ একটাই। সকল বুদ্ধিজীবী মিথ্যা বলেন না–একথা স্বীকার করা। কে সেই বুদ্ধিজীবী। জানিয়া রাখিবেন, বাংলাদেশে অন্তত একজন আছেন তিনি মিথ্যা বলেন না। তিনি আহমদ ছফা। তিনিই সেই লোক।

নিয়মের অতিক্রম আহমদ ছফা–১৯৮৯ সালে–‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (দ্বিতীয় খণ্ড)’ নামক অন্য একটি লেখায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাও এখন পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায় নাই : “আজকে এখানে সেখানে ধর্মবাদী শক্তির যে প্রচণ্ড উৎপাত লক্ষ করা যাচ্ছে তারও বিকাশ হয়েছে সামরিক শাসনের পক্ষপুটে। দক্ষিণপন্থী শক্তির যে উত্থান তা সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। সামরিক সরকার তাদেরকে অন্ধকার গর্তগুহা থেকে তুলে এনেছেন–এ কারণে যে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের একটা মৌলিক মিল এখানে যে তারা উভয়েই জাতীয়তাবাদী [অর্থাৎ সর্বজনীন] রাষ্ট্রচেতনার বিরোধী। সামরিক সরকার জাতীয়তাবাদের অবসানের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকে। মৌলবাদ জাতীয়তাবাদকে পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আজকের বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করা হয়েছে, তার কারণ শাসকদের ইসলামপ্রীতি নয়। তারা জাতীয়তাবাদকে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যুদস্ত করতে চায়।”

আওয়ামী লীগের মধ্যে যেমন এতদিনে আর কোনো ‘আওয়াম’ অবশিষ্ট নাই তেমনি ‘জাতীয়তাবাদী দল’ বা ‘জাতীয় পার্টি’ প্রভৃতির মধ্যেও নাই কোনো জাতীয় চেতনার চিহ্ন–বাংলাদেশের ইতিহাসে ইহাই পরম পরিহাসের বিষয়। ধর্মীয় আবেগ কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শের গালভরা বুলি তো পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য বজায় রাখিতে পারে নাই। কারণ সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় নাই। সেই পুরাতন ভুল দিয়া বাংলাদেশ গড়া যাইবে বলিয়া যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহারা কিন্তু নতুন ভুল করিতেছেন। যে জাতি “স্মরণকালের ইতিহাসে সবচাইতে ব্যাপক জনযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে”–স্বৈরাচারী ও দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় মদদদাতাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া–স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে সেই জাতি আজ পরাজিত, আজ সে শুদ্ধমাত্র শ্রেণীস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হইতেছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাদের সম্পর্কে আহমদ ছফা সেই ১৯৮৯ সালে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আজও ধ্রুব : “বর্তমানে চারদিকে যে মৌলবাদী তৎপরতা এবং তাণ্ডব লক্ষ করা যাচ্ছে এটা তাদের শক্তি নয়, পরাজিত মানসিকতারই অধিক পরিচায়ক। যেহেতু তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং আমাদের জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ঘরের শত্রু বিভীষণের ভূমিকা পালন করেছে–[তাই] সেই লজ্জা, সেই কলঙ্ক, সেই গ্লানি ঢাকার জন্য তারা তড়িঘড়ি কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলে পরাজিত বিবেকের কলঙ্কচিহ্ন ঢেকে দিতে চাইছে। ইতিহাসে ভ্রমসংশোধনের অবকাশ আছে। কিন্তু নতুন ভ্রম দিয়ে পুরনো ভ্রম ঢাকা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই।” যাহারা সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এই জাতিকে পরনির্ভর ধনতান্ত্রিক স্বার্থের অধীনতা পাশে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিতেছেন তাহাদের হাত হইতে জাতিকে সহজেই মুক্ত করা যাইবে না। ইহাদের বড় সহায়ক হইয়াছে উদীয়মান বা নবগঠিত ধনিক শ্রেণী।

তাই আরেকবার বলিতেছি : স্বৈরাচারী ও সামরিক শাসনের পক্ষপুটে শুদ্ধমাত্র ধর্ম-ব্যবসায়েরই পুনরুত্থান ঘটে নাই, সর্বগ্রাসী বৈদেশিক সংস্থার সহায়তাপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠীও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সংস্থাগুলির নামের দিকে তাকাইলেও প্রকৃত ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহাদের নামের মধ্যে ইংরেজি বর্ণমালা হইতে লওয়া আদ্যাক্ষরের ছড়াছড়ি। ১৯৭১ সালের পরে নব্য পরাধীনতা-ব্যবসায়ী পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাংলাদেশে ‘সিবিল সোসাইটি’ (বা ইঁহাদের অনুসৃত বানানে ‘সিভিল সোসাইটি’) শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রধানত ইংরেজিনবিশ–কেহ কেহ বিদেশফেরত–বলিয়া তাহারা এই দুই শব্দের বাংলায় অনুবাদ করিলেন ‘সুশীল সমাজ’। দেখা গিয়াছে, এই অনুবাদ কোনো কোনো রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত বক্তৃতা-বিবৃতিতে এস্তেমাল করিয়াছেন।

বুদ্ধিজীবীদের নতুন ভ্রমের ইহা সামান্য উদাহরণ মাত্র। কোনো বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকা অপরাধ নয়। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়

জানা কিংবা মুখস্ত করিয়া রাখা আমার কর্তব্য হইতে পারে না। কিন্তু যাহা আমার নিজেরও অগম্য তাহা দশজনের মধ্যে দ্বিধাহীন কিংবা বা জড়িমাহীন কণ্ঠে প্রচার করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 'সিবিল সোসাইটি' পদটির 'সুশীল সমাজ' অনুবাদ সেই ধরনের একটি অপরাধ কি না ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিব। যে কোনো শব্দ একটি ভাষায় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন অর্থটি বর্তমান প্রয়োগে প্রাসঙ্গিক তাহা না জানিয়া অনুবাদ করিলে এই রকম অনেক সুন্দর সুন্দর ভ্রমের উদ্ভব হইবে।

'সিবিল' শব্দের গোড়ার অর্থ 'নগর-সংক্রান্ত'। সুতরাং 'রাষ্ট্র-সংক্রান্ত'–সুতরাং 'জাতি-সংক্রান্ত'–এই অর্থে জাতীয়। তাই সিবিল সোসাইটি মানে 'জাতীয় সমাজ' বা (পিছন ফিরিয়া বলিতে পারেন) 'নাগরিক সমাজ'। ইহা কোনোক্রমেই 'সুশীল সমাজ' হইতে পারে না। নাগরিক বা রাষ্ট্রবাসী (অর্থাৎ আইনের অধীন বা অনুগত প্রজা) মাত্রেই সম্প্রসারিত অর্থে ভদ্রলোক হইবেন ধরিয়া লওয়া যায়। এই অর্থে 'সুশীল' কথাটি তাহার লক্ষণা মাত্র। এই উদাহরণটা টানিলাম, বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণীর কি উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মার্গগামিতার সাফাই সাক্ষ্যস্বরূপ। তাঁহারা অন্য জায়গায় আছেন। তাঁহাদের মনোভূমি অন্যত্র যাহা জন্মভূমি বাংলাদেশের অধিক সত্য। ইঁহারা কি আদৌ দেশের হিতচিন্তা করিতে পারেন? আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না বাংলা ভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়। শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে তাঁহারা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছেন।

৪) পরিশেষে, আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উপসংহার টানিতেছি। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার কি নিদারুণ দীনহীন দশা 'সুশীল সমাজ' শব্দবন্ধটি তাহার এক বিয়োগান্ত উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহৃত 'জৈব বুদ্ধিজীবী' শব্দের মধ্যে। ইতালির মহাপ্রাণ আন্তনিয়ো গ্রামসির লেখার ইংরেজি অনুবাদে 'অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল' বলিয়া একটা কথা পাওয়া যায়। ইংরেজি 'অর্গান' বা অঙ্গ হইতে এই 'অর্গানিক' বিশেষণটি আসিয়াছে। আর বাংলাদেশের 'সুশীল সমাজ' ইহার তর্জমা করিয়াছেন 'জৈব বুদ্ধিজীবী' বলিয়া। বোঝা যাইতেছে, তাঁহারা জৈব সার–অর্থাৎ জৈব সার (বা গোবর) দিয়া উৎপাদিত তরিতরকারি–বেশি বেশি ভোজন করিয়া থাকেন।

আরও একটি প্রবণতা দেখা দিয়াছে যাহার মধ্যে প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে প্রহসনের। ১৯৭১ সনের বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামের ঐতিহ্য পঞ্চাশ বছর না যাইতেই আজ ব্যঙ্গবিদ্রূপের স্বীকার হইতেছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। দেশের একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় সম্প্রতি একটি দুই পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রচ্ছদের উপর ভাঁজ করিয়া ছাপা হইয়াছে। সম্প্রতি–মানে এই ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে–বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের একান্ন বছরের মাথায় ঘটিয়াছে এই ঘটনা। সেই বিজ্ঞাপনে যে সকল শব্দ বাংলা হরফে ছাপা হইয়াছে তাহা লক্ষ করিলেই দেখা যাইবে গত পঞ্চাশ বছরে বুদ্ধিবৃত্তির জগতে কোন প্রতিবিপ্লবটি ঘটিয়া গিয়াছে।

এই বিজ্ঞাপনের মাত্র দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অন্তর্গত শব্দগুলি তুলিয়া দিতেছি : "লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর: ইউনিমার্ট; গ্রাউন্ড ফ্লোর : ফ্ল্যাগশিপ স্টোর; লেভেল ১ : মেনসওয়্যার; লেভেল ২ : উইমেন'স কালেকশন ওয়েডিং এন্ড জুয়েলারি; লেভেল ৩ : সুজ, লেদার গুডস এন্ড হোম ডেকর; লেভেল ৪ : মোবাইল এন্ড গ্যাজেটস; লেভেল ৫ : ফুড কোর্ট; লেভেল ৬ : এন্টারটেইনমেন্ট এন্ড মুভি হল।" প্রথম পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ এই বাণী : "শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে ৯,৫৯,৯০০ স্কয়ার ফিট বিশিষ্ট ইউনাইটেড গ্রুপের সেন্টারপয়েন্ট ঢাকার সেরা শপিং এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে তৈরি হচ্ছে আপনার জন্য। শহরের কমার্শিয়াল সেন্টারে ব্যবসা করতে পছন্দের স্পেসটি বুকিং করুন আজই।" বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত রোমান হরফে লেখা শব্দগুলি আর নকল করিলাম না। এই বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে যে পত্রিকার কল্যাণে তাহার সম্মানে আমরাও সাধু ভাষায় বাহবা দিয়া বলিতে পারি : 'যাহা কিছু ভালো তাহার সঙ্গে প্রথম আলো'।

'প্রথম আলো' পত্রিকায় যাহা ছাপা হইয়াছে তাহাই এখন নিয়ম–ইহার যম হওয়া খুব সামান্যসংখ্যক বুদ্ধিজীবীরই বুদ্ধিতে কি সাধ্যে কুলাইবে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা কি শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাটি পরিত্যাগ করিয়াছেন? লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় বাংলা ভাষা কিংবা সাহিত্যের কি হইল তাহাতে বর্তমান কালের প্রাতিষ্ঠানিক বা পরগাছা বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ পশ্চাদব্যথা নাই। গোঁফ দেখিয়া যদি বিড়াল চেনা অসম্ভব না হয় তো উপরে বর্ণিত ঘটনা দেখিয়াও বিড়ালটি চিনিতে পারিবেন। দুঃখের মধ্যে, এই বিড়াল ইঁদুর ধরিবে কিনা বলা সম্ভব নয়। শুদ্ধমাত্র এইটুকু বলিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধি 'বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা' ইঁহাদের গাত্র স্পর্শ করে নাই।

১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা–দেশি না বিদেশি অর্থনির্ভর–এই অর্থে দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছেন। একদল–ইঁহারা সংখ্যায় যতই বেশি হউন না কেন শক্তিতে দুর্বল–বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লিখিতে পারেন না। ইঁহদের মধ্যে বেশির ভাগই

রাষ্ট্রের বাঁটিয়া দেওয়া ভোগ খাইয়া প্রাণধারণ করেন। দ্বিতীয় দলটি–ইঁহারা সংখ্যায় স্বল্প হইলেও শক্তিতে প্রবল–প্রধানত ইংরেজিতেই লিখিয়া-পড়িয়া থাকেন। ১৯৬০ সালের দশকে–জাতীয় আন্দোলনের দিনে–বর্তমান বাংলাদেশের চৌহদ্দিতে বিদেশি তহবিলসমৃদ্ধ কোনো ফাউন্ডেশন বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সহায়তা গ্রহণে আগ্রহী বা সমর্থ বুদ্ধিজীবী ছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। আর ইংরেজি ২০০০ সালের মধ্যে এই ধরনের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী নন এমন বুদ্ধিজীবী খুঁজিয়া পাওয়াই মুশকিল। এই কয়েক দশকের মধ্যে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

আজিকার বাংলাদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গবেষক বা বুদ্ধিজীবী খুব কমই পাওয়া যাইবে যিনি গবেষণা বা পরামর্শের নামে এয়ুরোপ কিংবা উত্তর আমেরিক ভিত্তিক কোনো না কোনো ফাউন্ডেশনের বখশিস গ্রহণ করেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ অধ্যাপক জেমস পেট্রাস দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে একদা (আজি হইতে কিছু বেশি তিরিশ বছর আগে) যাহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা আজিকার বাংলাদেশের বেলায়ও–মনে হইতেছে–ষোল আনা সত্য : “আর যাহাদের এখন পর্যন্ত সেই টাকা দেওয়া হয় নাই তাহা এই কারণে নয় যে তাহাতে তাহাদের আপত্তি আছে, আসলে তাহারা এখন পর্যন্ত যথাযথ সংযোগ বা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সারেন নাই।”

দোহাই

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন,’ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪০৯), পৃ. ২৩৬-৩৭।

২ কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩)।

৩ আহমদ ছফা, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (ঢাকা: প্রকাশ ভবন, ১৩৭৯)।

৪ আহমদ ছফা, ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’, আহমদ ছফা রচনাবলি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, নূরুল আনোয়ার কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ১৫১-২১০।

৫ আহমদ ছফা, ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (দ্বিতীয় খণ্ড)’, আহমদ ছফা রচনাবলি, ৮ম খণ্ড, নূরুল আনোয়ার কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ৩৩৪-৩৫০।

৬ প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা ২০২২, মতিউর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: বৈশাখ ১৪২৯, এপ্রিল ২০২২)।

৭ James Petras, ‘Metamorphosis of Latin America’s Intellectuals,’ Economic and Politcal Weekly, vol. 24, no. 14 (April 8, 1989), pp. 719-722.

সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস

বাংলাদেশে দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

মুশতাক হুসেন খান

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতি এবং তার প্রভাব অনেক ব্যাপক। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে দুর্নীতি কতটা ক্ষতিকর এবং আমরা কোনদিকে এগুচ্ছি–এটা নিয়ে বিতর্ক আছে। আমি আমার কিছু বক্তব্য এই লেখায় তুলে ধরব।

উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করার অনেকগুলো কারণ আছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে বা তার পরিবার, দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন ভঙ্গ করে তাকে আমরা দুর্নীতি বলি। দুর্নীতি অনেক ছোটখাটো বিষয়ে হতে পারে যেমন, সরকারি অফিসে ফাইল এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে না, তখন আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কিছু টাকা চা নাস্তার জন্য দিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করলাম। এটাও এক ধরনের দুর্নীতি, এতে হয়ত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশাল কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, আমার পকেট থেকে কিছু টাকা যাচ্ছে। টাকাটা আরেকজনের পকেটে যাচ্ছে, কিন্তু দেশেই টাকাটা থাকছে। এটা সবচেয়ে কম ক্ষতিকর দুর্নীতি, কিন্তু এটাতেও অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, অনেক কাজ থেমে যায়। অন্যদিকে আবার দুর্নীতির কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি বা অবকাঠামো তৈরিতে নিয়ম কানুন না মেনে মানহীন কাজ করা হয়, যার ফলে হয়তো মানহীন বিল্ডিং ভেঙ্গে অনেক মানুষ মারা যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে। কিংবা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ফলে পরিবেশ ও মানুষের ক্ষতি হতে পারে। অর্থাৎ দুর্নীতির কারণে মামুলি ক্ষতিও হতে পারে, আবার অনেক বিশাল ক্ষতিও হতে পারে। দুর্নীতির আবার বিভিন্ন ধরন আছে। এজন্য দুর্নীতির একটা সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া, দুর্নীতি কতটা ক্ষতিকর সেটা বলা খুব বিপদজনক।

আমরা জানি যে, অনেক দেশ আছে যেখানে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করা সত্ত্বেও অনেক দ্রুত উন্নতি হয়েছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়া ৬০ দশকে বা চীন আশির দশকে। এসব দেশে দুর্নীতি যেমন ছিল, উন্নতিও তেমনি দ্রুত হয়েছে। আবার এমন অনেক দেশ আছে–যেমন জিম্বাবুয়ে–যেখানে দুর্নীতির কারণে সরকারি তহবিল থেকে টাকা গায়েব হয়ে যায়, অন্য দেশে চলে যায়, উন্নয়ন ব্যহত হয়, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হন। সে সব দেশে উন্নয়ন একদমই থেমে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয় যে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। কারণ একটি গোষ্ঠী সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে ফেলেছে, অন্যদের জন্য কিছু রাখেনি।

আমাদের নজর দেওয়া দরকার বাংলাদেশে কোন ধরনের দুর্নীতি বেশি হচ্ছে, কোন ধরনের দুর্নীতি ক্ষতি বেশি করে এবং কোনটা কম করে। কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামষ্টিকভাবে পদক্ষেপ নিলে সেটি কমিয়ে আনতে পারি।

আমরা সোয়াসে (SOAS University of London) গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি নিয়ে গবেষণা করে আসছি, বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আইনের শাসন স্বভাবতই দুর্বল থাকে। আইনের শাসনের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাসীন হোক বা না হোক আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পাবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সাধারণত এটা হয় না বা আপেক্ষিক বিচারে উন্নত দেশের তুলনায় কম হয়। একটা দেশ যখন উন্নত হয় তখন ক্ষমতাসীনদের সংখ্যাও বাড়ে, তাদের সক্ষমতাও বাড়ে। তখন তাদের ব্যবসা করার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়, কারণ তখন তাদের অনেক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। যতই উৎপাদনশীলতা বাড়ে ততই অনেক লোকের সাথে বিভিন্ন জটিল চুক্তি করতে হয়। তখন ক্ষমতাসীনরাই চায় যেন মানুষ আইন মানে আর আইনের শাসন হয়। তার স্বার্থের কারণেই সে এটা চায়, কারণ আইন না মানলে তার ব্যবসা টিকবে না। এর ফলে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে একটা চেক এন্ড ব্যালেন্স চলে আসে এবং একারণেই কোনো ক্ষমতাশীল ব্যক্তিও যদি আইন ভাঙ্গে সাধারণত তার শাস্তি হবার ভালো সম্ভাবনা থাকে।

উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতাসীনদের সংখ্যা কম, বেশিরভাগই এ ধরনের জটিল ব্যবসার ক্ষেত্রেও জড়িত থাকে না। তারা একে অপরকে চিনে বলে তারা কোর্ট কাচারির বাইরেই সাধারণত তাদের লেনদেন নিশ্চিত করে থাকে। তাছাড়া অর্থনীতির একটা বড় অংশই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের বাইরে কাজ করছে, যেমন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যবসায়ীরা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা এতই কম যে তারা কোনো আইনই অনুসরণ করতে পারছেন না। এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ত ব্যবসা রেজিস্ট্রেশন করাও টাকা নাই। অর্থাৎ যারা ক্ষমতাসীন তাদের আইনের দরকার নাই, আর অবশিষ্টদের একটা বড় অংশ আইন অনুসরণ করতে পারে না। এরকম সমাজে আইনের শাসন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। এজন্য যখন উন্নয়ন বাড়তে শুরু করে ক্ষমতাসীনরা সুযোগ নিয়ে সব কিছু গ্রাস করতে শুরু করে। এটা প্রত্যেক দেশেই হয়। যখন উন্নয়ন বাড়ে তখন স্বভাবতই দুর্নীতি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে সবদেশে একই ধরনের দুর্নীতি বাড়ে না। বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, যার ফলগুলোও আবার ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিন্যাসের ওপর।

অনেকেই হয়ত ভাবছেন দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন এত উন্নত কীভাবে হল। বাংলাদেশেও অনেকে বলছেন যে দুর্নীতির সমস্যা বাংলাদেশের জন্য গভীর কোনো সমস্যা নয়। কেবল দুর্নীতির ক্ষেত্রে না, অনেকে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও বলেন–গণতন্ত্র পরে হবে আগে উন্নয়ন করি। চীন আর দক্ষিণ কোরিয়া যেমন গণতন্ত্র ছাড়া, আর দুর্নীতির ব্যাপকতা সত্ত্বেও উন্নয়ন করেছে, একইভাবে অনেক দেশ যেমন নাইজেরিয়া, জিম্বাবুয়েতে দুর্নীতি থাকার ফলে উন্নয়ন হচ্ছে না। আবার মিয়ানমার, আফগানিস্তানে গণতন্ত্র না থাকার কারণে উন্নতি হচ্ছে না। অর্থাৎ গণতন্ত্র থাকলেই যে উন্নতি হবে বা না থাকলে যে হবে না–এরকম সরল কোনো সমীকরণ নেই। কোনো কোনো দেশে দুর্নীতি অনেক বেশি ক্ষতি করে, আবার কোনো কোনো দেশে কম ক্ষতি করে। কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্র না থেকেও উন্নয়ন হয়, কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্র না থাকার ফলে গৃহযুদ্ধ হয়। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ? আমাদের মূল্যায়ন হলো: বাংলাদেশ একটি মাঝারি ধরনের দেশ। এখানে দুর্নীতি এত বেশি ক্ষতিকর না যে কিছুই হচ্ছে না, আবার আমরা চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতও না যে দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও উন্নত দেশ হয়ে যাব। আমাদের দেশে অনেক ক্ষতিকর ধরনের দুর্নীতি হয় যেটা চীন বা দক্ষিণ কোরিয়াতে হতো না। এটার কারণ বুঝতে হলে এখানকার ক্ষমতার বিন্যাস দেখতে হবে।

চীন ও দক্ষিণ কোরিয়াতে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল যার ফলে সরকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে পারত। সেখানে কোনো ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে চাইলে রাষ্ট্র সেই বিনিয়োগে সহায়তা করতো। ইনফরমালি রাষ্ট্র একটা শেয়ারহোল্ডার হয়ে যেত। রাষ্ট্র বলত যে আমি তোমাকে সহায়তা করব, কিন্তু তোমাকে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে হবে, রপ্তানী বাড়াতে হবে। মুনাফার একটা অংশ সরকারকে দিতে হতো। সরকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উৎকোচ যেমন নিত, তেমনি বিনিয়োগও করত। কোনো প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিত ব্যবসা করতে না পারলে সরকার সেটি বন্ধ করে অন্য প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করত। কারণ একটা ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করার চেয়ে সফল প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করা বেশি লাভজনক। রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই সফল প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করে যখন দুর্নীতি করে, এটাকে 'প্রফিট শেয়ারিং' দুর্নীতি বলা হয়। ফলে এসব দেশে দুর্নীতি আর উন্নয়ন একসঙ্গে চলেছে। কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে দুর্নীতি চীনে উন্নয়ন ব্যহত করছে, যার কারণে চীন এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। যখন জটিল এবং উঁচু মানের প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় তখন আইনের শাসন প্রয়োজন হয়। একইভাবে, যে হোল্ডিং কোম্পানিগুলো দক্ষিণ কোরিয়ায় ষাটের দশকে দুর্নীতির মাধ্যমে উন্নয়ন করেছিল নব্বইয়ের দশকে এসে দেখা গেল আইনের শাসন না মানলে তারা আন্তর্জাতিক ব্যবসা করতে পারছে না। তখন তারাই সরকারকে আইনের শাসনের জন্য চাপ দিল।

অন্যদিকে জিম্বাবুয়েতে দুর্নীতির চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে দুর্নীতি হলো চুরির মতো, কোনো মুনাফা হচ্ছে না। যারা সরকারি টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে যায়, তাদের ধরা যায় না, সরকারি কর্মকর্তারাই অনেক টাকা বিনিয়োগ না করে তহবিল থেকে সরিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ক্ষমতার বিন্যাস এরকম যে চুরিটাও শৃঙ্খলার বাইরে চলে যায়! এসব দেশে দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। একদিকে চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ অপরদিকে জিম্বাবুয়ে, আফগানিস্তানের মতো দেশ। বাংলাদেশ এদের মাঝামাঝি অবস্থানে আছে। বাংলাদেশে এমন কিছু দুর্নীতি হয় যেটা খুব বেশি ক্ষতিকর নয়, আবার এমন কিছু দুর্নীতি হয় যেখানে টাকাটা এমনভাবে অপচয় হচ্ছে যেটা কোনোদিনও ফেরত পাওয়া যাবে না। এখানে কিছু ব্যবসায়ী আছে রপ্তানী করছে, আবার কিছু আছে চুরি করছে, ব্যাংকের টাকা কোনদিনও ফেরত দেবেন না। এটা রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে, ক্ষমতার বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে। যারা মনে করেন বাংলাদেশে চীনের মতো হচ্ছে আমি তাদের সঙ্গে একমত না। বাংলাদেশের দুর্নীতি চীনের মতন উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুর্নীতি না, আবার একেবারে জিম্বাবুয়ের মতো পতনশীল দেশও না। যেসব দুর্নীতি আমাদের জন্য ক্ষতিকর সেগুলোকে আমাদের কমিয়ে আনতে হবে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে দুই ধরনের দুর্নীতি হয়। একটা হচ্ছে: আইন আছে কিন্তু আমি অনুসরণ করতে পারছি না, যেমন একজন বাদামওয়ালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন বাদাম বিক্রি করছে, তখন সে কিন্তু অনেক আইন ভঙ্গ করছে। পুলিশ এসে তাকে তুলে দিতে চাইলে সে কিছু টাকা দিয়ে বিষয়টির সুরাহা করে। এখানে সে দুর্নীতি করছে, কিন্তু আইন অনুসরণ করে তার পক্ষে জীবিকা উপার্জন করা সম্ভব নয়। আরেকটা দুর্নীতি হচ্ছে, আমি আইন অনুসরণ করতে পারলেও বাড়তি লাভের জন্য সেটি করছি না। আইনের শাসন আনতে হলে যেসব আইন মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয় সেগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। এমন আইন করতে হবে, যাতে বাদামওয়ালা জীবিকা অর্জন করতে পারে। অর্থনীতির ৮০ ভাগ যেখানে ইনফরমাল সেক্টরে, এদের রেজিস্ট্রেশন করারও অর্থ নাই। এমন আইন করতে হবে, যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে তাদের পক্ষে আইন অনুসরণ করা সম্ভব হয়। ভারতে জবরদস্তি ইনফরমাল সেক্টরকে আনুষ্ঠানিক করতে গিয়ে অর্থনীতিকে ক্ষতির মুখে ফেলেছে। আমাদের এই অনানুষ্ঠানিক খাতকে আগে শক্তিশালী করতে হবে তারপর তাকে আনুষ্ঠানিক করে তুলতে হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে দেখা যায় সবাই আইন ভাঙছে। কেউ ভাঙ্গে কারণ তার না ভেঙ্গে উপায় নাই, কেউ ভাঙে কারণ তার বাড়তি লাভ হচ্ছে। এজন্য এসব দেশে কেউ কাউকে ধরতে পারে না। এটা থেকে বেরুতে হলে ধাপে ধাপে এগুতে হবে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, যদি স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমরা ধরিয়ে দিতে পারি কে দুর্নীতি করছে আর যদি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকে, দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটা হলো কোনো ক্ষমতাশীল ব্যক্তি কিন্তু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পদ্ধতি ব্যবহার করে আরেকজন ক্ষমতাশীলের পিছনে যাবে না। আবার অন্যদিকে যার ক্ষমতা নাই সেও ক্ষমতাশীল কাউকে এই পদ্ধতিতে নিতে পারে না। এ জন্য এই পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হয়। ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের আইন সংস্থাগুলো শুধু বিরোধী দলকে ধরে, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তানেও তাই-ই হয়। আর বাংলাদেশে কী হয় সেটাতো আমরা জানি। যেখানে আইনের শাসন দুর্বল সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পর্যাপ্ত না। তাই ক্ষেত্রবিশেষে এমন একটা শক্তি শনাক্ত করতে হবে যার ক্ষমতা আছে এবং নিজের স্বার্থেই দুর্নীতি দমন করবে। একইসঙ্গে সব দুর্নীতি কিন্তু দমন করা সম্ভব না। কিন্তু আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, খাত-ভিত্তিক যেমন স্বাস্থ্যখাত, বিদ্যুৎ খাত ইত্যাদি খাতের কোনো কোনো প্রজেক্টে দুর্নীতি বেশি আবার কোনোটাতে অনেক কম। নিজের স্বার্থেই কিছু কিছু লোক দুর্নীতি থামাচ্ছে; তাদের সেই পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে। আমাদের এরকম ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে। সব জায়গাতে দুর্নীতি আছে এই ধারণা সঠিক না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ আইন মেনে চলে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চলে না। কিছু ক্ষেত্রে মেনে চলে কারণ অন্য মানুষই আপনাকে থামিয়ে দিবে। যেসব খাতে এই ধরনের চেক এন্ড ব্যালেন্স আছে সেখানে দুর্নীতি কমে যায়। এই ধরনের প্রতিযোগিতাকে আমাদের সমর্থন করা দরকার, যেখানে মানুষ নিজের স্বার্থেই আইন মেনে চলবে। এটা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না, এজন্য গবেষণা করে চিহ্নিত করে কাজ করতে হবে।

আইন এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে মানুষ এটাকে সহজে অনুসরণ করতে পারে। আইন অনুসরণ করে যেন মানুষ ব্যবসা উন্নয়ন ইত্যাদি করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আর ক্ষেত্রবিশেষে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের প্রবণতা যেখানে আমরা খুঁজে পাই সেখানে আমাদের বাস্তবমুখী দুর্নীতি দমন পলিসি অনুসরণ করতে হবে (https://ace.soas.ac.uk/)। বাংলাদেশে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মডেল অনুসরণ করলে হবে না। ওই সব দেশের মডেল অনুসরণ করতে গেলে দেখা যাবে টাকা নিয়ে ব্যবসায়ী আর রাজনিতিবিদ উভয়ই পালিয়ে গেছে। তাই দেশের বাস্তব ক্ষমতা বিন্যাসের পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় এমন মডেল বের করতে হবে।

মুশতাক হুসেন খান, অধ্যাপক, সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা : পরিচয় ও প্রান্তিকতার নানা দিক

ফিলিপ গাইন

ভূমিকা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন, 'উপজাতি', 'ট্রাইবাল', 'ইন্ডিজেনাস পিপল', 'আদিবাসী' ও 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' শব্দটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী শব্দটির বেশ কাছাকাছি, এবং এই শব্দটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এ ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক নৃবিজ্ঞানীই 'এথনিক কমিউনিটি' বা 'নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী' শব্দটি ব্যবহার করেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ অনুসারে দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২৭টি (তিনটি পুনরাবৃত্তিসহ)। ২৩ মার্চ ২০১৯ প্রকাশিত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সরকারি তালিকা সংশোধন করা হয়েছে এবং নতুন তালিকা অনুসারে তাদের সংখ্যা ৫০।

সরকারি নথিভুক্ত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাইরে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং চা বাগানে আরও ৬৫'-এর মতো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর খোঁজ আছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর কাছে। দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো মূলত (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম, (খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ), (গ) উত্তর-মধ্যাঞ্চল, (ঘ) উত্তর-পূর্বাঞ্চল, (ঙ) কক্সাজার ও পটুয়াখালী জেলার উপকূলীয় অঞ্চল এবং (চ) চা বাগানে বাস করে। সব মিলিয়ে ১১০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি সমন্বিত তালিকা সেড-এর বিভিন্ন বইতে কমিউনিটি ইনডেক্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার মধ্যে 'অন দি মার্জিনস: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস' বই একটি। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের একটি বড় অংশ সংখ্যালঘু, সুবিধাবঞ্চিত ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা বাদ-পড়া। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির মধ্যে এদের আলাদা আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় দশ শতাংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল। দেশের একমাত্র পাহাড়ি অঞ্চল অনন্য এ ভূখণ্ডে নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে ১১টি জাতির মানুষ বাস করছে। সমতলে যে লাঙ্গল চাষ সর্বত্র দেখি, পার্বত্য চট্টগ্রামে তা খুবই সীমিত। পাহাড়ি এলাকার সাধারণ চাষাবাদ হিসাবে পরিচিত স্তর বা ধাপকৃষিও পার্বত্য চট্টগ্রামে সামান্যই দেখা যায়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তনের পর থেকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (যা পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল নামে সুপরিচিত) ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান প্রশাসনিক হাতিয়ার; বর্তমানে এটি গুরুত্ব হারালেও এখনও বহাল রয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি আইন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রধান হলো ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানকারী এ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক উন্নয়নমূলক কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে; বরং বাস্তবিক অর্থে এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকেই আরও জোরদার করেছে। অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে এগুলো এখনো ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৩৫ জনের মতো (২০১১ সালের আদমশুমারি হিসাব অনুযায়ী) যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্বের জাতীয় গড় ১,১০০ জন। তিন পার্বত্য জেলার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য রয়েছে যেমন: রাঙ্গামাটিতে ৮৩, বান্দরবানে ৬৭, এবং খাগড়াছড়িতে ১৯৬ জন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল এলাকা অব্যবহৃত পড়ে আছে বলে যে জনশ্রুতি আছে তা কেবল অতিকথন। পার্বত্য চট্টগ্রামের খুব কম ভূমিই বসবাস ও চাষাবাদের উপযোগী।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল বেশ দুর্গম এলাকা। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার উদার আর্থিক সহযোগিতায় সরকারের তৈরি করা প্রশস্ত পিচঢালা রাস্তার বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াত সহজ হয়ে গেছে। রাস্তা নির্মাণে অর্থায়নকারীদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার ও বহুপাক্ষিক ব্যাংক। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এদের অন্যতম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর যে ১১টি জাতিসত্তার বাস তারা হলোঃ (১) চাকমা ও (২) তঞ্চঙ্গ্যা/দেংনাক (এ দু'টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন তার সাথে বাংলা ভাষার মিল রয়েছে), (৩) ত্রিপুরা (বোদো ভাষায় কথা বলেন), (৪) মারমা (বর্মী ভাষায় কথা বলেন), (৫) বম, (৬) পাংখোয়া, ও (৭) লুসাই (এ তিনটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা মধ্য-চীনের ভাষার খুব কাছাকছি), (৮) খুমি ও (৯) খিয়াং (এ দু'টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা দক্ষিণ-চীনের ভাষার শ্রেণিভুক্ত), (১০) ম্রো ও (১১) চাক অথবা সাক (এ দুটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, যার সাথে বর্মী, চীনা ও বোদো ভাষার মিল রয়েছে) (ব্রাউনস্ ও লফলার ১৯৯০:৩৬)। এসব আদিবাসী রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ভাষা, শারীরিক গড়ন, ও মনস্তত্ত্ব।

উপকূলীয় অঞ্চল

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে বসবাসকারী দু'টি প্রধান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী হলো রাখাইন ও মারমা। এ দু'টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে মিল রয়েছে। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের সংখ্যা ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫০,৪২৪ যা বাংলাদেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ৩.৫৮% (বিবিএস ২০০১)।

রাখাইনদের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কৃষিনির্ভর। একসময় তারা অনেক জমির মালিক ছিল; বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মতো তারাও ক্রমাগত জমির মালিকানা হারাচ্ছে।

কক্সবাজার-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রাখাইন বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব মতে, বর্তমানে রাখাইনদের প্রায় ৮০% ভূমিহীন। এসব ভূমিহীন রাখাইনরা বর্তমানে দিনমজুরি, মাছধরা, ছোটখাটো ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে।

রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর অর্থনীতিতে ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজির অভাব ও কাঁচামালের উচ্চমূল্যের জন্য এটি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। যারা এখনও বয়নশিল্প ধরে রেখেছেন তাদের পক্ষে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। রাখাইনদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। রাখাইনরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী।

চা বাগানের বাইরে স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহ

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল : বাংলাদেশের সাতটি বিভাগের মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ দুটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ নামেও পরিচিত। ১৬টি জেলা নিয়ে এই দুটি বিভাগ। বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা নিয়ে রাজশাহী বিভাগ এবং রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও কুড়িগ্রাম জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ। এই দুটো বিভাগের জনসংখ্যা ৩,৪২,৭২,৬১৩ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ন্যাশনাল রিপোর্ট, ভলিউম-১, ২০১৫)। এ অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা ৩,৪৭,০১৬ যা মোট জনসংখ্যার ১.০১% এবং বাংলাদেশের মোট আদিবাসীর ২১.৮৮% (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১)। আদমশুমারি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এর নতুন তফসিল অনুসারে, এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো হলোঃ ওরাওঁ, কোল, গড়াইত, পাহাড়ী বা মালপাহাড়ী (পাহাড়িয়া), মুন্ডা, সাঁওতাল (সান্তাল), মাহাতো বা কুর্মি মাহাতো বা বেদিয়া মাহাতো, কোরা বা কড়া, গঞ্জু সিং, তেলী, তুরি, বাকতি বা বাগদী, বাড়াইক বা বড়াইক, ভূমিজ, ভূঁইমালী, মালো বা ঘাসিমালো, মাহালী বা মাহলে, মুসহর বা মুশোহর এবং রাজোয়াড়।

এ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রধানত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তারা দাবি করেন, একসময় তাদের মালিকানায় অনেক জমি ছিল, যা তারা ক্রমাগত হারিয়েছেন। বাঙালিরা জোরজুলুম, দলিল জালিয়াতি ও চুক্তির মাধ্যমে বা কৌশলে তাদের জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন এবং এর যথেষ্ট ভিত্তিও রয়েছে। এমনকি সরকারের যে খাস জমি তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন, সেখান থেকেও তাদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনতার এ উচ্চহারের কারণে তাদের মধ্যে দিনমজুরের হারও বেশি। অনেকেই তাদের একসময়কার নিজস্ব জমিতেই দিনমজুর হিসাবে কাজ করছেন। শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রেও তারা নানা অন্যায় ও বৈষম্যের শিকার। এ অঞ্চলে যখন কাজ থাকে না তখন এই দিনমজুরেরা বেকার হয়ে পড়েন ও উচ্চ সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন। অবশেষে তারা সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে জমি হারান এবং আরও বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়েন। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুব কম।

উত্তর-মধ্যাঞ্চল : আদমশুমারি ১৯৯১ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এর নতুন তফসিল (২০১৯) অনুযায়ী উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ছয়টি জেলায়—ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর এবং গাজীপুর—সরকারি তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বাস করে তারা হলো: গারো (মান্দি নামে পরিচিত), কোচ, বর্মণ (রাজবংশীরাও বর্মণ পদবি ব্যবহার করে), বানাই, ডালু, হাজং এবং হদি বা হুদি।

গারো, হাজং, কোচ এবং ডালু হলো এ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রধান আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী। গারোদের বেশিরভাগই উত্তর-মধ্যাঞ্চলে বাস করেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৬৪,২৮০ জন। বাংলাদেশ ও ভারতের গারোদের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন এমন একজন নৃ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক রবিনস্ বার্লিং-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে গারো জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ (১৯৯০ সালে)।

গারোরা বাঙালিদের কাছাকাছি বাস করে। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব ও এর ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

এ অঞ্চলের দ্বিতীয় স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হলো কোচ (১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যাদের সংখ্যা ১৬,৫৬৭ জন)। সেড-এর ২০১৪-২০১৫ সালে হিসাব অনুযায়ী, এ অঞ্চলের কোচদের সংখ্যা ৩১,৭৭০ জন। বাংলাদেশের প্রায় সকল কোচই এ অঞ্চলে বাস করে। কোচদের ওপর বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভাষার দিক থেকে তিব্বতী-বর্মণ ভাষা শ্রেণির সাথে তাদের মিল রয়েছে।

এ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হাজং। কোচদের মতো হাজংরা বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি ধারণ করে আছেন। যদিও একসময় হাজংরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন বলে জানা যায়, তবে বর্তমানে তারা শুধু বাংলা ভাষায়ই কথা বলেন। এ অঞ্চলের যেসব ক্ষুদ্র জাতি সরকারি হিসাবে নেই তারা হলো বানাই, হদি এবং লিঙ্গাম।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি জেলায় (চা বাগান বাদে) ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। জেলাগুলো হলো উত্তরে ভারতের মেঘালয় ও পূর্বে ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যের সীমান্তবর্তী সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ। মণিপুরী এবং খাসি এ অঞ্চলে বসবাসরত দুটি সুপরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। খাসিরা বৃহত্তর সিলেটের ৮৫টি খাসি পুঞ্জিতে বাস করেন (পুঞ্জি হলো খাসিদের গ্রাম যা সাধারণত পাহাড় বা টিলার ওপরে অবস্থিত)। মণিপুরীদের দু'টি শাখা–মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিয়া। মেইতেইদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান, যাদেরকে বলা হয় মেইতেই পাঙ্গান এবং বাকিরা আপোকপা, এরা প্রাক-হিন্দু ধর্মের অনুসারী। বিষ্ণুপ্রিয়ারা হিন্দু ধর্মাম্বলী। এ অঞ্চলে আরো কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বাস করে, তবে তারা সংখ্যায় খুব কম। এরা হলো গারো, হাজং, সান্তাল, ত্রিপুরা এবং আরও। এরা মূলত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। এ অঞ্চলের তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যারা খুব বেশি পরিচিত নয়, তারা হলো পাত্র, শব্দকর এবং মুন্ডা।

চা বাগানের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১৫৬টি চা বাগানে (তখন এ বাগানগুলোই চালু ছিল) জরিপ চালিয়ে ৮০টি জাতিসত্তা ও গোষ্ঠীর সন্ধান পায়। এদের মধ্য থেকে ২৩টি গোষ্ঠী সরকারি 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর' তালিকায় স্থান পেয়েছে। সরকারি তলিকায় স্থান পাওয়া এ সব জাতিগোষ্ঠীসমূহ: বাগদি বা বাকতি, বাড়াইক বা বরাইক, ভূমিজ, গারো, গঞ্জু, গড়াইত, খড়িয়া, কোল, কন্দ, কোরা, কুমার, কুর্মি, লোহার, মাহলে, মারমা, মণিপুরী, মুন্ডা, মুশোহর, ওঁরাও (ওঁরাং), পাত্র, রাজোয়ার, সান্তাল, শবর, মাহালী, তেলী (পাল) এবং ত্রিপুরা।

স্বল্প-পরিচিত ও অদৃশ্য জাতিগোষ্ঠী : দেশের উত্তর পশ্চিম, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (চা বাগানের বাইরে) বসবাসকারী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে যাদের অনেকে এখনো সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং এরা বলা চলে অদৃশ্য। এদের মানচিত্রায়ণ করতে গিয়ে সেড যেসব জাতিসত্তার সন্ধান পেয়েছে সেগুলো হলো: ভূঁইয়া, বিন্দুমণ্ডল, বুনো, চৌহান, ঘাটুয়াল বা ঘাটুয়ার, হাজরা, হাড়ি, কাদর, কৈরী, কালোয়ার, কর্মকার, কোড়া, মোদক, নুনিয়া, পাল (এরা কুমার নামেও পরিচিত), রাজভর, রাজবংশী, রবিদাস, তাঁতি, লিঙ্গাম (খাসিদের একটি অংশ) এবং ক্ষত্রিয়।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের কিছু সর্বজনীন অসুবিধা

পরিচয় ও স্বীকৃতি : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষদের পরিচয়ের প্রশ্নটি মূলত অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণ, গোত্র, বিশ্বাস ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে অ-বাঙালি জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে কোনো স্বীকৃতি নেই। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা", অনুচ্ছেদ ২৩-এ বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।" এই অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে বাঙালিদের রাষ্ট্র এবং বাংলা এদেশের জাতীয় ভাষা।

অনুচ্ছেদ ১৭(ক)-এ "একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার" আহ্বান করা হয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করছে সেই বৈচিত্র্যময় ভাষা ও সংস্কৃতিকে খাটো করেছে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

"ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০" বাংলাদেশের আদিবাসীদের এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। এ নতুন পরিচয় আদিবাসীদের পরিচয়ের প্রশ্নকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয় ও বর্ণগতভাবে সংখ্যালঘু চা শ্রমিকদের স্বীকৃতির বিষয়টি আরও বেশি জটিল। তারা কেবল দেশের অধঃস্তন নাগরিকই নয়, তারা স্বল্প-পরিচিত ও অদৃশ্যমান নাগরিক, যারা সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় খুব সামান্যই গুরুত্ব পায়।

গণতান্ত্রিক চর্চা ও প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ : ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ সাধারণত রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক ও প্রতিনিধিত্বহীন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; এখানকার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ ১১টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর হলেও ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ অঞ্চলের তিনটি সংসদীয় আসনের সবক'টিতেই আদিবাসী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ তিনটি সংসদীয় আসনে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা সংসদ সদস্য হয়েছেন, এর কোনোটিই শুধুমাত্র আদিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত নয়; এগুলো রাজনৈতিক সংসদীয় আসন এবং যেকোনো জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। বাস্তবিক অর্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত বাঙালি প্রার্থীরাও অতীতে এসব আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। অপরদিকে সমতলের আদিবাসীদের জন্যও কোনো সংরক্ষিত আসন নেই, তবে ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে একটি আসনে (ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানা) একজন গারো আদিবাসী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সমতলের আদিবাসীরা বিক্ষিপ্তভাবে দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকায় খুব সহজেই সংখ্যাগুরুদের মাঝে হারিয়ে যায়। ফলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোনো প্রভাব নেই, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থেকে নির্বাচিত গারো প্রার্থীর মতো যদি না কোনো বড় রাজনৈতিক দল তাদের মধ্য থেকে কাউকে মনোনয়ন দেয়।

ভূমি, বন ও সমষ্টিগত সম্পদ থেকে অপসারণ : জাতিগত সংখ্যালঘুদের গভীর উদ্বেগের বিষয়গুলোর একটি হলো ভূমির অধিকার। কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠীর ভূমিতে কোনো অধিকারই নেই; কারো কারো কোনো ধরনের মালিকানার স্বীকৃতি ছাড়া সীমিত অধিকার আছে; কোনো কোনো গোষ্ঠীর এখনো ভূমির অধিকার আছে তবে প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির কারণে তারা ক্রমাগত ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মধুপুর শালবন বা যেকোনো স্থানের বনভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। এর কারণ হলো বনভূমিতে অবকাঠামো নির্মাণ, বনবিনাশ, প্রথাগত চাষাবাদের (যেমন, জুম চাষ) জমিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাল্প বা মণ্ড তৈরির জন্য উপযুক্ত গাছের বনায়ন, রাবার ও কাঠ বৃক্ষের বনায়ন সম্প্রসারণ ও ব্যক্তিমালিকানায় বনভূমি হস্তান্তর। এছাড়া ভূমির সমষ্টিগত মালিকানার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল থেকে আসা বাঙালিদের বসতি স্থাপন সহজ হয়েছে এবং এর ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিতে প্রবেশাধিকার মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়েছে। মধুপুর শালবনের মতো বনভূমিতে আদিবাসীরা এখনো বনের অভ্যন্তরের গ্রামগুলোতে বাস করছে, তবে জমির মালিকানার স্বীকৃতি ছাড়াই এবং জমির ওপর তাদের প্রথাগত অধিকারেরও কোনো স্বীকৃতি সেখানে নেই।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষেরা ইতিমধ্যেই ব্যাপকহারে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ তাদের নিরাপত্তা না দিয়ে বরং ভূমি ও বনভূমির অধিকার প্রশ্নে নির্বিকার রয়েছে। অথচ এসব ভূমি ও বনভূমি এক সময় তাদের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। বন ও ভূমিতে প্রবেশাধিকারে অস্বীকৃতি এবং সাধারণ সম্পত্তির জন্য প্রতিযোগিতা আদিবাসী মানুষের বঞ্চনা ও দুর্ভোগের অন্যতম কারণ হিসেবে রয়ে গেছে।

জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের জন্য সুরক্ষা

বাংলাদেশ যখন মহা ধুমধামের সাথে স্বধীনতার পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন করছে আদিবাসীদের মনে তখন অনেক ক্ষোভ ও অশান্তি। তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের অধিকাংশের একটি সাধারণ চিত্র হলো–তারা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, সম্পদে তাদের অধিকার নগণ্য, ক্রমাগত তারা সমষ্টিগত মালিকানায় থাকা ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ হারাচ্ছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শোষণ, বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং টিকে থাকার জন্য তাদেরকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তবে সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাই যে সমান বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার তা নয়। কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠী অন্যদের চেয়ে কিছুটা ভালো আছে। একটি বড় অংশের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। একদিকে রাষ্ট্র যেমন আইন তৈরি ও সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে এদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারে, অপরদিকে বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত জাতিগোষ্ঠীকে কিছু সুবিধা দিয়ে যথাযথ পদক্ষেপও নিতে পারে। সংখ্যাগুরু মানুষদেরও উচিত তাদেরকে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা এবং তাদের প্রতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে ত্যাগের জন্য পর্যাপ্ত সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসা। আদিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সহনশীলতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে এই জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাথে সত্যিকারের অংশীদারিত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে নাগরিকদের মাঝে ভৌগলিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট ভেদাভেদ কমে আসবে।

তথ্যসূত্র

১. বিবিএস। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস, ১৯৯১। এনালিটিক্যাল রিপোর্ট, ন্যাশনাল সিরিজ।
২. বিবিএস। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস, ২০১১।
৩. বিবিএস। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস, ২০০১। এনালিটিক্যাল রিপোর্ট, ন্যাশনাল সিরিজ এবং কমিউনিটি সিরিজ। রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি।
৪. গাইন, ফিলিপ। ২০১৬। অন দি মার্জিনস: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিজ। সেড।
৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
৬. তিগ্যা, সিস্কা ইমেলডা; মোড়ল, শিশির এবং গাইন, ফিলিপ। উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের আদিবাসী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী ও রাখাইন : উপকূলীয় অঞ্চলের আদিবাসী (রিপোর্ট: জাতীয় আদিবাসী গোলটেবিল, ডিসেম্বর ১৮-২০, ১৯৯৭) এর মধ্যে। সম্পাদক : ফিলিপ গাইন।
৭. টিম, ফাদার আর, ডব্লিউ। ডিসেম্বর ১৯৯১। দ্যা আদিবাসীস অব বাংলাদেশ। মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন।

ফিলিপ গাইন, গবেষক ও পরিচালক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাস্থ্যখাতে অর্জন

ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী

ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে, যা একটি বৈশ্বিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের ধারা এবং বিশ্ব কীভাবে এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে তার ওপর উন্নয়ন প্রকাশনাসমূহে ক্রমাগত লেখালেখি হচ্ছে। ব্রিটিশ উন্নয়ন নৃতত্ত্ববিদ ডেভিড লুইস তার একটি সাম্প্রতিক বইয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অর্জন নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেন, "একদা তলাবিহীন ঝুড়ি নামে অভিহিত বাংলাদেশকে এখন নতুনধারা প্রবর্তনের ঝুড়ি বলা হয়ে থাকে।" বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের ওপর প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী মেডিকেল সাময়িকী '*ল্যানসেট*' একটি সিরিজ প্রকাশ করেছে। সাময়িকীটির সম্পাদকগণ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সাম্প্রতিক অর্জনকে 'বিশ্ব স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের রহস্য' বলে উল্লেখ করেছেন। অতি সম্প্রতি এক প্রবন্ধে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর কলামিষ্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ বাইডেন প্রশাসনকে উপদেশ দিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন শিশু-দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ও তার প্রচেষ্টাসমূহের দিকে তাকায়। 'What can Biden's plan do for poverty? Look to Bangladesh' শিরোনামের উক্ত লেখায় ক্রিসটফ বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে দেশটি হতাশা জয় করে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের ক্ষমতায়নে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জনের দিকে এগিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে অতিসম্প্রতি একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেশের বরেণ্য ১০১ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি তাঁদের নিজ দৃষ্টিতে দেখা এই অর্জনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত 'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিকাশ' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে প্রথমা প্রকাশন।

বাংলাদেশে এ ধরনের একটি চিত্তাকর্ষক ও যথার্থ প্রতিচ্ছবি বিনির্মাণের পেছনে আসলে কী কাজ করেছে? আয়-দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আসলেই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এর পরেও আরও অনেক বাধা-বিপত্তি রয়ে গেছে। এই সাফল্য গাথার পেছনে যে সমস্ত প্রামাণ্য দলিলাদি রয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এই লেখাতে।

স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে পরিবর্তন

মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জাতির দৃঢ় সংকল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একটি দেশের জনগণের গড় আয়ু, অর্থাৎ জন্মের সময় একজন মানুষ কত বছর বেঁচে থাকতে পারে তার গড় সেই দেশের উন্নয়নের একটি উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী পরিমাপক। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে গড় আয়ু শতকরা ৭০ ভাগ বেড়েছে; ১৯৭১ সালে যা ছিল ৪০ বছরের কিছু বেশি, যা বর্তমানে ৭২ বছর (২০২১)। মজার বিষয় হচ্ছে তুলনামূলকভাবে নারীর গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেড়েছে অধিক হারে। আশির দশকের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশেও নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম সময় বেঁচে থাকত। এখন আর সেই অবস্থা নেই, বর্তমানে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রায় তিন বছর বেশি বাঁচে। ১ নং চিত্রে সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে গড় আয়ু পরিবর্তনের প্রবণতা দেখানো হয়েছে। সাথে সাথে আশপাশের কয়েকটি দেশের সাথে তার তুলনা করা হয়েছে। গড় আয়ুর নিরিখে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত প্রায় একই অবস্থানে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা ছিল আরও উন্নত। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশকেই টপকে এসেছে। অপরদিকে শ্রীলংকা তার আগের অবস্থান ধরে রেখেছে। এখন বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার সমপর্যায়ে বা তার চেয়ে আরও ভালো অবস্থানে যাওয়া।

স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক নজির স্থাপন করেছে। এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। ১৯৭০ সালে এ হার ছিল ১৫০ বা ততোধিক যা এখন ৩০-এর নিচে নেমে এসেছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হারও যথেষ্ট কমেছে। স্বাধীনতার সময় প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যেত, যা এখন কমে শতকরা তিন জনের নিচে নেমে এসেছে। একইভাবে মাতৃমৃত্যু কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে–১৯৭০ সালে যা ছিল প্রায় ৮০০ তা ২০১০ সালে ২০০-এর নিচে নেমে এসেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য কিছু ক্ষেত্র যেমন নবজাতক মৃত্যুহার তেমন একটা কমেনি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বেশ নাটকীয়। একজন নারী সারাজীবন কতজন জীবিত শিশুর জন্ম দিয়েছেন তার গড়কে ইংরেজিতে বলা হয় Total Fertility Rate বা TFR। ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে TFR ছিল ৭.০ যা ২০১০ সালে কমে হয়েছে ২.৩। খুলনা বিভাগ এর মধ্যেই 'বদলি স্তর' বা 'Replacement Level'-এ পৌঁছে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই উন্নতি সারা দেশে সমভাবে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিলেট বিভাগে TFR এখনও ৩.৩।

চিত্র ১: বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশে গড় আয়ুর পরিবর্তন

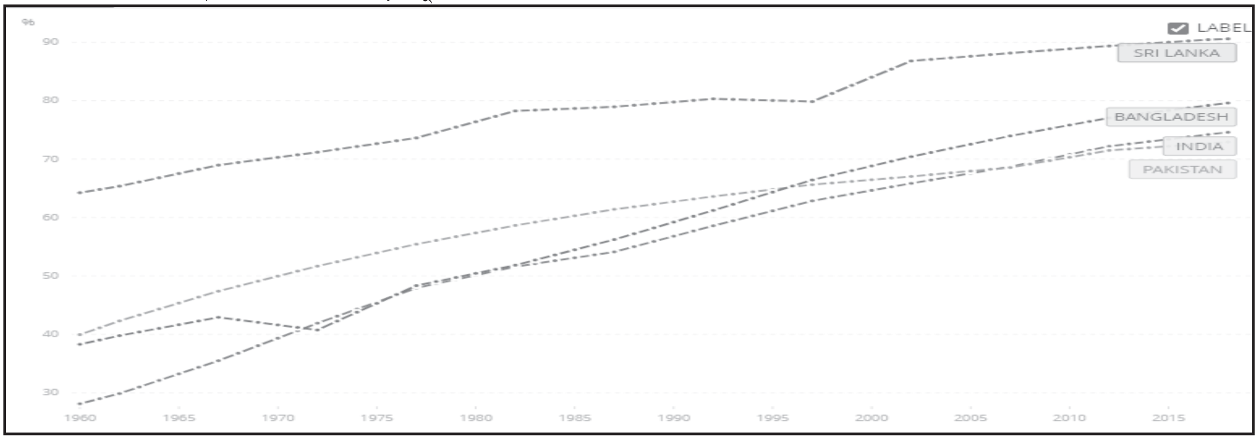

সূত্র: United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনাসমূহ

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে টিকাদান একটি। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে মাত্র দুই শতাংশ শিশু টিকা পেত। সরকারের প্রতিশ্রুতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী এবং প্রচার মাধ্যমের পূর্ণসহযোগিতায় এই হার মাত্র পাঁচ বছরে বেড়ে সত্তর শতাংশের বেশি হয়েছে। যে কারণে ইউনিসেফ এই অর্জনকে 'প্রায় অলৌকিক ঘটনা' বা 'Near miracle' বলে অভিহিত করে। বাংলাদেশ এই হার শুধু ধরেই রাখেনি, পরবর্তীতে টিকাদানের আওতা আরও বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ ছিল ডায়রিয়া। এর উপযুক্ত চিকিৎসা মুখে খাবার স্যালাইন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ব্র্যাক এক দশকব্যাপী একটি দুরূহ অভিযান পরিচালনা করে, যেখানে গ্রামের প্রতিটি মাকে লবণ ও গুড় দিয়ে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে হয় তা শিখিয়ে দেয়। লবণ ও গুড় বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরেই পাওয়া যায়। এই কর্মসূচির আওতায় ব্র্যাকের নারী স্বাস্থ্যকর্মীগণ এক কোটি চল্লিশ লাখ ঘরে যায় এবং প্রতিটি ঘরে একজন মাকে সামনা-সামনি বসিয়ে এই স্যালাইন বানানো শিখিয়ে দেয়। এ ধরনের জোরালো প্রচেষ্টার ফলে মুখে খাবার স্যালাইনের ব্যবহার সারা বিশ্বে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে (৮৩%)। বিভিন্ন জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে এবং দেখা গেছে যে, এই চিকিৎসা পদ্ধতি 'স্থানীয় সংস্কৃতির একটি অংশে' পরিণত হয়েছে, যার ফলে মায়েরা এই জ্ঞান তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তর করছে।

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য সর্বজনবিদিত, যা অনেক দেশের ঈর্ষার কারণও বটে। পঞ্চাশের দশকে পরিবার পরিকল্পনা সমিতির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ একটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে। সরকার, এনজিও, প্রচার মাধ্যম, উন্নয়ন সহযোগী এবং অবশ্যই জনগণের অঙ্গীকার ও কার্যকর ভূমিকার ফলে বাংলাদেশে গর্ভনিরোধক ব্যবহারের বর্তমান হার শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাষণেও বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। খোলা জায়গায় মলত্যাগ, যা খারাপ পয়ঃনিষ্কাশণের একটি অন্যতম সূচক, তা ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ যক্ষ্মা আক্রান্ত শীর্ষ দেশগুলোর একটি। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি করেছে। যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য সুপারিশকৃত Directly observed treatment, short course বা DOTS-এর মাধ্যমে রোগী নির্ধারণ ও চিকিৎসা সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ অনেক চিত্তাকর্ষক সাফল্য এনেছে। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার ও এনজিওদের যৌথভাবে কাজ করার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ।

আগেই বলা হয়েছে যে বিশ্বখ্যাত এবং প্রভাবশালী চিকিৎসা সাময়িকী '*ল্যানসেট*' ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ওপর একটি বিশেষ সিরিজ প্রকাশ করে। এছাড়াও লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিকাল মেডিসিন বাংলাদেশের ওপর বেশ কিছু কেস স্টাডি প্রকাশ করে যেখানে 'কম খরচে ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' অর্জনে বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। *ল্যানসেট* ও অন্যান্য প্রকাশনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সাথে তুলনা করে দেখানো হয় এই দেশ কীভাবে তাদের অনেকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অবিভক্ত ভারতের অংশ হিসাবে ১৯৪৭ পর্যন্ত এবং পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাদের একটি দুর্বলতম অংশই ছিল, কিন্তু আলোচিত প্রায় সব সূচকেই বাংলাদেশ এখন তাদের উভয়ের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

কেন এই ব্যতিক্রম : মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব

বাংলাদেশের এই ধরনের ব্যতিক্রমী সাফল্যের পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। আমার মতে এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। এ যুদ্ধ ছিল দেশীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ রক্ষার জন্য। নর-নারী নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ছিল এটি। এ যুদ্ধ শুধু বিদেশি দখলদারদেরই পরাজিত করেনি, বরং ধর্মীয় গোড়ামির আবরণে থাকা এদের স্থানীয় দোসরদেরও পরাজিত করেছিল। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেমন নারীদের প্রাপ্য সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা দেওয়া। কিছু কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন, পরিবার পরিকল্পনা, যা প্রাক-১৯৭১ সময়ে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর দ্বারা বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিল তা যুদ্ধের পর তেমন একটা হয়নি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারগুলো সমতার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করে স্বাস্থ্যখাতের জরুরি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে নতুন সরকারগুলো প্রচুর বিনিয়োগ করেছিল যেমন, নতুন নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি এবং হাজার হাজার সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, যাতে করে দূরবর্তী অঞ্চলের জনসাধারণকে সেবা পৌঁছে দেয়া যায়।

বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলতে গেলে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো বেসরকারি খাতের উপস্থিতি। এনজিওরা এদের অন্যতম। তারা ব্যাপক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক এবং চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকসমূহ যেমন, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণ, কৃষি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওদের বিনিয়োগ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। কৃষিতে বিনিয়োগের ফলে দেশে ১৯৭৪-এর পর কোনো ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। খাদ্য উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধির পেয়েছে। শিক্ষার ওপর জোর দেয়াতে ভাল ফল পাওয়া গেছে, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে আনার ক্ষেত্রে। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ এখন দেশের সর্বত্র এবং স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। এই জেন্ডারসমতা অর্জনে সরকার এবং এনজিওদের কিছু বাস্তব পদক্ষেপ অনেক সহায়ক হয়েছিল। এর মধ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য বা নগদ ভর্তুকী এবং মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের বৃত্তি প্রদান উল্লেখযোগ্য। এনজিওদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল মেয়ে এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম একাই অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের দশ লাখ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে পেরেছে, যার শতকরা ৬৫ জনই মেয়ে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে সফল কয়েকটি এনজিও-র আবাসস্থল। মুক্তিযুদ্ধ কিছু বাংলাদেশির অন্তরে গরীব ও নারীদের উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করার স্পৃহা জাগ্রত করেছিল। বৈশ্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন ব্র্যাক, গ্রামীণ বা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম একটি প্রবাদ বা লোককথায় পরিণত হয়েছে। তারা এমনসব নতুন নতুন কর্মসূচি তৈরি করেছে যা দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তাদের কাজের ফলে বিভিন্ন প্রগতিশীল নীতিসমূহ তৈরি হয়েছিল, যেমন, প্রখ্যাত ঔষধনীতি, যার ফলে প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহের দাম জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে নেমে এসেছিল। তাদের এই কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম, খ্যাতি ও পুরস্কার বয়ে এনেছিল যার মধ্যে ছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার ও নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি।

বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, যার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধ। সরকারি নীতি ও পরিকল্পনাসমূহে বারবার নিশ্চিত করা ছাড়াও নারীদেরকে বাস্তবায়নকারী ও গ্রহীতা হিসাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্মুখ সারিতে নিয়ে আসা হয়েছিল। বেশিরভাগ এনজিও কর্মকাণ্ডই প্রাথমিকভাবে ছিল নারী-কেন্দ্রিক। যেমন ব্র্যাক এক লক্ষাধিক নারীকে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, যারা বিশেষ করে গ্রামের এবং বস্তির নারীদের সেবা দিয়েছে। এনজিওদের দেয়া ক্ষুদ্রঋণের গ্রহীতারা প্রায়

সকলেই নারী। ‘আইসিডিডিআর,বি-র মাঠ এলাকা চাঁদপুর জেলার মতলবে পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে স্বাস্থ্যের ওপর এ ধরনের নারী-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব কতটা পড়েছে তা জানা যায়। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিতে পরিচালিত এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় যে সকল নারী অংশগ্রহণ করেছে তাদের বাচ্চারা যারা অংশগ্রহণ করেনি তাদের বাচ্চাদের চেয়ে বেশ ভালভাবেই বেড়ে উঠেছে (চিত্র ২)। এটা বেশ কৌতুহলের বিষয় যে, ব্র্যাক সদস্যদের অভিজ্ঞতা অদরিদ্র খানার লোকজনের মতোই প্রায়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবার ফলাফলের বিবেচনায় ধনী-দরিদ্রের মাঝে যে ফারাক ছিল তা দূরীভূত হচ্ছে।

চিত্র ২: **Cumulative probability of child survival by membership of Brac’s programme, Matlab, Bangladesh, 1988-98**

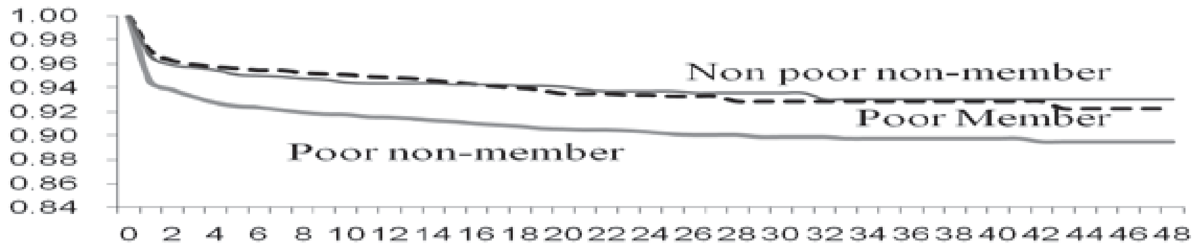

সূত্র: ভূইয়া ও চৌধুরী (২০০১)

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকের ক্ষেত্রে মুনাফামুখী বেসরকারি খাতও ক্রমবর্ধমানহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই খাতে কয়েক কোটি শ্রমিক কাজ করে যার অধিকাংশই নারী। কারখানাগুলো শহরাঞ্চলে, কিন্তু শ্রমিকরা আসে গ্রামাঞ্চল থেকে। গ্রামে তাদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠানো ছাড়াও এই শ্রমিকেরা সচেতন নাগরিকের একটি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে, যারা সাগ্রহে একটি উন্নত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে।

বড় আকারে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের রয়েছে। টিকাদান এবং খাবার স্যালাইন কর্মসূচির দ্রুত বিস্তারলাভের বিষয়টি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বারংবার ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধের বা সামাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ, আগেভাগে সতর্কীকরণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থল নির্মাণ ইত্যাদি কারণে অনেক লোকের জীবন, জীবিকা এবং সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল, অথচ ইদানিংকালে ঘূর্ণিঝড়ে তার এক ভগ্নাংশও মারা যায়নি। বিশ্বে বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে। উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের পিছনে মৌলিক গবেষণা, মনিটরিং ও মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেছে।

ভবিষ্যৎ চিন্তা

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা একটি বৃহত্তর গল্পের একদিক মাত্র। অপর দিকটা নিয়ে কিছু আলোকপাত না করলে বাস্তব অবস্থার পুরো চিত্র অনুধাবন করা যাবে না। আলোচিত অর্জন এবং একটি ক্রমবিকাশমান অর্থনীতি (বিগত বছরগুলোতে গড়ে শতকরা প্রায় ৬% প্রবৃদ্ধি) সত্ত্বেও এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা আরও বড় অর্জন থেকে বাংলাদেশকে পিছু টেনে রেখেছে। স্থায়ী দারিদ্র্য একটি বিষসম। যে কোনো নিরিখে বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ জনগণ এখনও দরিদ্র। আয়বৈষম্য অনেক বেশি যা কমছে না। এটা অনেকাংশেই রাষ্ট্রিয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল হওয়ার কারণে জবাবদিহিতাও দুর্বল এবং সম্পদেরও অপচয় হচ্ছে। জাতীয় রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত এবং দুটি অনমনীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যারা সর্বদাই একে অপরের মুখোমুখি অবস্থানে থাকে। চলতি বা ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোনো জরুরি বিষয় নিয়ে তাদের আগ্রহ বা বিতর্ক খুব কমই দেখা যায়। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে এবং এর এক-তৃতীয়াংশই থাকে বস্তিতে। কিন্তু এ থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের খুব একটা নজর পরিলক্ষিত হয় না। এনজিওগুলো শহরের বস্তিতে কাজ করছে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে এবং সরকারের সাথে সমন্বয়ের খুব অভাব। অসংক্রামক ব্যাধি যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস বা ক্যানসার ভবিষ্যতে আমাদের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার

জন্য আরও বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতির একটি বড় অংশ। এর পরও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য একটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে পরিকল্পিত পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সমাজের অবস্থান আরও খারাপের দিকে নেবে বিশেষ করে দরিদ্রদের। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি আমরা প্রায় ভুলে গেছি। তার ওপর রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে 'আউট-অব-পকেট' খরচ, যা দারিদ্র্য বিমোচনে এক বিরাট বাধা।

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ সরকারের বিনিয়োগ পৃথিবীতে সর্বনিম্ন, জিডিপির হিসেবে শতকরা এক ভাগেরও কম। কোভিড মহামারি দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কতটা ভঙ্গুর। কিন্তু এই দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নেয়ার তেমন কোনো আগ্রহও দেখা যাচ্ছে না, এমনকি এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে একটি সর্বজনীন ও কার্যকরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনাও করা যাচ্ছে না, যা মধ্যম আয়ের আধুনিক বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটাতে পারে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অর্জন বিষয়ে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথায় প্রণিধানযোগ্য : "বাংলাদেশের এই প্রশংসনীয় সাফল্যের পিছনে মূল যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হলো নিষ্ক্রিয়তা ও আত্মতুষ্টির মতো দুটো বিপদজনক বিষয় পরিহার করতে পারা।" তার সূত্র ধরে তিনি আরও বলছেন : "ভবিষ্যতে এর চাহিদা আরও বাড়বে।"

মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রকৃত শক্তি জুগিয়েছে। একটি উদার ও আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে আমাদের যে বিশ্বাস ও অঙ্গীকার তা পুনরায় নিশ্চিত করতে মুক্তিযুদ্ধই আমাদের সাহায্য করেছে। প্রতিটি বাংলাদেশির একটি উন্নত জীবন পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের যাত্রাপথে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ এগিয়ে গেছি। ভবিষ্যতে আরও অধিক মনযোগী হতে হবে, যাতে সমস্ত বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে আমাদের অগ্রযাত্রা কাঙ্ক্ষিত পরিণামের দিকে ধাবিত হয়।

ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের আহ্বায়ক ও যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথ

ড. রওনক জাহান

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেশিরভাগ সূচকে পাকিস্তানের (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) পিছনে ছিল। ৫০ বছরে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর কথা বলা যায়, যা ১৯৭১ সালের ৪৬ বছর থেকে ২০১৯ সালে এসে ৭২ বছর হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যা ১৯৭১ সালে ছিল ৫৩ বছর এবং ২০১৯ সালে ৬৭ বছর। আর ভারতের ১৯৭১ সালে ছিল ৪৪ বছর এবং ২০১৯ সালে ৬৯ বছর। প্রজনন হার বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ছিল ৭, যা ২০১৯ সালে হয়েছে ২। পাকিস্তানে এটি ৬.৬ থেকে ৩.৫-এ নেমে এসেছে, যেখানে ভারতে ৫.৫ থেকে নেমে হয়েছে ২.২। বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার ১৯৭৪-এ ছিল ৪ শতাংশ, যা ২০১৯ সালে হয়েছে ৩৬ শতাংশ। পাকিস্তানে এটি ১৯৭২ সালের ৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২২ শতাংশ হয়েছে। ভারতে এটি ১৯৭১ সালের ১৮ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২০ শতাংশে স্থবির রয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ ৬ থেকে ৭ শতাংশ হারে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়, যা ১৯৭৩ সালে ১২০ ডলার ছিল, ২০১৯ সালে তা ১,৯৪০ ডলারে উন্নীত হয়েছে, যেখানে একই সময়ে পাকিস্তানে ১৫০ ডলার থেকে হয়েছে ১,৪১০ ডলার।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম চারটি নীতির ওপর এক ধরনের ঐকমত্য তৈরি করে, যা পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে, যদিও গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠিত নীতির পথে অবিচল থাকতে পারেনি। বিচ্যুতি এবং ভাঙ্গন যেমন হয়েছে, তেমনি হয়েছে পুনরুত্থানও। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কুশীলবরা–রাজনীতিবিদ, সামরিক, বেসামরিক আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজ–এই মূলনীতিগুলিকে এক দিকে যেমন ধ্বংস করেছে, অন্য দিকে এগুলো বহাল রাখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলাদেশের শুরুতেই প্রথম বিচ্যুতি ঘটে গণতন্ত্রে। চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ কর্তৃত্ববাদীতার দিকে চলে যায় এবং ১৭ বছরব্যাপী সামরিক শাসক দ্বারা শাসিত হয়। এমনকি বেসামরিক রাজনৈতিক শাসনে ফিরে আসার পরেও সামরিক শাসন দ্বারা প্রবর্তিত অনেক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়। এর সাথে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো তাদের নিজস্ব অগণতান্ত্রিক কালাকানুন যোগ করে। ফলে গণতন্ত্রের সকল বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে কম স্কোর করতে থাকে। ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদের প্রবণতা, ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন-পীড়ন, গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে এখন প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী প্রথম ক্ষমতা গ্রহণ করে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করে। প্রথম সামরিক শাসক সামরিক আইনের অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক নীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দেন। একইসঙ্গে ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে দেন। দ্বিতীয় সামরিক শাসক আরও একধাপ এগিয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে বসেন। ধর্মনিরপেক্ষতা অবশেষে ২০১১ সালের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পুনঃসংযোগ করা হয়, কিন্তু ইসলাম এখনও রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রয়ে গেছে।

সামরিক শাসকরা সমাজতন্ত্রের সাংবিধানিক বিধানকেও দুর্বল করে দেয়। তারা সমাজতন্ত্রকে 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার' হিসাবে পুনঃসংজ্ঞায়িত করেন। স্বাধীনতার পরে সূচিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের ওপর জনগণের মালিকানা সম্প্রসারণের নীতির পরিবর্তে তারা বাজারবান্ধব নীতির জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থন শুরু করেন। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোও সমাজতন্ত্রের কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তবে বছরের পর বছর ধরে দারিদ্র্য হ্রাসের কারণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের এক সাফল্যের গল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যদিও এর সাথে সাথে বৈষম্য বেড়েছে এবং আমরা এক বৈষম্যমূলক সমাজে পরিণত হয়েছি।

রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের বিপরীতে বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, যা

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডই শুধু নয়, একটি আমূল রূপান্তরিত রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়তে, একটি নতুন জাতিকে সুসংহত করতে এবং জনগণের এই উচ্চ প্রত্যাশা পূরণ করার চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ছিল এবং বিপ্লবী পরিবর্তনের সূচনা করতে প্রস্তুত ছিল না।

স্বাধীনতার পর, হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র জমাদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এবং নতুন রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা আনতে আওয়ামী লীগ সরকারকে তখন তার প্রধান সম্পদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করতে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবকে তাঁর রাজনৈতিক দল, বেসামরিক প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে বিরোধপূর্ণ ফ্যাকশানগুলোর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ব্যবহার করতে হয়, কারণ তখন কোনো গ্রুপই অন্য কোনো গ্রুপের কথা শুনছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত শাসন নতুন রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু তাতে প্রাতিষ্ঠানিক আচার-আচরণের দীর্ঘমেয়াদী বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। মূলত তাঁর অবস্থান ছিল সংসদ, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলের মতো সকল প্রতিষ্ঠানের উপর। কারণ দেশের আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুর ওপর, কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নয়।

প্রধান নির্বাহীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার অনানুষ্ঠানিক অনুশীলন ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সালের ১৫ বছরের সামরিক শাসনের সময় প্রতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। সামরিক শাসকরা মিডিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রথমেই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে, সেই সামরিক শাসকরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল গঠন করে, নির্বাচন কারচুপির মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে 'বেসামরিক' শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এমন অগণতান্ত্রিক চর্চা বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের বিবর্তনে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে।

সামরিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত অগণতান্ত্রিক চর্চাগুলো পরবর্তী নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেনি। নির্বাচিত সরকারের আমলেও রাজনৈতিক বিরোধীরা সর্বদা দমন-পীড়নের সম্মুখীন হয়। জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো আইনের শাসন দুর্বলই থেকে যায়। অর্থ ও পেশীশক্তি নির্বাচনী ও দলীয় রাজনীতিতে আধিপত্য শুরু করে। রাজনীতি হয়ে ওঠে উত্তপ্ত ও সংঘাতময়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমবর্ধমানভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক বিরোধী দল কঠোর দমন-পীড়নের কারণে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে শাসনকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগের সংকীর্ণতার মুখোমুখি হয়ে অনেকাংশে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলে জাতীয় সংসদ একটি কার্যকর বিরোধী দল থেকে বঞ্চিত এবং বিদ্যমান বিরোধী দল নির্বাহী বিভাগের কাছে জবাবদিহিতা দাবি করার সামান্য ক্ষমতা প্রদর্শনেও অপারগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজও চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর চরম বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখার খবর আমাদের যেমন গর্বিত করে, তেমনি মর্মাহত করে যখন আমরা দেখি বৈশ্বিক গণতন্ত্রের মূল্যায়নে আমাদের অবস্থান নিম্নমুখী।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে ধরে রাখতে হলে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রূপ দিতে পারে। বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন তত্ত্বাবধান করার প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধার করা। বিরোধী দলের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস করা, যাতে এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এ জন্য আরও প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর অর্থের প্রভাব এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য নির্বাচন এবং দলীয় সংগঠনগুলোর জনসম্পৃক্ত বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কয়েমের জন্য আইনসভার ওপর নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ এবং ভোটারদের কাছে সরকারের পূর্ণ জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে আইনের শাসন-যেখানে আইন প্রয়োগকারীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ অনপুস্থিত-অবশ্যই কায়েম করতে হবে। একটি স্বাধীন, নিয়ন্ত্রণহীন মিডিয়ার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র বর্তমানে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তবে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য কিছু আশার আলোও এখন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে তরুণেরা ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারস' আন্দোলনের স্লোগান হচ্ছে, 'আমরা ন্যায়বিচার চাই'। আমাদের দেশে নিরাপদ সড়কের দাবিতে তরুণেরা যে আন্দোলন করছে, সেখানেও এমনই স্লোগান দেওয়া হয়েছে। আজকের তরুণসমাজ শুধু মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারের কথাই বলছে না, তারা সারা ধরিত্রীর প্রতি ন্যায়বিচারও দাবি করছে। তাদের এই স্বপ্ন গণতন্ত্রের ধারণাকে আরও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবে। সারা বিশ্বের তরুণেরা যত দিন ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন করবে এবং এই দাবির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে, তত দিন আমি ভবিষ্যতে উন্নততর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখি।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ মূলত নির্ভর করে দেশের নাগরিকদের ওপর। নাগরিকরা যদি মনে করে যে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিংবা শাসকরা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সংবেদনশীল আচরণ করছে না, তাহলে এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে এবং জবাবদিহিতার দাবি তুলতে হবে। সুজন-এর মতো নাগরিক সংগঠনগুলো সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা বাংলাদেশে সুশাসন ও গণতন্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখবে।

ড. রওনক জাহান, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, লেখক ও সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

৫০ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কতটা এগুলো বাংলাদেশ!

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার শপথকে বুকে আঁকড়ে ধরে ১৯৭১ সালে অর্থনৈতিক শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে চিরস্থায়ী মুক্তির আলোকযাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০২১ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিও সুবর্ণ জয়ন্তীতে পদার্পণ করেছে। বাংলাদেশে বিগত একদশকে কর্তৃত্ববাদী শাসন গেঁড়ে বসার পরিপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ৫০ বছর বয়সী বাংলাদেশের অবস্থান আজ ঠিক কোথায়, এই মূল্যায়ন তৈরির কম-বেশি চেষ্টা সমাজে দৃশ্যমান। এই আলোচনায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও বিকাশের একটা মূল্যায়ন তুলে আনার চেষ্টা করব।

একাডেমিক এক্সিলেন্স

স্বাধীনতার আগে ও পরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে কৃষি-প্রধান বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাসহ সার্বিক উচ্চশিক্ষা বিকাশের চেষ্টা করা হয়। উচ্চমান ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে 'আন্তর্জাতিক' মানসম্পন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পঠন গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও জরুরি যেখানে উচ্চশিক্ষিত এবং যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে পাঠদান সম্পাদিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর), ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি ও শেরে বাংলা), একটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমমানের তিনটি ইনিস্টিটিউট অফ টেকনোলোজি (খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিআইটি) ছিল। ৫০ বছর পরে বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি সাধারণ, ১০টি কৃষি, ৫টি প্রকৌশল, ১৭টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৫টি মেডিকেল এবং ৬টি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর বাইরেও রয়েছে বিশেষায়িত প্রকৌশল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ, টেক্সটাইল কলেজ এবং প্রায় অর্ধশত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৯০টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

তবে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা গণনায় পর্যাপ্ত হলেও শিক্ষামান ও শিক্ষা গবেষণায় দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই পশ্চাৎপদ বলেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ব্যাপক হারে বাংলাদেশে মানসম্পন্ন শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষের কারিগরি সুযোগ-সুবিধা, ল্যাব সুবিধাসহ শিক্ষা গবেষণা ফান্ডিংয়ের অভাব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধুনিক ডিজিটাল লার্নিং এবং কারিগরি সুবিধাদি একেবারেই অপ্রতুল বলে করোনাকালে প্রায় ৫৪৪ দিন স্কুল বন্ধের কালে দূরশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেল সাইমন্ডস (কিউএস) জুন-২০২১ এ বিশ্বের সেরা ১,৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করে। তালিকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অবস্থান যথাক্রমে ৮০১ তম ও ১,০০০তম। কিউএস তাদের তালিকায় ৫০০-এর পরে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করে না। দেশের শীর্ষ দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিও কিউএস-এর তালিকায় ১,০০১ থেকে ১,২০০তম অবস্থানের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে স্পেনের মাদ্রিদভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েবোমেট্রিক্স ডট ইনফো-এর ওয়েবমেট্রিক্স র‍্যাঙ্কিং-২০২২ সালের জরিপ মতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের সেরা হিসেবে বুয়েটের অবস্থান ১,৫৮৯তম। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১,৬৬৮তম, এরপর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে ১,৮১৫তম, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ২,০৫৬তম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে ২,০৭৬তম।

'স্কোপাস' বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বৃহত্তম গবেষণা তথ্যব্যাংক, যারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়নকৃত (পিয়ার-রিভিউড) গবেষণা পত্রের দেশভিত্তিক একটি উপাত্ত প্রকাশ করে। স্কোপাসের হিসেবে ২০২১ সালে ভারতের গবেষকরা প্রকাশ করেছেন ২ লাখ ২২ হাজার ৮৪৯টি গবেষণাপত্র, পাকিস্তানের গবেষকরা ৩৫ হাজার ৬৬৩টি, আর বাংলাদেশের গবেষকরা প্রকাশ করেছেন মাত্র ১১ হাজার ৪৭৭টি। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় 'স্টেট অফ নলেজ' বা 'বৈশ্বিক জ্ঞান রাজ্যে' সংখ্যাগত দিক থেকে আমাদের অবদান কোন পর্যায়ে আছে! 'স্কিমাগো র‍্যাঙ্কিং' আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোকে চারটি ভাগ করেছে, যেমন: 'কোয়ার্টার ১' বা 'কিউ-১', 'কিউ-২', 'কিউ-৩' এবং কিউ-৪। 'কিউ-১',এর জার্নালগুলো সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ, এর পরে কিউ-২, কিউ-৩ এবং সবশেষে কিউ-৪-এর অবস্থান। ২০২০ সালে বাংলাদেশের ১০টি জার্নাল স্কিমাগোর র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি 'কিউ-৩' এ এবং ৬টি 'কিউ-৪' এ, এবং একটি কোনো কোয়ার্টারে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬,২২০টি জার্নাল স্কিমাগোতে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২,৪০০টি জার্নাল 'কিউ-১' মানের। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ৪৬৯টি জার্নাল স্কিমাগোতে স্থান করে নিয়েছে, যার

মধ্যে 'কিউ-১' অবস্থান পেয়েছে ১৪টি। দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশ পাকিস্তান হতে স্থান পেয়েছে ৬১টি জার্নাল, যার মধ্যে 'কিউ-২' এ ২টি, 'কিউ-৩' এ ২০ টি, 'কিউ-৪' এ ৩৫টি, এবং ৪টি জার্নাল কোনো র‍্যাঙ্কিং ছাড়া স্থান পেয়েছে। যেখানে পাকিস্তানের ৬১টি জার্নাল রয়েছে, সেখানে আমাদের অবদান মাত্র ১০টি! এছাড়া 'কিউ-১' বা 'কিউ-২' মানের আমাদের কোনো জার্নালই নেই। এই থেকে বোঝা যায়, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে যে খাতে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া চাই তা হচ্ছে, শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষা গবেষণা।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় পশ্চাৎপদতার পরেও বাংলাদেশের বেশকিছু উদ্ভাবনী কাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ উদরাময় ও কলেরা গবেষাণায় সাফল্য রেখেছে। ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতা বাড়ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশে সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে লবণসহিষ্ণু নয়টি, খরাসহিষ্ণু দুটি ও বন্যাসহিষ্ণু চারটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন তারা। ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা ইলিশসহ কিছু দেশীয় মাছের জিনোম বা জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কয়েকটা মডেল–বার্ড ও কৃষি ব্যাংক মডেল, গ্রামীণ ব্যাংক মডেল, ব্র্যাকের আলট্রা পুওর গ্রাজুয়েশন মডেল এবং আশা মডেল প্রশংসা পেয়েছে। তবে অভিযোগ আছে, সময়ের সাথে বেসরকারি দারিদ্র্য বিমোচনের মডেলগুলো স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিবিধ সামাজিক সচেতনতাসহ উন্নয়নের বহুমুখীতা থেকে মনোযোগ সরিয়ে একমুখী ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রমে মাইগ্রেট করেছে।

শিল্প খাত এবং শিল্প প্রযুক্তির বিকাশ

প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের ঊষালগ্নে এবং বিকাশের কালে বাংলাদেশ কলোনাইজড এবং পরাধীন ছিল বলে সামগ্রিকভাবে এ দুটি শিল্পবিপ্লবের সুফল বাংলাদেশ পায়নি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে ষাটের দশকে তৎকালীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের যান্ত্রিক উৎকর্ষগুলো প্রয়োগের শুরু হয় মূলত পাট, সুতা ও বস্ত্র কলের হাত ধরে। এই সময়ে বাংলাদেশে গড়ে উঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজী, সবচেয়ে বড় সূতার কল মসলিন কটন মিলস, বেশ কয়েকটি পেপার মিলস, চিনির কল ইত্যাদিসহ আরও বেশ কিছু ভারী শিল্প কারখানা। এর আগে এখানে গড়ে উঠেছিল রেল কারখানা। সব মিলিয়ে ষাটের দশকে বাংলাদেশ শিল্পে খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। পাট, বস্ত্র ও চিনি কল বাংলাদেশে কৃষির বাইরে একটি নতুন অর্থনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে শিল্পের মালিকানা পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর কাছে থেকে যাওয়ায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপক অভিযোগ ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা ছিল শাসনতান্ত্রিক। গণতন্ত্রহীনতায় দেখা দেয় ব্যাপকতর রাজনৈতিক অধিকারহীনতা। ঊনষত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একক বিজয় ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার বিশ্বাসঘাতকতা, বাংলাদেশের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুদ্ধ পরবর্তীতে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ জটিলতা, মেধা পাচার, দুর্নীতিবাজ অদক্ষ লুটেরা রাজনৈতিক শ্রেণির বিকাশ, অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনাগত অদূরদর্শিতা এবং পুনঃপুনঃ রাজনৈতিক অচলাবস্থা এইসব মিলে ষাটের দশকে অর্জিত শিল্প বিকাশ ও সক্ষমতা সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে এসেই একেবারেই নিঃশেষ হয়ে পড়ে। ফলে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্পখাতকে একেবারেই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে হয়।

যুদ্ধ পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক ধারার রাষ্ট্রীয়করণের শিল্প নীতিকৌশল বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত হয়, এতে তৈরি হয় আন্তর্জাতিক মেরুকরণের গুরুতর সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সাহায্য মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ছিল (যেমন, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ, পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, কলেরা হাসপাতাল, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা ইত্যাদি)। মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দাতা সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক, মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে জাতিসংঘও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে মানবিক আর্থিক ও শিল্প সাহায্য দানের আশ্বাসকে কার্যত কঠিন শর্তসাপেক্ষ করে দেয়। নতুন সরকারের শিল্পনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ধারা বিকাশ করে এবং বেসরকারিকরণ বাধাগ্রস্তকরণ প্রাধান্য পায়। এতে ব্যক্তিখাতের পাট ও বস্ত্র খাতের বিকাশ বিঘ্নিত হয়। যুদ্ধপরবর্তী নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিল্প ও কৃষি উভয় খাতের বিকাশ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় শোচনীয় ব্যর্থতা দেখায়। যুদ্ধ উদ্ভূত ক্ষতি, অব্যবস্থাপনা ও বেপরোয়া রাষ্ট্র লুটের ফলে ১৯৭৪ সালে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দেশ, মারা যায় লক্ষ নাগরিক। এসময় কর্মহীন গ্রামীণ শ্রমিক দলে দলে শহর ছুটে আসে, লঙ্গরখানার আবির্ভাব ঘটে, সূচনা হয় বিস্তৃত শহুরে বস্তির। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামে কৃষি শ্রমের ছদ্ম বেকারত্বের বিপরীতে শহরে শহরে শ্রমের ঘনীভবন হয়। তবে এর মাধ্যমে শহুরে শ্রমের জোগান সহজ হয়।

ঠিক এই সময়ে সরকার পরিবর্তন হলে নতুন সরকার একমুখী রাষ্ট্রীয়করণ থেকে সরে পশ্চিম-ইউরোপীয় ধারা ভারসাম্যপূর্ণ বাজার অর্থনীতিতে ফিরে আসার দর্শন নেয়, যাতে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পোস্টাল, সড়ক-রেল-নৌ পরিবহণসহ গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা সরকারি খাতে রেখে বেসরকারি শিল্প বিকাশে হাঁটে। পাশাপাশি ভারত-সোভিয়েত রাশিয়ার বদলে মধ্যপ্রাচ্য, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিনমুখী পররাষ্ট্রনীতি ধারণ করে। এসময় নগরে কেন্দ্রীভূত হওয়া উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের ব্যবহার করে দুটি নতুন ধরনের শ্রমবাজারের বিকাশ ঘটানো হয়। একটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রম বিক্রি শুরু হয়, যা রেমিটেন্সকে অর্থনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি হবার পথ করে দেয়। অন্যটি হলো মার্কিন ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো অতি সস্তা শ্রমবাজার হিসেবে বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে তৈরি পোশাক শিল্প। এর অনুকূলে বেসরকারি খাতে শিল্পঋণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সস্তা শ্রমের অমানবিক শ্রম এবং শিল্প হলেও প্রবাসী আয়, রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানে এই দুটি শ্রমবাজার আজও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। শ্রমিক রপ্তানিকারক এবং তৈরি পোশাক-শিল্প মালিকদের হাত ধরেই বর্তমান বাংলাদেশে সূচিত হয়েছে নতুন নতুন শিল্প, এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে নবতর সব প্রযুক্তি।

পাশাপাশি আশি ও নব্বই দশকে বাংলাদেশ কৃষি খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। বর্তমানে এই তিন খাতই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে। তিন চার দশক পেরিয়ে এসে এই খাতগুলো নিজেরাই কিছু কিছু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হাঁটলেও দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখে চলেছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি, শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বর্তমান অবদান যথাক্রমে ১৫%, ৩৪% ও ২৩%। যা ১৯৮০ সালের দিকে ছিল ৩৩%, ১৭% ও ১১%। অর্থাৎ ৫০ বছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং অবদান বেড়েছে। তবে এই সময়ে বাংলাদেশের মোট কৃষি, মৎস্য এবং ফলজ উৎপাদন সাড়ে তিন গুণের বেশি বেড়েছে। ধীরে হলেও প্রতিটি খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে।

১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে আর্থ-রিসোর্স টেকনোলজি বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়, বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) গঠন করা হয়। সত্তরের দশকের শেষ থেকে টেশিস দেশে ল্যান্ডফোন সেট তৈরি শুরু করে। ২০১১ সালে মালয়েশিয়ান প্রযুক্তিতে দোয়েল ল্যাপটপ তৈরির উদ্যোগ নেয়, তবে প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক যন্ত্রাংশ তৈরি ও যুক্তকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি'। প্রধানত এটি প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও মেরামতকরণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। নব্বই দশকে এতে কিছু কিছু কৃষি যন্ত্রপাতিও তৈরি কিংবা সংযোজন হয়েছে। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে রামপুরা টিভি কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। একুশে টেলিভিশন বা ইটিভি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র। ২০০০ সালের এপ্রিলে দেশের প্রথম বেসরকারি উন্মুক্ত টেরিস্টোরিয়াল টেলিভিশন কেন্দ্র হিসেবে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। বিটিভির বিপরীতে চ্যানেলটির খবরে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থাকার কারণে দর্শকদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির অধিক বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার করছে। ২০১৮ সালে বৈদেশিক ব্যাংক ঋণে সরকার ফ্রান্সের থালিস এলেনিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্পেইস-এক্স এর কারিগরি সহায়তায় প্রথম বাংলাদেশি কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট (বিএস-১) উৎক্ষেপণ করে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম, মাল্টিপ্লেক্স ডিজিটাল টেলিভিশন) সেবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি মোটরসাইকেল আমদানিকারক এবং উৎপাদনকারী সংস্থা। এটি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের একটি সহযোগী সংস্থা। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন বা বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রগতির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে মটর গাড়ির বডি সরবরাহ করে থাকে। এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড হোন্ডা ব্র্যান্ডের কয়েকটি মোটরসাইকেলের মডেল দেশে এসেম্বলিং করতো। ২০১২ সালে এটলাস হোন্ডার সাথে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সরকারি সংস্থাগুলো উপর্যুপরি বাজে ফলাফলের বিপরীতে খাতটির নেতৃত্ব দিচ্ছে বেসরকারি খাত। বর্তমানে ওয়ালটন দেশে টেলিভিশন, ফ্রিজ, শীতাতপ যন্ত্র, ফ্যান, মোবাইল ফোন, ওভেন, রাইস কুকার, ওয়াশিং মেশিন ও লিফটসহ বিবিধ হোম এপ্লায়েন্স তৈরি করছে। একটা সময় ইলেকট্রনিকসে চীনা পণ্যে ভরপুর ছিল বাংলাদেশের বাজার। আর এখন ফ্রিজের বাজারের ৭০ শতাংশই ওয়ালটনের দখলে। এ ছাড়া টেলিভিশনের বাজারের ৩৫ শতাংশ, এয়ারকন্ডিশনের প্রায় ৪০ শতাংশ বাজার ওয়ালটনের। রানার এসেম্বলিং করছে মটরসাইকেল। ওয়ালটন বাংলাদেশে চিপ তৈরি শুরু করেছে। বিশ্বখ্যাত স্যামসাংও বাংলাদেশে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন করছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক গ্লাস (পিএইচপি, নাসির, ওসমানিয়া), কাগজ

(বসুন্ধরা) ও গাড়ি উৎপাদনে এসেছে কিছু বেসরকারি কোম্পানি। ৫০ বছরে বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। সিরামিক ও আসবাব শিল্পেও বিদেশি নির্ভরতা কেটেছে। ইস্পাত শিল্পেও (আবুল খায়ের, বিএসআরএম, কেএসআরএম) রয়েছে দেশীয় কোম্পানির আধিপত্য, জাহাজভাঙা শিল্পেও বাংলাদেশ ভাল করছে, তবে এতে পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে, বাংলাদেশের বাজারের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য ও কৃষি পণ্যের একচেটিয়া দখল রয়েছে দেশীয় কোম্পানিগুলোর।

চামড়া ও চামড়া জাত শিল্পে উদীয়মান ছিল বাংলাদেশ, তবে শোধনাগার সংক্রান্ত জটিলতায় খাতটি এখন ভুগছে। নব্বইয়ের মুক্তবাজার অর্থনীতি সংস্কারের পর থেকে বাংলাদেশে ঔষধ ও ফার্মাসিউটিকেলস খাত বেশ ভালো করছে, তবে নিম্নমান ও অদূরদর্শী ঔষধ বিপণনের ধারায় জৈব ও ব্যাকটেরিয়াল সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। বাংলাদেশ এখনও রোগীদের ঔষধ প্রেসক্রিপশনের ডেটাবেইজ এবং রোগের হিস্ট্রি ডেটাবেইজ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে স্কয়ার, বেক্সিকো, এসকেএফ এর মতো ফার্মাসিউটিকেলস কোম্পানিগুলো বিদেশে সীমিত পরিসরে ঔষধ রপ্তানি করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো টিকা উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করতে আগ্রহী।

বাংলাদেশের প্রধানতম শিল্প এবং সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। সত্তরের দশকের শেষের দিকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। ১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে দাইয়ুর সঙ্গে মিলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ১৮০ জন শিল্প উদ্যোক্তা কোরিয়ায় পোশাক খাতের ওপর ট্রেনিং করেন, সরকার পরবর্তীতে এই শিল্পপতিদের সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের আয়োজন করলে, কেউ কেউ ঋণ খেলাপি হলেও অধিকাংশই শিল্প উদ্যোক্তা হয়ে উঠে। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে, কর্মসংস্থানের দিক থেকেও পোশাক খাত শীর্ষে। পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়াতে যাচ্ছে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বিলিয়ন ডলার রপ্তানির খাত হিসেবে উঠে এসে হোম টেক্সটাইল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। পাশাপাশি ভালো করছে পাট ও পাটজাত পণ্য। বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এই খাতগুলোকে এগিয়ে নিচ্ছে সত্য, তবে প্রযুক্তিগুলো বিদেশি, বলতে গেলে কোনো প্রযুক্তিই বাংলাদেশের নিজস্ব নয়।

অবকাঠামো প্রযুক্তি

দৃশ্যমান উন্নয়ন বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন। তথাপি লক্ষ লক্ষ কিমি রাস্তার মধ্যে বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫০ বছরেও ৪ লেইনের ৫০০ কিমি রাস্তা তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের মহাসড়ক নির্মাণকাজে, সড়ক সেতু এবং রেল সেতু নির্মাণে বিদেশি ঠিকাদারই এখনও ভরসা। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও বাংলাদেশের কোন শহরে ট্রাম, বাস রেপিড ট্রানজিট (বিআরটি) কিংবা মেট্রো ট্রেন চালু করতে পারেনি। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও বাংলাদেশে এক কিলোমিটারও বৈদ্যুতিক রেলপথ নেই। বাংলাদেশের রেল এখনও সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি গতিবেগ সক্ষমতা অর্জন করেনি। তবে বাংলাদেশের নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি ১৫% গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন করে, মার্কিন শেভরন করে প্রায় ৫০%। বাংলাদেশের সড়ক সেতুগুলোই শুধু বিদেশিদের দিয়ে তৈরি, এমনকি সেতুগুলোর টোল উত্তোলনেও বিদেশি ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের ক্রুড তেল শোধনের সক্ষমতা অপ্রতুল। ফলে বাংলাদেশকে এখনও রিফাইন্ড পেট্রোলিয়াম কিনতে হচ্ছে ব্যাপক হারে। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও বাংলাদেশের কোন গভীর সমুদ্রবন্দর নেই, নেই ঢাকা-চট্টগ্রাম সরাসরি রেলপথও। তবে সরকার মাতারবাড়ি-মহেশখালীর শিল্পজোনে গভীর সমুদ্রবন্দর এবং রিফাইনারি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ঘনবসতিপূর্ণ দেশে চরম বর্জ্য ঝুঁকি নিয়েও বাংলাদেশ রাশিয়ান আর্থিক ঋণ ও কারিগরি সহায়তায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ যুগে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ প্রায় ২২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। সর্বোচ্চ সাড়ে ১৪ হাজার বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সক্ষমতা এসেছে বাংলাদেশের। তবে স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ এখনও ৪% নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মার্কে যেতে পারেনি। কৃষিতে ব্যবহৃত পানির প্রায় ৮৫% ভূগর্ভস্থ, সত্তরের দশকে খাল খননের উদ্যোগ নিয়ে পানি সংরক্ষণের চেষ্টা হলেও স্থায়ী অবকাঠামো করে সারফেইস পানির সংরক্ষণের প্রযুক্তি বিকশিত হয়নি বাংলাদেশে। একইভাবে বাংলাদেশের হাওড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে এখনও মাটির বাঁধ দেওয়া হয়, যা বছর বছর বন্যা কিংবা জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে প্রাণ ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতি করে। বাংলাদেশের এখনও আবহাওয়া পূর্বাভাসে ব্যাপকভিত্তিক স্যাটেলাইট ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তির ব্যবস্থা নেই।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যেই সর্বনিকৃষ্ট অবস্থানে। রাজধানী ঢাকার মাতুয়াইল এবং আমিনবাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উন্মুক্ত ল্যান্ডফিল যা ঢাকার আকাশে মিথেন বলয় তৈরি করছে। ঢাকার বায়ুর মানও বিশ্বে সর্বনিকৃষ্ট তিনটি শহরের একটি। বাংলাদেশের শিল্পের বর্জ্য শোধনে প্রযুক্তির ব্যবহার একেবারেই নেই বলে পরিবেশ বিপর্যয়ে বাংলাদেশ নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে। সার কারখানার এমোনিয়া, বৈদ্যুতিক রিক্সার ব্যাটারির এসিড হতে শুরু করে তৈরি পোশাক শিল্পের ডায়িং বর্জ্য এবং চামড়া শিল্পের বর্জ্য সবকিছুই শতভাগ অশোধিত অবস্থায় উন্মুক্ত জলাশয় এবং নদীতে ফেলা হয়। ইটের ভাটা, কাগজ শিল্প, ষ্টীল কিংবা জাহাজভাঙা শিল্পের বর্জ্য কোনো কিছুতেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। বাংলাদেশের ই-বর্জ্য শোধনের কোনো টেকসই ও কার্যকর উদ্যোগই ৫০ বছরে নেওয়া হয়নি। দেশের ৯৮ হাজার গ্রামে এখনও পলিথিন, পেট বোতল কিংবা প্লাস্টিক রিসাইকেলের যাত্রাই শুরু হয়নি।

বেসিক শিল্প

বাংলাদেশ তার চাহিদার প্রায় অর্ধেক সার উৎপাদন করে। সার কারখানাগুলোর মধ্যে কাফকো, শাহজালাল, জিয়া, ঘোড়াশাল-পলাশ, যমুনা সার কারখানা উল্লেখযোগ্য। তবে কাঁচামালসহ মৌলিক ক্যামিকেল প্রায় সব কিছুই বাংলাদেশ আমদানি করে। বাংলাদেশ ক্রুড ওয়েল থেকে হাইড্রো-কার্বন সেপারেট করার ‘বেসিক ক্যামিকেল’ কিংবা বেসিক পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রিতে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। এখানে এমোনিয়া বেইজড শিল্প, মেলামাইন, ব্যাপক ভিত্তিক এমোনিয়া লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠেনি। প্লাস্টিকের মৌলিক উপাদান তৈরি, হাইড্রোজেন, সালফিউরিক এসিড ও কার্বনভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশে হাই প্রেসার ভেসেল, পাইপলাইন, হিট এক্সেঞ্জার, টিউব, মেক্যানিক্যাল ভালব, স্টিল ফোর্জিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল চিলার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কিংবা জেনারেটরের যন্ত্রাংশের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ দরকার।

ব্যাংকিং টেলিকম এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তি

ব্যাংক, ব্যবসা ও বাজারকে সংযুক্তকারী এন্ড টু এন্ড পেমেন্ট সিস্টেম বাংলাদেশে এখনও সূচীত হয়নি। তবে আংশিক বেশ কিছু পেমেন্ট গেটওয়ে হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, অটোমেটিক চেক প্রসেসিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট খাতে আধুনিকায়ন আনার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশে কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার এমপেসো-এর আদলে মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেমের বিকাশ ঘটেছে, যা কিছু প্রান্তিক মানুষের অর্থ-লেনদেনকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনেছে। বাংলাদেশের ক্লাসিক্যাল ব্যাংক এখনও এলিট ও মধ্যবিত্তের জন্য থেকে যাওয়ায় মোবাইল ব্যাংকিং বা এমএফএস ভাল করছে। বাংলাদেশে দুটি সাবমেরিন ফাইবার ক্যাবল মিশনের সাথে সংযুক্ত। এই দুটি হচ্ছে, সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সিংটেল এর সিমিউই-চার এবং সিমিউই-পাঁচ কনসোর্টিয়াম। সিমিউই-৪ ল্যান্ড করেছে কক্সাজারের সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনে এবং সিমিউই-৫ কুয়াকাটা ল্যান্ডিং স্টেশনে। বর্তমানে দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা ২ হাজার ৮০০ জিবিপিএস। তবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ঢাকা-কুয়াকাটা ট্রান্সমিশন লিংকের কিছুটা কারিগরি দুর্বলতার কারণে পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যান্ডউইথ পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে যুক্ত হতে সরকারের হাতে বেশ কিছু প্রস্তাব আছে।

শহরে ‘ফাইবার টু হোম’, উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের বহু প্রকল্পের পরেও ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক ও কর্পোরেট গ্রাহক মিলে দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক ৫ শতাংশ ছড়াতে পারেনি। ফলে, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ, অনলাইন ব্যবসা, ই-কমার্স, ডিজিটাল লেনদেন ও বাণিজ্য, ক্লাসিক্যাল ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, দূরশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং, বিনোদন, সামাজিক যোগাযোগ ও গেমিং মিলে প্রায় সব প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবিকা নির্বাহের খাতসহ অর্থনীতির অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছে মোবাইল ইন্টারনেট। মোবাইল প্রযুক্তির টুজি মোটামুটি দ্রুত এলেও বাংলাদেশে থ্রিজি প্রযুক্তি আসতে দেরি হয়, তবে বর্তমানে বাংলাদেশে এসেছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল কমিউনিকেশন। ব্যাপক ভিত্তিক মেশিন টু মেশিন কমিউনিকেশন এবং আইটি সেবা নেই বলে বাংলাদেশে এখনও পঞ্চম প্রজন্মের টেলিকম সেবা আসেনি। ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা আধুনিক অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের নিম্নগতি তাই অর্থনীতি বিকাশের প্রধানতম এক প্রতিবন্ধক। ইন্টারনেট মহামারি-পরবর্তী নিউ-নরমাল জীবনের প্রধানতম এক চাহিদা। ব্রডব্যান্ডের ‘প্রায় অনুপস্থিতিতে’ মোবাইল ইন্টারনেটই শিক্ষা, জীবিকা ও অর্থনীতির ভরসা। ইন্টারনেটের গতি মাপার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওকার ‘গ্লোবাল ইনডেকস’ মতে, বিশ্বের ১৩৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৫ নম্বরে (জুন ২০২১)।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

২০০৬ সালে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ভোটার আইডি-এর নামে বাংলাদেশ ন্যাশনাল সিটিজেন ডেটাবেইজ তৈরি করে। তবে এই ডেটাবেইজ ফ্লেক্সিকল নয় বলে বাংলাদেশের নাগরিককে সেবা নিতে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কেন্দ্রে

ডেটাবেইজ তৈরির কাজে অংশ নিতে হয়। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ডেটাবেইজগুলো ঠিকঠাক না করায় কোটি কোটি মানুষের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কাজ উপর্যুপরি করতে হয়েছে। এখনও চাকরির আবেদনে কিংবা ভর্তিতে আবেদন ফরম পূরণ দরকার পড়ে। বাংলাদেশের আইসিটি রপ্তানি এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এতে সরকারের আইসিটি রপ্তানি এবং আউটসোর্সিং প্রণোদনার কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। দেশের প্রায় ৫ লাখ ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। তবে ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং শুধুমাত্র ডেটা এন্ট্রি এবং প্রাথমিক আইটি কাজ নির্ভর বলে এটা খুব বেশি টেকসই এবং ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড বলা যাবে না। বরং ভারতের আদলে সফটওয়্যার রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ভালো করতে হবে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সফটওয়্যারে রয়েছে বিদেশি কোম্পানির আধিপত্য।

পরিকল্পিত ৩৯টি হাই-টেক/আইটি পার্কের মধ্যে নির্মিত হয়েছে ৯টি। এতে কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে, তবে বরাদ্দ প্রাপ্তিতে দলীয় চ্যানেল এবং চাঁদাবাজির অভিযোগও আছে। বর্তমান সরকার জাতীয় তথ্য বাতায়ন করেছে, তবে এসব ওয়েবসাইটের তথ্য একেবারেই সেকেলে এবং সীমিত। সরকার জরুরি ৯৯৯ এবং জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ সেবা চালু করেছে, তবে তার সেবা কভারেজও এখন সীমিত। সরকার শত শত মোবাইল এপ তৈরি করেছে, তবে সেসব এপের হাজার পর্যায়েরও ব্যবহারকারী নেই। ২০২৫ সাল নাগাদ শতভাগ সরকারি সেবা অনলাইনে পাওয়া যাবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এইজন্য ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার প্রকল্পের আওতায় দেশে একটি সমন্বিত ও বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। এর ফলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ই-সেবা সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ই-সেবাগুলোর সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা উন্নত হবে। তবে তার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঘুষ ও তদবির পাশ কাটানো, ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশান বহির্ভূত শতভাগ সফটওয়্যার অটোমেশন পরিকল্পনা দরকার।

বাংলাদেশের ব্যাংক ঋণের হিসাব ম্যাপিং করার কোনো ন্যাশনাল ডেটাবেজ ভিত্তিক ক্রেডিট রেটিং সিস্টেম দাঁড় করা হয়নি, ফলে এখানে রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতার বিবেচনায় ঋণ প্রদান এবং ঋণ খেলাপি হবার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্নেন্সের অনেক কথা বলা হলেও ডিজিটাল ডোসিয়ার মূলত প্রিন্টেড ডকুমেন্টের স্ক্যানিংভিত্তিক। এখনও সিকিউর প্রাইভেট মেইলিং নয় বরং ইয়াহু জিমেইলের মতো পাবলিক মেইল যোগাযোগ ব্যবহৃত হয়। সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার প্রসেসিং, আয়কর প্রসেসিং, ই-মিউটেশন, ট্রেন টিকেটিং, বিআরটিএ-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মটর ভেহিকল ইন্সপেকশনের মতো কিছু কাজ অটোমেশনে এনেছে। তবে প্রত্যেকটি অটোমেশন অসম্পূর্ণ এবং সফটওয়ারে ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশান রাখার বিধান থাকায় ঘুষ ও তদবির ভিত্তিক প্রশাসন থেকে গেছে।

তবে করোনা মহামারি থেকে দেশের জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম, ভ্যাকসিনেশনের তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম 'সুরক্ষা' ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গা তার অতি নিম্নমানের ডেটাবেইজ। বাংলাদেশের নাগরিক ডেটা, বেকারত্ব-কর্মজীবী-পেশাজীবী শ্রমিক ডেটা, দারিদ্র্য, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী, শিক্ষার্থী ডেটাগুলো অসম্পূর্ণ। সরকারের রাজস্ব আয়ের ডেটা, সরকারের ক্রয় ও খরচের ডেটাবেজ ঠিক নেই। সরকার ডেটাবেইজের অভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারীদের আর্থিক সহায়তা দিতে পারেনি, আদতে সরকারের কাছে দারিদ্রের ডেটাবেইজ নেই, নেই প্রায় ৭০ লক্ষ এসএমই উদ্যোক্তার ডেটাবেইজ। নেই ডেটাবেইজ নির্ভর সামাজিক সুরক্ষা প্রদান কৌশল। ফলে শিক্ষা উপবৃত্তি, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কিংবা কৃষি ভর্তুকি, সার প্রণোদনার মতো বিষয়গুলো ডেটাবেইজ ভিত্তিক না হওয়ায় প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে পড়ে।

অভিযোগ আছে যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর (বিবিএস) ডেটা সিঁড়ির মত উঠে কিংবা নামে, যেখানে ডেটার সাংখ্যিক বৃদ্ধি সরকারের উন্নয়ন সূচককে (অর্থনৈতিক সূচক, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) ভালো করে দেখায়, সেখানে বিবিএস ডেটা সিঁড়ির প্যাটার্নে ক্রমাগত হারে উর্ধ্বমুখী থাকে। আর যেখানে সাংখ্যিক মানের হ্রাস উন্নতি বুঝায় সেখানে বিবিএস ডেটা ক্রমাগত নামতে থাকে সিঁড়ির মতো। এই রহস্যের জট খোলা দরকার। বিবিএস ডেটা কেন দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ, মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক মন্দা ও চাঙ্গার সাথে সম্পর্কিত হয় না, জ্বালানি মূল্যের উঠা-নামার সাথে সম্পর্কিত হয় না, কৃষি উৎপাদন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি দিয়ে প্রভাবিত হয় না, তার সদুত্তর খুঁজতে হবে বিবিএসকে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক গ্রন্থকার: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ; অর্থনীতির ৫০ বছর; অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অভাবিত কথামালা; উন্নয়ন প্রশ্নে বাংলাদেশের কিছু সংকট ও সম্ভাবনা। faiz.taizeb@gmail.com

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম : আন্তঃসম্পর্ক

রোবায়েত ফেরদৌস

“ভক্স পপুলাই ভক্স ডাই–জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর”- ল্যাটিন প্রবাদ

জ্যামিতির মতো গণতন্ত্রেরও সহজ সড়ক নেই; গণতন্ত্রের পথে কোনো রাষ্ট্রের পথচলা কখনোই একরৈখিক নয়, সবসময়ই তা আঁকা-বাঁকা–দুস্তর আর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ; এ এক দীর্ঘ আর কষ্টকর ভ্রমণ–যার পথে পথে পাথর ছড়ানো। গণতন্ত্রের আত্মম্ভর আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে রাষ্ট্রকে দু পা সামনে তো এক পা পেছনে চলতে হয়। অগণতান্ত্রিক, প্রাচীন, সামন্ত বা সামরিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পেছনে মাড়িয়ে রাষ্ট্রকে আয়াসসাধ্য ভ্রমণে নামতে হয়–লক্ষ্য গণতন্ত্রে নোঙর গাড়া। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উপস্থিতি, সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সাংবিধানিক চর্চার ধারাবাহিকতা, জবাবদিহিতা, চিন্তার বহুত্ববাদিতা –যা গণতন্ত্রের অন্যতম নিদান–একটি রাষ্ট্রে তার সঠিক চর্চা নিশ্চিত করা মোটেই সহজ কোনো বিষয় নয়। গণতন্ত্রেরই আরেক অনুষঙ্গ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বলা হয় গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কেন বলা হয়? গণতন্ত্রের সঙ্গে গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কোথায়? গণমাধ্যম কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, না গণতন্ত্রই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে? গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে অনুসরণ করে, না কি নেতৃত্ব দেয়? আবার এ প্রশ্নও তো বেশ যুতসই যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আসলে কী? কিংবা একটি রাষ্ট্র কতোটুকু গণতান্ত্রিক তাই-বা মাপা হবে কোন গজকাঠিতে?

কোনো রাষ্ট্র যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক দাবি করে তবে সেখানে গণমাধ্যমের একশ ভাগ স্বাধীনতা থাকতেই হবে; এতে আরেকটি প্যারাডক্স জন্ম নেয়–যে গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করবে, যে সাংবাদিক সরকারের ভুলচুক নিয়ে নিয়ত রিপোর্ট করবে, সেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা সেই সাংবাদিকের নিরাপত্তা আবার সেই সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। অনেকটা সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানের মতো, তারা সংসদে সরকারের কাজের সমালোচনা বা বিরোধিতা করবে, তারা যেন সংসদে তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, সেই সুযোগ সরকারি দলকেই নিশ্চিত করতে হবে। ‘আমি তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলতে দেওয়ার জন্য আমি আমার জীবন দিতে পারি’–ভলতেয়ারের এই উক্তিই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মৌল চেতনা; এই চেতনা আর এর চর্চার ভেতরেই লুক্কায়িত থাকে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা।

তো গণতন্ত্রের পথচলায় গণমাধ্যম কী করতে পারে? গণমাধ্যম নাগরিকদের বহুমুখী যোগাযোগের পাটাতনটি তৈরি করে দেয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানে যেহেতু খোলা সমাজ, তাই মানুষকে এখানে বহু স্তরে বহু পর্যায়ে বহু ধরনের তথ্য আদান প্রদান করতে হয়। গণমাধ্যম মানুষের জন্য তথ্যের বৃহত্তর প্রবেশগম্যতা তৈরি করে। সরকারকে চোখে চোখে রাখার মধ্য দিয়ে ‘গণতন্ত্রের প্রহরী’র ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম পাবলিক ডিবেট উস্কে দেয়, পলিসি এজেন্ডা নির্ধারণ করে, নাগরিক মতামতের ফোরাম তৈরি করে–যেখানে জনগণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। দুর্নীতির ওপর সার্চ লাইট ফেলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা নির্মাণ করে। অমর্ত্য সেন যেমন বলেছেন রাষ্ট্রে গণমাধ্যম স্বাধীন হলে এমনকি ঠেকিয়ে দেওয়া যায় দুর্ভিক্ষও। অজ্ঞতা ও ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে–সচেতন ভোটাররা তখন খারাপ শাসককে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারে। গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত পাবলিক স্ফেয়ার/জনপরিসর বাড়িয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সেতু গড়ে। প্রতিদিনের রাজনৈতিক ইস্যু/বিতর্ক তুলে ধরে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি মনিটর করে। বহু স্বার্থ বহু কণ্ঠস্বর তুলে ধরে। সরকারে কাজের রেকর্ড, তাদের মিশন-ভিশন, নেতাদের পারঙ্গমতা তুলে ধরে। শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণকে সম্ভব করে তোলে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, গেলো ৫০ বছরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কেবল ক্রমাবনতি ঘটেছে। ২০২২ সালে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) যে সূচক প্রকাশ করেছে, সেখানে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম (স্কোর ৩৬ দশমিক ৬৩)। ২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫২তম (স্কোর ৫০ দশমিক ২৯)। এর মানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ১০ ধাপ পিছিয়েছে। এবারের সূচকে প্রতিবেশী মিয়ানমার ছাড়া সবার নিচে বাংলাদেশ। ভারত ১৫০তম, পাকিস্তান ১৫৭তম, শ্রীলঙ্কা ১৪৬তম, আফগানিস্তান ১৫৬তম, নেপাল ৭৬তম ও ভুটান ৩৩তম। ২০২২ সালে, আরএসএফ এর প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে একজন সাংবাদিক নিহত এবং তিনজন কারাবন্দী আছে। কেন এই অধঃপতন? আমার প্রতীতি, এর পেছনে সবচেয়ে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’। গত ২৬ মাসে এই আইনে প্রায় ৯’শ মামলা হয়েছে, তারমধ্যে অধিকাংশ মামলা কেবল সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। মামলাগুলো অধিকাংশ

করেছে সরকারি দল বা তাদের সমর্থকরা। এই আইনটি ব্যাপকভাবে সাংবাদিকদের দমন, পীড়ন, হেনস্থা ও গ্রেপ্তারে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আইনটির অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার তার চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে। এর বাইরে রয়েছে সাংবাদিকদের চাকরিসহ নানাবিধ নিরাপত্তাহীনতার বোধ। আছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতি। রাজনৈতিক কারণে সব সরকারের আমলেই সরকারের বিভিন্ন বাহিনী ও সরকারি দলের মদদপুষ্ট নেতা-কর্মীরা সংবাদমাধ্যমের প্রতি চড়াও হন। গণমাধ্যমের করপোরেট মালিকানাও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পথে অন্তরায়। মালিকদের কেউ কেউ নিজেদের প্রভাব বিস্তার, ব্যবসায়িক ফায়দা তোলা কিংবা এমপি-মন্ত্রী হওয়ার জন্য অনেক সময় গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেন। ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীন সম্পাদকীয় অবস্থানকে তারা থোরাই কেয়ার করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যবহার, ভুল তথ্য আর গুজবের সীমাহীন চর্চাও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পথে অন্তরায়। সরকারি রাষ্ট্রযন্ত্র বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন ধরনের চাপ ও কৌশল ব্যবহার করেন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে। দেশে এমন এক ভয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে, যেখানে সাংবাদিক কেন নাগরিকরাও কোনো কিছু লিখতে বা বলতে বারংবার চিন্তা করেন। এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর চেহারাই যেন ফুটে ওঠে। সব মিলিয়ে আমি মনে করি, মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য সরকার, রাষ্ট্র ও সমাজকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয়, বাংলাদেশে আন্তরিকভাবে তার চর্চা কখনোই আমরা হতে দেখিনি। জাতি হিসেবে আমাদের একটা বদভ্যাস হচ্ছে বিদেশি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদন যখন সরকার ও বিরোধী দলের পক্ষে যায়, তখন তারা তা সানন্দে গ্রহণ করে, তা নিয়ে উদ্বাহু নৃত্য করে। আর বিপক্ষে গেলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে কিংবা নয়া ষড়যন্ত্রতত্ত্বের উপাখ্যান বানায়। এই অবস্থান থেকে বের হয়ে আসা এখন সময়ের দাবি। শতভাগ গ্রহণ কিংবা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি আমাদেরকে আসলে কোথাও নিয়ে যাবে না। আমাদের যা করা উচিত তা হলো–আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে সিরিয়াসলি নেওয়া, সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে বের করা। সরকারের উচিত এ ধরনের প্রতিবেদনকে প্রফেশনালি মোকাবিলা করা এবং আগামী বছরগুলোতে যাতে আমাদের সূচকের উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা করা। ভুলে গেলে ভুল হবে, উন্নয়ন কেবল পথঘাট বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, উন্নয়ন হতে হবে সার্বিক–যার মধ্যে মানুষের সাংস্কৃতিক রুচি, গুণগত শিক্ষার মান, প্রতিবেশ-পরিবেশের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা কিংবা পরমতসহিষ্ণুতার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

মনে রাখা দরকার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক, বিপরীতমুখী নয়। টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো অবস্থায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না। আবার সংবাদমাধ্যমকেও তার বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা বজায় রাখতে হবে। আমরা মনে করি, সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাকে বৈরী হিসেবে দেখা ঠিক নয়। গণতন্ত্রের বিকাশে ভিন্নমত পোষণের পূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিপক্ষ না ভেবে সাংসদেরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন–সেটাই দেশবাসী প্রত্যাশা করে। গণতন্ত্রের জন্য সমালোচনা সব সময় সহায়ক–সরকারের মনোজগতে এই সংস্কৃতিকে ঠাঁই দিতে হবে। তবে মনে রাখা দরকার, প্রেসের স্বাধীনতা মানে হাত-পা খুলে যা-খুশি রিপোর্ট করা নয়, প্রকাশিত রিপোর্টকে অবশ্যই সত্য, যথার্থ আর পক্ষপাতহীন হতে হবে। অনেস্টি, অ্যাকিউরেসি আর ফেয়ারনেস হচ্ছে সাংবাদিকতার মৌল তিন নীতি–যার ওপর দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার চর্চাটি হয়ে থাকে। তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জারি রাখার জন্য যেমন সদা সোচ্চার থাকতে হবে, তেমনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পথে আমাদেরকে আরও অনেক দূর অবধি যেতে হবে; যেতে হবে গণতন্ত্রকে সতেজ টাটকা আর ফুরফুরে রাখার তাগিদে।

রোবায়েত ফেরদৌস, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
robaet.ferdous@gmail.com

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ প্রসঙ্গে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নাগরিক সমাজের সংজ্ঞা

ইংরেজিতে সিভিল সোসাইটি (Civil Society) শব্দটির প্রচলিত বাংলা অনুবাদ হচ্ছে নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ। তবে এই বাংলা শব্দযুথটি ঝামেলামুক্ত নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে এই শব্দান্তরের মধ্যে প্রোথিত আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্যোতনা। মনে রাখতে হবে, নাগরিক সমাজের সংজ্ঞা দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক বিবর্তন, পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র কাঠামো, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রবণতা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই এই সংজ্ঞা অনেকক্ষেত্রেই পরিপ্রেক্ষিত নির্দিষ্ট। এটি একটি বিকাশমান প্রত্যয়।

নাগরিক সমাজের সংজ্ঞার বিবর্তনের প্রথম সূচনা বিন্দু ছিল রাষ্ট্রের থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য সাধন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজার থেকে নাগরিক সমাজের পৃথকিকরণ ঘটে। এরপর ঘটে আরেকটি বিভাজন–রাজনৈতিক সমাজ থেকে নাগরিক সমাজের পার্থক্যকরণ। এই বিবর্তনের ধারাকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, নাগরিক সমাজ হলো রাষ্ট্রের অংশ নয়, এমন একটি জনগোষ্ঠী, যা অভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা সংগঠিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

২০০৬ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) 'জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক একটি কর্মসূচির সূচনা করে। সে সময় আমরা সিভিল সোসাইটির একটি ভালো বাংলা শব্দান্তর করার উদ্যোগ নেই। এ প্রসঙ্গে 'জনসমাজ' বা 'আত্মজ সমাজ', 'পুর সমাজ' বা 'সুধী সমাজ' ইত্যাদি প্রস্তাব আসে। নাগরিক সমাজ শব্দগুচ্ছটি সর্বাপেক্ষা গ্রাহ্য হলেও, এটি শুধুমাত্র নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীকে বোঝায় মনে করে অনেকে আপত্তি প্রকাশ করেন। তাই আজকাল নাগরিক সমাজ ও সুশীল সমাজ–দুটি শব্দই ব্যবহার হয়ে থাকে, যদিও উভয় শব্দান্তরেরই নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সুশীল সমাজের সবাই নাগরিক হলেও, সকল নাগরিক সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। একজন নাগরিক তখনই এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যখন তিনি মূল্যবোধ ও অধিকার রক্ষার্থে লক্ষ্যনির্দিষ্ট আন্দোলনের অংশ হয়ে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকলেও, নাগরিক সমাজের সাধারণ কর্মপরিধিতে থাকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রায়ন, দুর্নীতিমুক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য নিরোধ এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে নাগরিক সমাজকে তাদের কাজের সক্রিয় পরিধির কথা বিবেচনা করে মোটা দাগে নিম্নে বর্ণিত তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়।

প্রথমত, নাগরিক সমাজের একটি অংশ যারা তৃণমূল পর্যায়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন জীবন ও জীবিকার উপাদানগুলি নিশ্চিত করতে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। প্রচলিত ভাষায় তাদের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (বা এনজিও) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এই ধারার অংশ। দ্বিতীয় আরেকটি ধারার নাগরিক সমাজ মূলত গবেষণা ও নীতি পর্যালোচনা ও তার ফলাফল প্রচারের কাজে ব্যপৃত থাকে। এরা বিজ্ঞানচক্র, পাঠচক্র, সাক্ষরতা আন্দোলন ইত্যাদির সাথেও জড়িত থাকে। এই অংশকে জ্ঞান-ভিত্তিক নাগরিক সমাজ বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় আরেকটি ধারা রয়েছে, যাদের আমরা দেখি বিভিন্ন অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে। এরা মূলত দুর্নীতি, বৈষম্য-বঞ্চনা, অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সোচ্চার থাকে এবং এসব প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর সক্রিয় নজরদারি পরিচালনা করে। নাগরিক সমাজ বলতে জনসাধারণ সাধারণত এই তৃতীয় ধারার সংগঠনগুলোকেই বুঝে থাকে। কারণ এঁদের কাজের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষভাবে সচেতন জনসংশ্লিষ্ট। 'সুজন' ও 'টিআইবি' এই তৃতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের তৎপরতা কোনো সাম্প্রতিক বিষয় নয়। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। স্বাধীনতাপূর্বকালে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত যুক্তফ্রন্টের প্রচারণায় নাগরিক সমাজ প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। ১৯৬৪ সালে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর সংগঠিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধেও নাগরিক সমাজ সোচ্চার অবস্থান নেয়, "পূর্ব বঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও" স্লোগানের ছায়াতলে সমবেত হয়। ১৯৬৬'এ ছয় দফা প্রণয়ন ও তৎপরবর্তী আন্দোলনে ও ১৯৬৯'এর আইয়ুব বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে নাগরিক সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ হলো একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাপিডিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামে মোট ১ হাজার ২২২ জন বুদ্ধিজীবীর শহীদ হওয়ার হিসাব লিপিবদ্ধ আছে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসররা বাঙালি জাতির বরেণ্য সন্তানদের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের শিরোমণি ছিলেন। বুদ্ধিজীবীরা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। আবার প্রবাসেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেছেন। এক্ষেত্রে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ও সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহানসহ আরও অনেকেই ইতিহাসের পাতায় স্ব মহিমায় ভাস্বর রয়েছেন।

তাই বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের বিকাশের ক্রমধারাটি বেশ দীর্ঘ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক শক্তি একটি অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শরনার্থী পুনর্বাসন ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। এই প্রবণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্র্যাক। এছাড়া গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বিশ্বব্যাপী গণমুখী চিকিৎসার রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নাগরিক সমাজ তাই তৎকালীন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম, অর্থাৎ দেশ পুনর্গঠন ও শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে জরুরি পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে ক্রমান্বয়ে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে নাগরিক সমাজ গুরুত্ব দিতে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়। এমন অনেক প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসে, তার ফলে নাগরিক সমাজকে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির মোকাবিলার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও লিপ্ত হতে হয়। এই প্রবণতার সূত্রপাতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করতে ১৯৮৭ সালে ৩১ জন বুদ্ধিজীবী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সাংবিধানিকভাবে অন্তরবর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং তিন জোটের যুক্ত ঘোষণার রূপরেখা প্রণয়নেও নাগরিক সমাজের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। অর্থাৎ, ১৯৯১ সালে সূচিত গণতন্ত্রের নবযাত্রায় সুশীল সমাজের অন্যতম মুখ্য ভূমিকা ছিল।

রাজনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালায় যুগান্তরী পরিবর্তন আনতেও নাগরিক সমাজের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। ড. জাফরউল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণীত হয়, যার ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশ ওষুধ রপ্তানিতে বিশ্বে অগ্রণী হয়েছে। এছাড়া, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তথ্য অধিকার আইন পাস, দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গঠন, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী উদ্যোগ এবং সম্প্রতি উত্থাপিত বৈষম্য বিরোধী বিল–এসব কিছুর পেছনেই নাগরিক সমাজের প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

একাত্তরের যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিয়েও বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ অনন্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে গণআদালতে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধপরাধীদের শাস্তি ঘোষিত হয়। সেই গণআন্দোলনের সব বিচারকই ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতিভূ। সুতরাং যুদ্ধপরাধীদের বিচারের উদ্যোগে এবং বাস্তবায়নে দেশের নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেই আমল থেকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উত্তরণে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল।

ক্ষমতায় এলে নাগরিক সমাজের যারা উপদেষ্টার পদে ছিলেন, তাঁরা পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক উত্তরণেও নাগরিক সমাজ বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই সুবর্ণ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজও দেশের নাগরিক সমাজ জনমুখী ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে সাথে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন তথা গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

নাগরিক সমাজের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের বিগত ৫০ বছরে বিকাশের ক্রমধারায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন চিহ্নিত করা যায়।

১. মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চেতনা ধারণা করা, ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিতে ভূমিকা রাখা
২. বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনের অধিকার ও মিডিয়ার স্বাধীনতাসহ গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা দেওয়া
৩. বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক ও পরিচিতিগত কারণে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থ সামনে নিয়ে আসা

রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্বীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে নাগরিক সমাজকে সব সময়ই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিক সমাজের সম্পর্কের একটি নবসূচনা ঘটে। তবে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত নাগরিক সমাজের কথা শোনার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক ধরনের উন্মুক্ততা থাকলেও, পরবর্তীতে দুই পক্ষের সম্পর্কের এক ধরনের অবনমন ঘটে। ২০১৮-এর জাতীয় নির্বাচনের পর নাগরিক সমাজ ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসের পরিমাণ অনুযায়ী ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মান উন্নত হয়, যা ২০১৩ সালের পর ধারাবাহিকভাবে অবনমিত হতে থাকে। ২০২১ সালে এসে এই মানের চরম অবনমন ঘটে। এই সময় রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মান হ্রাস পায়, আর নাগরিকদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও মান হ্রাস পায়। নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংগঠন ও সংঘ করার অধিকার ও বেশ মান হারায়। এ সময়কালে নাগরিক সমাজের তৎপরতা পরিচালনের পরিবেশ বৈরী হয়ে ওঠে এবং পরিধিও সংকুচিত হতে থাকে।

অপরদিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন কোভিড অতিমারির প্রেক্ষিতে অনেক নাগরিক প্রতিষ্ঠানের বিদেশী সাহায্য প্রবাহ কমে যায়। এর ফলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নেই এমন সব প্রতিষ্ঠান বিশেষ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

লক্ষ করা যায় যে, সার্বিক গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির অবনতির সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের অবনমনের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নাগরিক সমাজ যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিক সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল ৮০ এর দশকে, বিশেষ করে এর দ্বিতীয় ভাগে। অন্যদিকে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিক সমাজের সহযোগিতার সবচেয়ে উর্বর সময়কাল ছিল ২০০০-এর দশক, সেটাও শেষভাগে।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে, নাগরিক অন্দোলনে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন আসছে এবং নতুন নতুন ধারার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচলিত রাজনৈতিক শক্তির সম্পর্কে আস্থাহীনতা সৃষ্টির পরিপূরক হিসাবে বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। এর অধিকাংশের নেতৃত্বে রয়েছে তরুণেরা। তাছাড়া, নাগরিক সমাজের সদস্যরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রচেষ্টার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক উত্তরণে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। বাংলাদেশও সম্ভবত এ সব ধারা থেকে বিযুক্ত থাকবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অর্থনীতিবিদ ও সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জনপ্রশাসন

আলী ইমাম মজুমদার

২০২১-এ বছর জুড়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। অতিমারী করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে উৎসবে কিছুটা রাখঢাক থাকলেও কমতি ছিল না প্রাণের আবেগের। আমরা স্মরণ করেছি চ্যালেঞ্জমুখর একাত্তর, বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি, বিশাল বিজয় ও অর্ধশতকের পথচলা। আরও স্মরণ করেছে পঁচাত্তরের কালো অধ্যায় এবং দু'দুটো সামরিক শাসন। অর্ধশতকের পথ চলা একেবারে মসৃণ ছিল না। ঘাটে ঘাটে বাধা বিপত্তি, উল্টো স্রোতে পিছু চলা–এগুলো সবকিছুই দোলা দিয়েছে মনকে। আবার সাফল্যের হিসেব কষে পুলকিত হয়েছি। তেমনি আশাহত হয়েছি ব্যর্থতার দিকগুলো বিশ্লেষণ করে। আর এসব সাফল্য ও ব্যর্থতার কৃতিত্ব এবং দায় মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বের। পাশাপাশি দেশ পরিচালনায় তাদের অংশীজন হিসেবে জনপ্রশাসনেরও। জনপ্রশাসন যেকোনো সরকার ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। তার দায় আছে, আছে দায়িত্ব। তেমনি আছে অধিকার। বেশি আগে না গেলেও বলতে হয় ব্রিটিশ শাসনকালে জনপ্রশাসনের নেতৃত্ব দেয়ার অংশটি গড়া হতো বিলেত থেকে এনে। পাকিস্তান শাসন আমলেও মূল পদ-পদবীগুলোতে প্রাধান্য ছিল অবাঙ্গালিদের। বাঙ্গালিদের অংশগ্রহণ শুরু হলেও নীতি নির্ধারণী স্তরে আনুপাতিক হারে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এর অর্গল মুক্ত করে। জনপ্রশাসন পরিচালনার দায় ও দায়িত্ব স্বাধীনতার পর থেকে নিরঙ্কুশভাবে বাঙ্গালিদের। এটা আমাদের জন্যে গৌরব ও চ্যালেঞ্জের। গৌরব এ জন্যে যে, আমরাই আমাদের দেশটির প্রশাসন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছি। আর চ্যালেঞ্জের কারণ হিসেব করে দেখা দরকার এর কাঙ্ক্ষিত মান আমরা স্বাধীনতার সময়কালের স্তরে ধরে রাখতে পেরেছি কি না? তেমনি দেখতে হয় অর্ধশতকের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সে মান বাড়াতে সক্ষম হয়েছি কি না? ঘাটতি যদি থাকে তবে কেন এবং কী আকৃতি ও প্রকৃতির? আর সেসব ঘাটতি পূরণের জন্যে উদ্যোগই বা কী নেয়া হয়েছে? সবচেয়ে বড় কথা এ প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের কতটা আস্থায় আছে জনপ্রশাসন। ঘাটতি থাকলে পূরণের ব্যবস্থা কী রয়েছে তাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৃহৎ অর্থে জনপ্রশাসনের আওতায় রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক সবকিছুই আসে। তবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ অংশীদারদের জনপ্রশাসনের মূল অংশ বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়। এ নিবন্ধের আলোচনা মূলত সেই অংশ নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমেই দেখতে হয় জনগণের প্রতি জনপ্রশাসনের দায়বদ্ধতার বিষয়টি। এটা নিশ্চিত করার কথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের। এদের কর্তৃত্বেই আইন অনুযায়ী কাজ করতে হয় জনপ্রশাসনকে। আর সে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের একটি দিক থাকে তাদের দল। প্রশাসনকে তাদের সাথে কাজ করতে হবে সতর্কতার সাথে। দূরে থাকতে হবে দলীয় বৃত্তের বলয় থেকে। বিষয়টি খুব সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের একটি অংশ পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় স্রোতে গা ভাসায়, সে বিভাজন আমরা ধরে রাখতে পারছি না। এর অবশ্য একটি ঐতিহাসিক দিক আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকে জনপ্রশাসন রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশীদার হয়ে যায়। ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জাতির জনকসহ আসামিদের মাঝে সামরিক বাহিনীর লোক ছাড়াও তিন জন সিএসপি অফিসার সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাঙ্গালি ডিসি, এসডিরাও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তাদের দায়িত্বে রাখা বন্দুক, গুলি ও রেশন বিলি-বণ্টন করেন। অংশ নেন প্রতিরোধ যুদ্ধে। বেশকিছু স্থানের ট্রেজারির টাকা উঠিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় নূতন বাংলাদেশ সরকারের কাছে। তাদের অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে শরিক হন মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায়। ড. আকবর আলী খানের সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে দেখা যায়, একাত্তরের মে মাসের শেষে ইন্দিরা গান্ধি আগরতলা সফরে এসে অন্য কর্মসূচির মাঝে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা করতে চান। বাংলাদেশের আলোচক দল গঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও চারজন সিএসপি কর্মকর্তার সমন্বয়ে। এভাবে সূচনা থেকেই বাংলাদেশের জনপ্রশাসন কিছুটা রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে। এসব মুক্তিযুদ্ধকালীন বিষয়াদি গোটা জাতির আবেগ ও প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় ভিন্নভাবে দেখা চলে। তবে এ রাজনৈতিকে চরিত্র অর্জনের প্রভাবটিও থেকে যায়। ঠিক তেমনি ১৯৯৬ সনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অর্জনের আন্দোলনের এক পর্যায়ে গঠিত হয় জনতার মঞ্চ। সেটা মূলত রাজনীতিকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও বেশ কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশ নেন। বিষয়টির যথার্থতা বিতর্কিত হলেও বাস্তবতা উপেক্ষা করার নয়। বলতে হয়, এ অংশগ্রহণ জনপ্রশাসনকে অনেকটা স্থায়ীভাবে বিভাজনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এতসব টালমাটালের মাঝেও থেমে নেই পথ চলা।

আলোচনায় আসে এর গুণগত দিক। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সময়কালে সবচেয়ে সেরা ছাত্ররাই জনপ্রশাসনের শীর্ষ ক্যাডারগুলোতে ঠাঁই পেতেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও ছিল অনেক উঁচু মানের। পাশাপাশি বলতে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পড়াশোনার মানও ছিল অনেক ভালো। তাই শুধু উপরের নয়, নিচের পদে যারা কাজ করতেন তারাও পদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় মানের শিক্ষাই লাভ করতেন। আমরা শতকরা হারের বিবেচনায় শিক্ষার প্রসারে অনেক অগ্রসর হয়েছি। ভালো ছাত্রও আছে বেশকিছু।

তারা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও অর্জন করে উঁচু মান। গৌরব বৃদ্ধি করে আমাদের। তবে গড় শিক্ষার মান নেমে গেছে এটা সকলেই বলছেন। এটাকে বাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানা যায়। তবে সুফল এখনও লক্ষণীয় নয়। তেমনি জনপ্রশাসনে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বাধীনতার পর থেকেই দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদে বেশির ভাগই ধরে রাখতে পারেনি মান। বিভিন্ন প্রাধিকার কোটার ব্যাপক প্রয়োগে মেধাবীরা অনেকে হয়েছে বিতাড়িত। অথচ ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের দাবিতে আমাদের জনপ্রশাসন উত্তরোত্তর আরও অনেক চৌকস হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ইদানিং প্রাধিকার কোটা রহিত করে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে শুরু হয়েছে নিয়োগ দেওয়া। সুফল পেতে একটু সময় লাগবে। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে জনপ্রশাসন জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবে এটাই সাংবিধানিক ব্যবস্থা। তবে সরকার পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আইন দ্বারা তাদের সে দায়িত্ব পালনের জন্যে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। আইন অনুসারে সে দায়িত্ব পালনে তারা পক্ষপাতহীন ও রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে থাকার কথা। কিন্তু গত অর্ধশতকে জনপ্রশাসন জনগণের সে প্রত্যাশা পূরণে অনেকক্ষেত্রেই সচেতন নয় বলে লক্ষণীয়। অভিযোগও আছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। জনকল্যাণে নিবেদিত দক্ষ কর্মকর্তার সংখ্যাও কম নয়। আবার কারও বিরুদ্ধে লাগামহীন দুর্নীতিতে ডুবে থাকার কথাও আলোচনায় আসে। আর এসব কিছু হতে পারে শুধুমাত্র বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করছি। স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক সরকারের অনুপস্থিতিই এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হয়। তবে বাস্তবতা এই যে, শুধু সামরিক শাসনামলে নয়, বেসামরিক শাসনকালেও শাসকদল ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার জন্যে জনপ্রশাসনকে নির্বিচারে ব্যবহার করে। ফলে সরকার গঠনে তাদের ভূমিকা রয়েছে এ ধারণাবোধ থাকে এক শ্রেণির কর্মকর্তার মাঝে। তাছাড়া এ অর্ধশতকে রাজনৈতিক দলগুলোতে কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে বড় ধরনের। সংসদে এখন প্রতিনিধিত্বে অধিক হারে আসছেন ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণির লোক। তাদের রাজনীতি করা দোষণীয় নয়। তবে এসব জনপ্রতিনিধিদের একটি অংশ রাজনীতির মাধ্যমে জীবন গড়ে তুলেননি। ব্যবসা বাণিজ্য করে ফুলে-ফেঁপে অনেক টাকার মালিক হয়ে চলে আসেন ক্ষমতার বলয়ে। তদুপরি হাল ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও পরিবর্তনে জনগণ প্রধান নিয়ামক না হওয়ায় তাদের চাহিদা অগ্রাধিকারে থাকে না সেসব জনপ্রতিনিধির। সুতরাং শাসনযন্ত্রকে গণমুখী করার জন্যে তাদের জোরদার ভূমিকা রাখা কতটা সম্ভব এটা ভেবে দেখার আছে। ফলে জনপ্রশাসনের একটি অংশ জনগণের প্রত্যাশার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নয় বলে ব্যাপকভাবে আলোচিত। এটা পরিবর্তনের জন্যে গণভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এসব কিছু সত্ত্বেও গত অর্ধশতকে দেশের অর্জন কম নয়। দরিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াইসহ সামাজিক খাতে বিভিন্ন চমকপ্রদ সাফল্য উল্লেখ করার মতো। নজর কারার মতো সাফল্য রয়েছে কৃষির প্রধান উপখাতগুলোতে। এটি একদিনে হয়নি। অর্ধশতক জুড়ে চলমান রয়েছে এ কর্মকাণ্ড। শিক্ষার গুণগতমান হ্রাস পেয়েছে এটা স্বীকৃত। তবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বেড়েছে অনেক। স্বাস্থ্য খাতে আমাদের সাফল্য ইপ্সিত স্তরে না হলেও কম নয়। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক নেমেছে। জনসংখ্যার স্ফীতিও বেশ কমানো গেছে। সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের নিশ্চয়তার বিধান করা গেছে। ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশাল অগ্রগতি লক্ষণীয়। এতসব সাফল্যের মাঝেও নজরে আসে আর্থিক বৈষম্য বেড়ে চলছে লাগামহীনভাবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের অনেকটা একতরফা নিয়ন্ত্রণ ধনিক শ্রেণির জন্যে নিশ্চিত করছে বিভিন্ন প্রণোদনা। বিপরীতে দরিদ্র শ্রেণির জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অনুদান প্রশংসনীয় হলেও উল্লেখযোগ্য নয়। ধনিক শ্রেণি কার্যত থেকে যাচ্ছে কর বলয়ের বাইরে। মূলত করের জোগ-ানদার মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান নিয়ামক। তবে জনপ্রশাসনও কারও অনুরাগ বিরাগের ধার না ধেরে এ বৈষম্যের বিষয়টি জোরদারভাবে সামনে আনতে পারছে না। তদুপরি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, পরিবেশ বিধ্বংসী কার্যক্রম, বনভূমিসহ সরকারি ভূমি, নদীনালা প্রভাবশালী মহলের দখলে যাওয়া জনপ্রশাসনের জন্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের সাথে এবং কিছু ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের কারও কারও সাথেও এসব দখলবাজদের যোগ-সাজশের কথাও জানা যায়। সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে এসব সমস্যার সমাধান আবশ্যক। আর অগ্রণী হতে হবে প্রশাসনকেই।

অর্ধশতক সময় হিসেবে কম নয়। তবে তেমন বেশিও নয় একটি জাতির জন্যে। আমাদের জনপ্রশাসন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সামনেই চলছে। তবে একুশ শতকের চাহিদার মোকাবেলায় তাদের যেভাবে তৈরি হওয়া দরকার সে প্রস্তুতি তেমনটা লক্ষণীয় না। আশার কথা নিয়োগ পর্বে কোটা পদ্ধতি বিলুপ্তির ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র এদিকে আসছে। তবে বেতন ভাতাদি গত কয়েক বছরে কিছুটা বাড়লেও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় এখনও অনেক পিছিয়ে। অথচ আমাদের দেশজ আয় তাদের চেয়ে কম নয়। যথোপযুক্ত প্রণোদনা পেলে আরও মেধাবীরা আসবে। জরাজীর্ণ অতীত আর সমস্যা সংকুল বর্তমান থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে হতে পারবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্য সারথী।

আলী ইমাম মজুমদার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সুশাসন অর্জনে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি

ড. বদিউল আলম মজুমদার

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি। সুবর্ণজয়ন্তীতে গত ৫০ বছরে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এসব আলোচনায় বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পেছনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকে, যে ভূমিকা পালনে গভার্নেন্স বা শাসনপ্রক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। শাসনপ্রক্রিয়ার মূলে থাকে ক্ষমতা, যা ব্যবহার করা হয় প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগ, কিছু নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ এবং অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানকে ক্রিয়াশীল করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সক্ষমতা অর্জন ও জনগণের কল্যাণ সাধন। আর জনকল্যাণ অর্জনের জন্য প্রয়োজন শাসনপ্রক্রিয়াকে কার্যকর করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

একটি রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের লক্ষ্যও ছিলো একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে : "গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মনবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।" আর এই ঘোষণারই প্রতিধ্বনি ঘটেছে আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে, যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের স্বাধীনতার অঙ্গীকার ছিল বিদ্যমান শাসনপ্রক্রিয়ায় রূপান্তর ঘটিয়ে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যাতে সুশাসন অর্জিত হয়। এটি অনস্বীকার্য যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় সকল প্রাপ্তবয়স্কদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হলেও, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন নির্ভর করে দুই নির্বাচনের মাঝখানে নির্বাচিত সরকার কী-করে-না-করে তার ওপর। বস্তুত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন কার্যকর হয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সুশাসন তথা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নির্বাচিত সরকার যদি : মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়; কতগুলো রাজনৈতিক অধিকার বলবৎ রাখে; নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখে; আইনের শাসন নিশ্চিত করে; সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে; এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত, এসব অধিকারের, বিশেষত মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের মধ্যে বিভাজন করা দুরূহ। নাগরিকের এসব অধিকারের প্রায় সবগুলোই আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত আছে।

গত ৫০ বছরে এসব অধিকার অর্জনে তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ কতটুকু এগিয়েছে?

কিছু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশসহ আরও অনেক দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুশাসনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিডম হাউজ ও মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ করপোরেশন, যুক্তরাজ্যের ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, জার্মানীর দ্য বারটেলসম্যান স্টিফটুং, সুইডেনের ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ ও ভ্যারাইটিস অফ ডেমোক্রেসিস, জার্মানভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের আইন সালিশ কেন্দ্র ও অধিকার।

মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান **ফ্রিডম হাউস ১৯৭৩** সাল থেকে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেশগুলোকে 'ফ্রি', 'পার্টলি ফ্রি' এবং 'নট ফ্রি'–এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের বিবেচনায় ফ্রিডম হাউজের ফ্রিডম সম্পর্কিত বাংলাদেশের স্কোর ২০১৭ সালের ১০০-এর মধ্যে ৪৭ থেকে ২০২১ সালে ৩৯-এ নেমে এসেছে। সংস্থাটির সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৭২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ মাত্র দুই বছর (১৯৯১ ও ১৯৯২) 'ফ্রি' আখ্যায়িত হয়েছে, ১৯৭৫ সালে আখ্যায়িত হয়েছে 'নট ফ্রি' রাষ্ট্র হিসেবে। এছাড়া বাকী পুরোসময় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 'পার্টলি ফ্রি' ক্যাটাগরিতে।

মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ করপোরেশন তিনটি ক্যাটাগরিতে–অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ন্যায়সঙ্গত শাসন বা সুশাসন ও জনগণের ওপর বিনিয়োগ–২০টি বিষয়ে (ইনডিকেটর) তথ্য সংগ্রহ করে, যা লাল ও সবুজ রংয়ে প্রকাশ করে। সবুজ হল গ্রহণযোগ্য আর লাল হল অগ্রহণযোগ্য স্কোর। বাংলাদেশের গত ১৪ বছরের রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০০৮ অর্থবছরে অর্ধেকের কিছু বেশি (৫৩%) ইনডিকেটরে বাংলাদেশ লাল অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য স্কোর পায়। ২০২২ অর্থবছরে এসে অগ্রহণযোগ্য স্কোর করা ইনডিকেটর দাঁড়ায় ৭৫ শতাংশে। অন্যদিকে ২০০৮ সালে ন্যায়সঙ্গত শাসন বা সুশাসন ক্যাটাগরিতে দুর্নীতি দমন ব্যতীত বাকি পাঁচটি ইনডিকেটরেই (রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, কার্যকর সরকার, আইনের শাসন এবং মতপ্রকাশ ও জবাবদিহিতা) বাংলাদেশ গ্রহণযোগ্য স্কোর অর্জন করেছিল। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে সুশাসন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের অগ্রহণযোগ্য স্কোরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। ২০২২ সালে এসে দেখা যায়, এই ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত ৬টি ইনডিকেটরের সবগুলিতেই বাংলাদেশের স্কোর লাল রং (অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য) ধারণ করেছে।

ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০০৬ সাল থেকে ১৬৭ দেশের জন্য 'ডেমোক্রেসি ইনডেক্স' বা গণতন্ত্র সূচক প্রকাশ করে আসছে। নির্বাচন পদ্ধতি ও বহুত্ববাদ, সিভিল লিবার্টিস বা নাগরিক স্বাধীনতা, সরকার পরিচালনা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি–এই পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে গণতন্ত্র সূচক তৈরি করা হয়, যার পরিধি ১ থেকে ১০। এই গণতন্ত্র সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ২০০৬ সালের ৬.১১ থেকে ২০২১ সালে ৫.৯৯ নেমে এসেছে। ইকনমিক ইনটেলিজেন্সের অভিমতে বাংলাদেশ একটি হাইব্রিড রিজিম বা শঙ্কর গণতন্ত্র, যেখানে গণতন্ত্রের সকল অনুষ্ঠান-আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু এগুলো বহুলাংশে অকার্যকর।

জার্মান থিংকট্যাঙ্ক **বারটেলসম্যান স্টিফটুং** গভর্নেন্স ও ডেমোক্রেসি সূচক তৈরি করে থাকে, যার পরিধিও ১ থেকে ১০। তাদের গভর্নেন্স সূচক অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর ২০০৬ সালের ৪.৭৩ থেকে ২০২০ সালে ৪.৫৭-এ নেমে এসেছে; এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৭টি দেশের মধ্যে ২০০৬ সালের ৬২তম থেকে ২০২২ সালে ৭৮তম-তে নেমে আসে। আর ডেমোক্রেসি সূচক ২০০৬ সালের ৬.৫৫ থেকে ২০২২ সালে ৪.২৫-এ অবনতি ঘটেছে। সংস্থাটি ২০০৬ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে 'ডিফেক্টিভ ডেমোক্রেসি' বা ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করলেও ২০১৮-২০২২ পর্যন্ত 'মডারেট অটোক্রেসি' বা আংশিক কর্তৃত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান **ভ্যারাইটিজ অফ ডেমোক্রেসিস (ভি-ডেম)** গণতন্ত্র ও সুশাসনের বিভিন্ন সূচক বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করে। ভি-ডেম পাঁচটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের নীতিগুলোর কী অবস্থা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো : নির্বাচন, উদারনীতি, অংশগ্রহণমূলক, যুক্তিভিত্তিক সংলাপের পরিবেশ এবং সমতা। ভি-ডেম প্রস্তুতকৃত লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্সে ২০২১ সালে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ছিল ০.১২, যা বিশ্বের ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। ভি-ডেমের সংগৃহীত তথ্য থেকে যায়, ১৯৭১ সালে লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্সে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ০.১১। এরপর ১৯৯০ সালের দিকে স্কোর বাড়তে বাড়তে ২০০০ সালে সর্বোচ্চ ০.২৯ পর্যন্ত পৌঁছায়।

চিত্র ১ : ভি-ডেমের লিবারেল ডেমোক্রেসি ইনডেক্স অনুযায়ী ১৯৭১-২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর

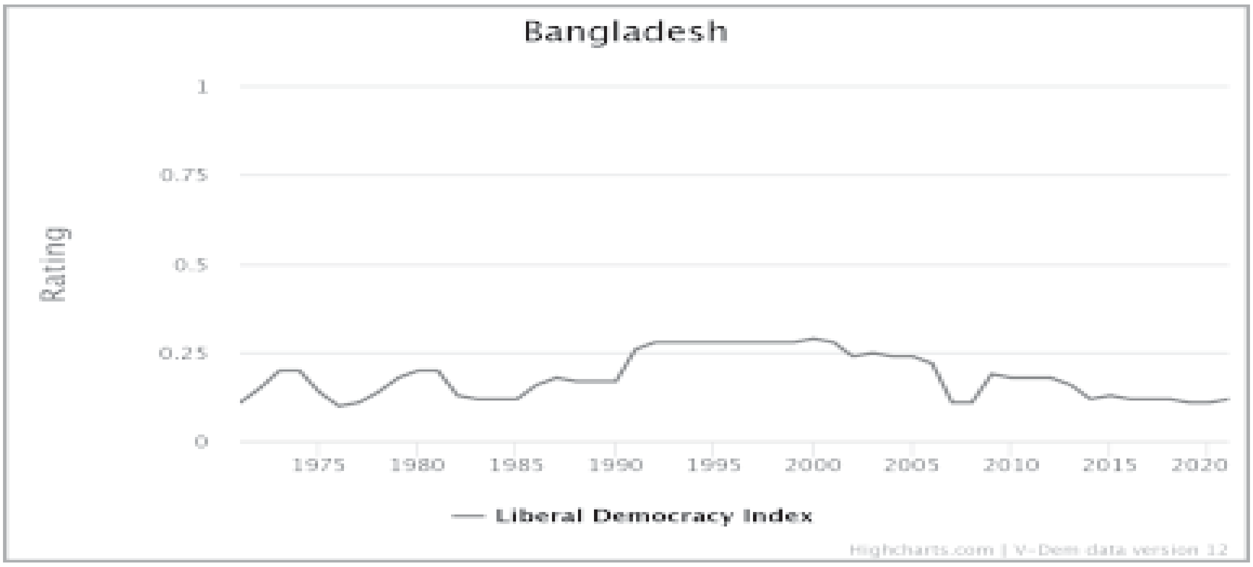

পরবর্তী বছরগুলোতে স্কোর আবার নিম্নমুখী হতে হতে বর্তমান স্কোরে (০.১২) নেমে আসে। অর্থাৎ ভি-ডেম-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ১৯৭১ সালে যা ছিল ২০২১ সালে এসেও তাই-ই রয়ে গেছে–যথাক্রমে ০.১১ ও ০.১২। ভি-ডেম দেশগুলোকে ইনডেক্স স্কোর প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রেজিমেও ভাগ করে। ভি-ডেম কর্তৃক ক্যাটাগরি করা রেজিমগুলো হলো: লিবারেল ডেমোক্রেসি, ইলেকটরাল ডেমোক্রেসি, ইলেকটরাল অটোক্রেসি এবং ক্লোজড অটোক্রেসি। সংস্থাটির করা ডেমোক্রেসি রিপোর্ট-২০২২ বাংলাদেশকে ইলেকটরাল অটোক্রেসি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

সারণি ১ : বিশ্বব্যাংকের সুশাসন সূচকে ১৯৯৬-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর

	পার্সেন্টাইল র‍্যাংক (০-১০০)							
	১৯৯৬	২০০০	২০০৪	২০০৮	২০১২	২০১৬	২০১৮	২০২০
বাক্ স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা	৫০.০০	৪৪.৭৮	২৭.৮৮	৩৩.১৭	৩৪.৭৪	৩০.৫৪	২৭.০৫	২৬.৫৭
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	২৬.৬০	২৪.৮৭	১০.১৯	৯.৬২	৯.০০	১০.৯৫	১৩.৬৮	১৬.০৪
সরকারের সক্ষমতা	২৭.৩২	৩০.৭৭	২০.২০	২৫.২৪	২৪.১৭	২৫.৪৮	২১.৬৩	২৬.৪৪
নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান	১৭.৯৩	১৮.৪৬	১২.৩২	১৭.৪৮	১৮.৯৬	২২.১২	১৮.৭৫	১৬.৩৫
আইনের শাসন	২০.১০	২২.২৮	১৫.৭৯	২৫.০০	১৮.৩১	২৭.৮৮	২৭.৮৮	৩০.৭৭
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	১৭.৭৪	১০.৬৬	১.৪৬	১৫.০৫	২১.৩৩	১৮.৭৫	১৬.৮৩	১৬.৮৩

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেক্টরাল এসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ) ২৮টি ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের সূচক তৈরি করে। এই সূচকের ভিত্তিতে ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে দুর্বল গণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশ কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রসঙ্গত, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ দূরাবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের গেল ডিসেম্বর ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত 'ডেমোক্রেসি সামিটে' বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর মাধ্যমে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই হাল ছেড়ে দিয়েছে বলেই মনে হয়।

গভার্নেন্স বা সুশাসন সম্পর্কে **বিশ্বব্যাংকের** সূচকই সবচেয়ে বেশি কম্প্রিহেন্সিভ ও গুরুত্বপূর্ণ। বাক্ স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি, সরকারের সক্ষমতা, রেগুলেটরি কোয়ালিটি, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ৪০টি উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থানের নির্ণায়ক হিসেবে এই সূচকটি প্রকাশ করে আসছে। বিশ্বব্যাংকের সূচক অনুযায়ী, বাক্ স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবনতি সর্বাধিক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৫০ থেকে ২৬.৫৭-এ নেমে এসেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অভাব/সন্ত্রাসের দিক থেকেও বাংলাদেশের বড় অবনমন ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে গত ২৪ বছরে বাংলাদেশের স্কোর ২৬.৬০ থেকে ১৬.০৪-এ অবনতি ঘটেছে। সরকারের সক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান এবং দুর্নীতি দূরীকরণের স্কোরের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবনমন ঘটেছে, যদিও এ অবনমনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত সামান্য।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের 'করাপশান পারসেপশন ইন্ডেক্স' অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ২০১৪ সালের ২৫ থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ২৬-এ উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৫ থেকে ১৪৬-এ পরিণত হয়েছে। তবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে সূচক বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার যথার্থ প্রতিফলন নয় বলেই অনেকের আশঙ্কা। উদাহরণস্বরূপ, গ্লোবাল ফাইনানসিয়াল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে ৫ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। আর দুর্নীতির বিস্তৃতি কত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তার আলামত পাওয়া যায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘটনাবলী থেকে। যেহেতু দুর্নীতির সংজ্ঞা অনুযায়ী, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজে লাভবান হওয়া বা অন্যকে লাভবান করাই দুর্নীতি, গত জাতীয় নির্বাচনে যারাই মধ্যরাতের ভোটের সঙ্গে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তারাই গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭৩-৭৪ ধারা অনুযায়ী 'দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম' ও 'বেআইনী কার্যক্রমে'র অপরাধ করেছেন, যার শাস্তি দুই থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড। দুর্নীতির এ ব্যাপকতা কল্পনাকেও হার মানায় এবং বস্তুত একটি দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়!

ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টও আইনের শাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তাদের আইনের শাসনের সূচক আটটি বিষয়ের সমন্বয়ে তৈরি, যেগুলো হলো : সরকারি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতির অনুপস্থিতি, সরকারের উন্মুক্ততা, মৌলিক অধিকার, শান্তি ও শৃঙ্খলা, সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ, দেওয়ানি বিচার এবং ফৌজদারি বিচার, যার সর্বোচ্চ স্কোর ১। বাংলাদেশের জন্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টের সার্বিকভাবে আইনের শাসনের সূচক ২০১৫ থেকে ২০২১ এর ০.৪২ থেকে ০.৪০-এ অবনতি ঘটেছে। আর আইনের শাসনের দিক থেকে ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আগের বছর থেকে দুই ধাপ পিছিয়ে ২০২০ সালে ১১৫-এ পৌঁছেছে।

সারণি ২ : বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা কার চোখে কেমন

সংস্থার নাম	**ক্যাটাগরি**
ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	হাইব্রিড
ভি-ডেম	ইলেক্টরাল অটোক্রেসি
বেরটেলসম্যন স্টিফটুং	মডারেট অটোক্রেসি
ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ	অথোরেটিয়ান রেজিম
ফ্রিডম হাউস	পার্টলি ফ্রি

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার দিক থেকেও বাংলাদেশের অবনতি ক্রমবর্ধমান। **রিপোটার্স উইদাউট বর্ডাসের** তথ্যানুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের প্রয়োগ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের কারণে রিপোটার্স উইদাউট বডার্স যে ৩৭টি দেশকে 'প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটরস' বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ঘাতক বলে হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তাতে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত। সংস্থাটির রিপোর্ট অনুযায়ী, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মাপকাঠিতে ২০২১ সালের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান এক লাফে ১০ ধাপ পিছিয়ে ১৬২তম হয়েছে।

গুম, খুন, অপহরণ এবং নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার এক অপসংস্কৃতিও আজ আমাদের দেশে বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ, **আইন ও সালিশ কেন্দ্রের** তথ্যানুযায়ী, ২০০৯ সালে ২২৯ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হলেও, ২০১৮ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৪৬৬ জনে। ২০২০ সালে এ সংখ্যা ২০৪, যদিও বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় এ সময়ে আরও ৭৫ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছে। প্রসঙ্গত, গত বছর পুলিশ কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহার খুনের পর সারাদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বিচারবহির্ভূত হত্যায় অনেকটা লাগাম টানা হয়েছে, যদিও অনিচ্ছাকৃতভাবে নিখোঁজ হওয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে হতাশার কথা যে, ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৪৬ জন থেকে ২০২০ সালে এক হাজার ৬২৭ জনে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ৩ : আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি

	২০০৯	২০১৭	২০১৮	২০২০
বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন	২২৯	১৬২	৪৬৬	২১২
গুম	তথ্য নেই	৬০	৩৪	৬
ধর্ষণের শিকার	৪৪৬	৮১৮	১৭৩	১৬২৭
সাংবাদিক নির্যাতন	২৭০		২০৭	২৪৭

অধিকারের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে যেখানে গুমের সংখ্যা ছিল ২৭, সেখানে ২০২১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ২৩-এ। তবে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে গুমের সংখ্যা ছিল ৯০-এর উপরে। বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা ২০১২ সালের ৭০ জন থেকে ২০২১ সালে ১০৭ জনে উন্নিত হয়েছে, যদিও সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৬৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছিল ২০১৮ সালে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছরে। রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ২০১২ সালে ১৬৯টি ঘটলেও, ২০১৩ সালে–দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে–তা ৫০৪-তে উন্নীত হয়, যদিও পরবর্তী বছরগুলোতে তা কমেছে। অধিকারের হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ সালে ১৮২ জন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত উপরিউল্লেখিত এসব তথ্য-উপাত্ত ও সূচক নিসন্দেহে কার্যকর গণতন্ত্র তথা সুশাসন অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির পরিচায়ক নয়, বরং এ ক্ষেত্রে আমাদের যে ক্রম অবনতি ঘটছে তারই প্রতিফলন। এটি সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারসমূহ ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও বর্তমানে ভয়াবহভাবে ভূলণ্ঠিত। আইনের শাসনের পরিবর্তে অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়ার এক অপসংস্কৃতি আমাদের ওপর জেঁকে

বসেছে। আমাদের সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলো আজ সর্বোতভাবে বিপন্ন। তাই গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও, এগুলো বহুলাংশে অধরাই থেকে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোই–যারা ক্ষমতায় আছে কিংবা ক্ষমতায় ছিল–কমবেশি দায়ী। বস্তুত যে গিয়েছে লঙ্কা, সে-ই রাবণ হয়েছে, রয়েছে শুধু মাত্রার প্রার্থক্য। দুর্ভগ্যবশত এসব কারণে ভয়ের যে আবহ আজ আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে তাতে সত্য বলার সাহসিকতা, স্বার্থহীন সংগঠিত প্রতিবাদ ও বিবেক তাড়িত স্বাধীন কণ্ঠস্বর অবদমিত হয়ে পড়েছে।

সারণি ৪ : অধিকারের তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং রাজনৈতিক সংঘাতে নিহতের সংখ্যা

	গুম	**বিচারবহির্ভূত হত্যা**	**রাজনৈতিক সংঘাতে মৃত্যু**
২০০১	তথ্য নেই	৪৪	৬৫৬
২০০২	তথ্য নেই	৮৩	৪২০
২০০৩	তথ্য নেই	৮১	৪৩৬
২০০৪	তথ্য নেই	২৪০	৫২৬
২০০৫	তথ্য নেই	৩৯৬	৩১০
২০০৬	তথ্য নেই	৩৫৫	৩৭৪
২০০৭	তথ্য নেই	১৮৪	৭৯
২০০৮	তথ্য নেই	১৪৯	৫০
২০০৯	৩	১৫৪	২৫১
২০১০	১৯	১২৭	২২০
২০১১	৩২	৮৪	১৩৫
২০১২	২৭	৭০	১৬৯
২০১৩	৫৪	৩২৯	৫০৪
২০১৪	৩৯	১৭২	১৯০
২০১৫	৬৭	১৮৬	১৯৭
২০১৬	৯৩	১৭৮	২১৫
২০১৭	৯০	১৫৫	৭৭
২০১৮	৯৮	৪৬৬	১২০
২০১৯	৩৪	৩৯১	৭০
২০২০	৩১	২২৫	৭৩
২০২১	২৩	১০৭	১৮২
মোট	৬০৫	৪১৪০	৫১৫৮

এছাড়াও ভিন্নমত ও ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা আজ আমাদের দেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চরম অবক্ষয় ঘটেছে। বস্তুত আমরা এক ধরনের নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতিতে মত্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আজ ভঙ্গুর অবস্থায় এবং এগুলো চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহ নীতি-আদর্শ বিবর্জিত এবং এগুলো অভ্যন্তরে গণতন্ত্র, শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব এখন সর্বজনবিধিত। বস্তুত বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ছত্রছায়ায়ই সব ধরনের অন্যায় ও অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং এগুলো সিন্ডিকেটের মত আচরণ করে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন, বিশেষত ছাত্র ও যুবসংগঠনের আচরণ বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকার আর ক্ষমতাসীন দলে মধ্যে পার্থক্য বিলীন হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশ আজ দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন ও লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এ সবই ঘটেছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে 'প্রভূত্বের কাঠামো' সৃষ্টি হয়েছে ত আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালেও অব্যাহত থাকার কারণে। তাই নাগরিক হিসেবে আমাদের আজ জেগে উঠার সময় এসেছে, তা না হলে এর মাসুল ভবিষ্যতে আমাদের সবাইকেই গুণতে হবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

বাংলাদেশের তরুণদের গল্প

মাহবুব মজুমদার

বাংলাদেশের গল্প প্রায়শই তরুণদের বীরত্বের মাধ্যমে বলা হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মহাবিস্ফোরণ শুরু হয় তরুণদের হাত ধরে। একাত্তর সালে তরুণরাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তরুণদের হাত ধরেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে এবং এই তরুণরাই সস্তা শ্রম দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি বর্তমানে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করেছে।

তবে প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের তরুণদের জীবন যুদ্ধের গল্পটা আরও জটিল ও হতাশার। ১৯৭১-এর যুদ্ধে দলে দলে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন দেশ গঠনে অবদান রেখেছিল সেসময়কার প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ-তরুণীরা। তাদের স্বপ্ন ছিল একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যেখানে সবাই মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং একটি গতিশীল তরুণ কর্মশক্তির বলে তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে দেশ সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো–দেশের তরুণরা কি সে পথে হেঁটেছে? কিছুক্ষেত্রে উত্তরটি ইতিবাচক হলেও, অনেকক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে এখনও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

ক্ষেত্রভেদে তারুণ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। ইউনিসেফ (UNICEF) ১৫ থেকে ২৪ বছরবয়সী জনগোষ্ঠীকে তরুণ হিসেবে বিবেচনা করে। সে হিসেবে দেশের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা ২০ শতাংশই তরুণ। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বয়স ৩০ বছরের নিচে। চিত্র -১-এ ২০০০ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যা ও ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা পাশাপাশি দেওয়া আছে।

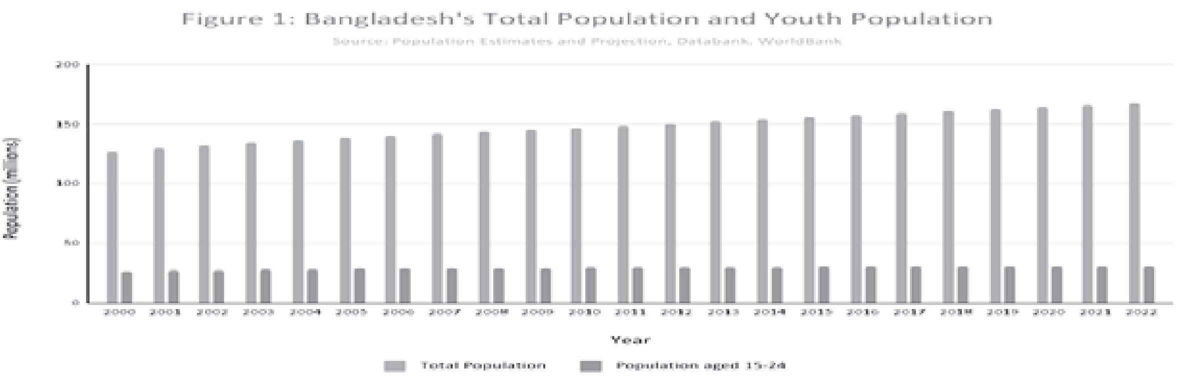

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে যেখানে ছয় হাজার ১২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল, ২০১৯ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৬৬০টিতে। ১৯৭১ সালে, এ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়টি এবং ৫০ হাজারেরও কম শিক্ষার্থী পড়াশোনার সুযোগ পেতো। বর্তমানে দেশে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫০টির কাছাকাছি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ লাখ। একাত্তর পরবর্তী সময়ে এই ৩২ বছরের কম বয়সীদের কল্যাণেই দেশের জিডিপি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বাংলাদেশের তরুণদের অবদানের একটি নমুনা মাত্র। তবে এই ধরনের পরিসংখ্যানে কোয়ালিটি বা গুণমানের পরিবর্তে কোয়ান্টিটি বা সংখ্যা/পরিমাণগত দিকটির প্রতিফলন।

অগ্রসর বিশ্বের প্রতিটি দেশই স্বাধীনতা লাভের পর তরুণদের মেধা বিকাশের জন্য অবকাঠামো সৃষ্টির দিকে মনযোগী হয়েছিল। তারা মানসম্পন্ন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং বিভিন্ন পরিষেবা নাগরিকদের হাতের নাগালে পৌঁছায় এবং এসব সুবিধাদির কারণে অসংখ্য মানুষ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ও উৎপাদন খাত বিকশিত হয় এবং একটি বিকশিত ও অত্যন্ত দক্ষ পরিষেবা খাত গড়ে উঠে। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবণতা দেখেছি। ১৯৭১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান সূচকগুলো বাংলাদেশের মতোই ছিল। কিন্তু ৫০ বছর পরে এসে দুই দেশের উন্নতির ভিন্নতা আকাশচুম্বী এবং সত্যিই মেনে নেওয়া কঠিন।

তবে বাংলাদেশের অগ্রগতির পথ কখনো মসৃন ছিল না। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অনেকটা সময়ই কেটেছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সংকটের মধ্য দিয়ে। এসময় যুবদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও জাতি গঠনে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে নীতি-নির্ধারকেরা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখায় বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এসময় দেশের প্রথম দুই সরকার/রাষ্ট্র প্রধানকে খুন করা হয়–জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এসময় নীতি-নির্ধারক ও সমাজের অভিজাত শ্রেণির অনেকেই পালিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজ বুঝতে পারে যে নিজেদের ভাগ্যবিনির্মাণে তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এভাবে সেই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এই তরুণেরাই দেশকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

তরুণদের মধ্যে সেসময় যাদের কারিগরি শিক্ষা ছিল, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। এদের কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে কাজের সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং অনেকে পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে অভিবাসী হিসেবে চলে যায়। প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তারা মরুভূমির মাঝখানে ওইসব দেশের জন্য শহর ও বাড়িঘর নির্মাণের কাজ করতে থাকে। এই জনশক্তি রপ্তানি খাতটি বাংলাদেশকে বিভিন্ন রকমের সুবিধা দিয়েছে। ১৯৭৬ সালে অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল জিডিপির ০.১৯ শতাংশ। ২০১২ সালে এই রেমিটেন্স বেড়ে দাঁড়ায় জিডিপির ১০.৫ শতাংশে এবং ২০২২ সালে এটি জিডিপির ৬.৭ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা ১৯৭৬ সালের তুলনায় ৩৫ গুণ। ১৯৭২ সালের মাত্র ২৭০ মিলিয়ন ডলার রিজার্ভ মুদ্রা ২০২২ সালে এসে প্রায় ৪৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে, যা ১৭০ গুণ বেশি। এই রিজার্ভ বাংলাদেশকে উচ্চ সুদে বৈদেশিক অর্থায়ন এড়াতে এবং পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি করতে সক্ষম করেছে। পাশাপাশি এটি বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সংকট এড়াতেও সহায়তা করেছে, যা আমাদের নিকটবর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তান বর্তমানে ভুগছে। এছাড়া, এটি আমাদের মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন সহজতর করেছে এবং স্থানীয় ব্যবসার সাফল্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, বিশেষ করে কাঁচামাল বা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে।

যারা দেশ ত্যাগ করতে পারেনি, বিশেষ করে তরুণীদের জন্য, স্বাধীনতা পরবর্তী ভবিষ্যৎ জীবন ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু তাদের সস্তা শ্রম বাংলাদেশে পোশাক শিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং এতে লক্ষাধিক কর্মীর কর্মসংস্থান হয়, যাদের অধিকাংশই তরুণী। বিকাশমান সস্তা শ্রম, অদক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ততার সেই সুযোগটিরও সদ্ব্যবহার করেছেন উদ্যোক্তারা। করোনা মহামারি শুরুর আগের বছর, অর্থাৎ ২০১৯ সালে, এই খাতটি ৪৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানি করতে ভূমিকা রেখেছে, যা এবং ওই বছরে ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এর পাশাপাশি নারীদের এমন কমর্সংস্থান উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতেও ভূমিকা রেখেছে। কর্মজীবী নারীরা তাদের উপার্জিত আয়ের মাধ্যমে বয়স্ক এবং খুব অল্প বয়সীদের জন্য একটি সুরক্ষা জাল তৈরি করতে সহায়তা করেছে। পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার সংস্পর্শে এসে তারা সেই জ্ঞান তাদের গ্রামেও ছড়িয়ে দিয়েছে। এটি দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের অল্প বয়সী শিশুদের উন্নত পুষ্টি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সচেতনতা, সর্বোপরি স্বাস্থ্যসেবাতে অবদান রেখেছে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার যাঁতাকলে নিত্য পিষ্ট হতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ বন্ধের কারণে তিন বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রাম কখনো কখনো ছয় বছরে শেষ হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা তরুণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের প্রভাবিত করেছে। চাকরি পাওয়া বা উপার্জনক্ষম হয়ে পরিবারকে সহায়তা করার পরিবর্তে ছাত্রাবস্থায় আটকা পড়ে যাচ্ছিল তরুণরা। এমনি পরিস্থিতি মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পে পরিণত হয়েছে। যদিও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রথমে উপহাস করা হতো, কিন্তু বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১৫০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এবং তারা প্রায় পাঁচ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে। আজকাল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সুদূর প্রসারী শিক্ষাবিষয়ক উদ্যোগের জন্য অনুকরণীয়। উদাহরণস্বরূপ, মহামারি চলাকালীন যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছিল এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়–ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়–তার নিজস্ব অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল।

এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বুয়েট বছরে প্রায় ১২৫ জন শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (CSE) প্রোগ্রামে ভর্তি করে। বিপরীতে ড্যাফোডিলের মতো একটি প্রযুক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় তার আইটি এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রোগ্রামে প্রতি বছর চার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করে এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি লিবারেল আর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (CSE) বিভাগে ছয় হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রযুক্তিগত শিক্ষার সংস্পর্শে আসা এসব শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন শিল্প ও পরিষেবা খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়েছে।

ভালো আয়, উন্নত পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসারের কারণে তরুণরা ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হয়েছে। তবে লিঙ্গ ও ধর্মীয় বৈষম্য, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, পুঁজির অভাব এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার মতো কাঠামোগত সমস্যাগুলো সেই ভবিষ্যৎ অর্জনে বাধা সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি দেশে শিক্ষার মানে ধস নেমেছে। এই পরিস্থিতে অনেক তরুণ এনজিও, সমবায় সমিতি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধানও খুঁজে পেয়েছে। তারা হাত ধোয়া থেকে শুরু করে নারীর প্রতি সহিংসতা, তৃণমূল পর্যায়ের আইনি সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলছে এবং হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষের মতো আয়বর্ধক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তারা স্বল্প সুদের ঋণের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে এবং অর্থনৈতিক সমবায় সমিতি গঠনে সহায়তা করে। এর ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীরা তাদের তৈরিকৃত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছে।

বাংলাদেশে বেশিরভাগ এনজিও তাদের মূল স্বেচ্ছাসেবকভিত্তিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরে গেছে এবং কর্পোরেট কাঠামোতে দাতাগোষ্ঠীর দেওয়া অর্থের মাধ্যমে সংস্থা পরিচালনা করছে। তাই বলে স্বেচ্ছাসেবকভিত্তিক কোনো কার্যক্রম নেই, এমনটি নয়। এখনও তরুণদের নেতৃত্বে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে। উদাহরণস্বরূপ, দি হাঙ্গার প্রজেক্টে কয়েক লাখ স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, যারা তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সহায়তা করছে। এছাড়া বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড, যা স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত হয়, ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে প্রথম স্বর্ণ পদক জয় করে। এই সাফল্য অনেক তরুণকে অলিম্পিয়াড আয়োজনে উৎসাহিত করে। গ্রামীণ ব্যাংকের বিশ্বস্বীকৃত নোবেল পুরস্কার অর্জন তরুণদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং তরুণদের অনেকেই দেশে এনজিওর মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। তবে দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ তরুণদের সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগতে পারেনি। তাদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তলানিতে—১৩৩তম।

বাংলাদেশের অধিকাংশ যুবকের জন্য কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা পাওয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, চীন এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোতে যন্ত্র এবং ডাই প্রস্তুতকারকের অভাব নেই, যা শিল্পায়নের জন্য জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে এগুলো নেই বললেই চলে। প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশ এখনও মূলত দেশীয় বাজারের জন্য কম খরচের উৎপাদনে আটকা পড়ে আছে। দক্ষ কর্মীর অভাবের পাশাপাশি দেশে মেধাবীদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এর একটি কারণ হলো বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা মূলত সিনিওরিটিভিত্তিক। ফলে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী করা, এমনকি শিক্ষক নিয়োগের বিষয়েও এমন সব ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেন, যাদের আধুনিক গবেষণা কিংবা চলতি বিষয়সমূহের সাথে কোনো প্রকারের সংযোগ নেই। আর তাদের হাত ধরে অনুগতকর্মী হিসেবে এমন সব জুনিয়র ফ্যাকাল্টি নিয়োগ পেয়ে থাকেন, যাদের বিশেষ কোনো দক্ষতা থাকে না। তারা শিক্ষা সংস্কারের দাবির বিপরীতে মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থা বজায় রাখার দিকে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। উদাহরণস্বরূপ, মহামারি চলাকালীন সময়ে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে জুম অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস পরিচালনা করেছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো তারা কোনো ধরনের স্থায়ী ব্যবস্থার দিকে যায়নি বা এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেনি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় অবস্থান করে ক্লাসটি করতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এই অনলাইন শিক্ষা অভিশাপে পরিণত হয়েছে, যেখানে এটি উন্নত শিক্ষা প্রদানের একটি দুর্দান্ত সুযোগ হওয়া উচিত ছিল।

এমন পশ্চাৎপদতার পরিণতি কিন্তু বহুমাত্রিক। এর ফলে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাবীরা নিজেদের যথাযথভাবে গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে পাশের দেশ ভারতের কানপুরের আইআটির (IIT) মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এমআইটিতে (MIT) ভর্তির সুযোগ পায় এবং গুগলের মতো সংস্থাগুলোতে কাজ পায়, সেখানে বুয়েটের গ্র্যাজুয়েটরা, যারা গণিত অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়েছে, তারা কদাচিৎ এমআইটির মতো প্রতিষ্ঠানের ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। অধিকন্তু, পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের বেশিরভাগই পড়াশোনা বা কাজের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ছেন। এমনকি তুলনামূলক কম মেধাবী ছাত্রদেরও একটি বড় অংশ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমি নিজে ২০২০ সালে আমার ছাত্রদের বিদেশে পড়াশুনার জন্য ৪০টিরও বেশি বিশেষ রিকমেন্ডেশন লিখি। পিছিয়ে থাকা স্নাতকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এখনও বিদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়নি বা ব্যক্তিগত কারণে—যেমন, পারিবারিক বাধ্যবাধকতা বা ধর্মীয় কারণে—তারা দেশে রয়ে গেছে। দুভর্গ্যবশত বাংলাদেশে আমার খুব কম শিক্ষার্থীর সাথেই দেখা হয়েছে, যারা দেশকে গড়ার জন্য দেশে থাকতে চায়। তবে দেশে সচেতনভাবে তারাই থাকতে পছন্দ করে, যাদের বিশেষ দক্ষতা আছে এবং যা দিয়ে তারা বাংলাদেশেই লাভজনক ক্যারিয়ার গড়তে সক্ষম।

বাংলাদেশে খুব কম স্টার্টআপই রয়েছে যারা ঝুঁকিপূর্ণ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো সাধারণত অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মেশিন লার্নিং, এআই, রোবোটিক্স বা ব্লক চেইন নিয়ে কাজ করছে না। এমনকি খুব কম কোম্পানিই আছে যারা আর্থিকখাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করছে। এর পরিবর্তে অনেক কোম্পানি আছে, যারা ডিজিটাল মার্কেটিং এবং আউটসোর্সিংয়ের মতো অধিক প্রতিযোগিতামূলক খাতে প্রবেশ করছে।

তবুও একটি শিক্ষিত তরুণ মানে একটি সমৃদ্ধ সেবাখাত। বিপুলসংখ্যক বিবিএ গ্র্যাজুয়েট সকল সেবাখাতে কাজ করছে। এসব তরুণদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, কাগজপত্র নথিভুক্ত করার ক্ষমতা এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যদিও এসব চাকরি তরুণদের জন্য কাঙ্ক্ষিত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো শিক্ষা তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি। তাই এটা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয় যে, শিক্ষিত তরুণরা পাসের পরপরই বিসিএস পরীক্ষার জন্য নেমে পড়ছে। এর মূল কারণ হলো মানসম্পন্ন চাকরি প্রদানে অক্ষমতা এবং শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। ফলে অনেক শিক্ষিত তরুণই বর্তমানে বেকার।

বর্তমানে জীবিকা অর্জনের সহজলভ্য পথ ছেড়ে অনেক তরুণ অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে প্রবেশ করছে এবং নিম্নস্তরের বা ‘অড জবে’ নিয়োজিত হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক মাস্তানি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র অপরাধে জড়াচ্ছে। এসব কাজে নিয়োজিতদের কোনো হিসাব নেই। তবে, ধারণা করা যায় যে, এ সংখ্যা কম নয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় আমার বাড়িতে যারা হামলা করেছিলো তারা সবাই ছিল বয়সে তরুণ। এই ধরনের আচরণ মেধাবীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মৃত্যু তার প্রমাণ।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী? করোনাভাইরাসের অতিমারি সত্ত্বেও বিদেশে অভিবাসন অব্যাহত রয়েছে। তবে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি না হলে, নতুন ধরনের উদ্ভাবনী শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে না এবং মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টিও হবে না। কারিগরি শিক্ষার সংস্কার নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং অনেক উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সরকার প্রায় ১৬ লাখের বেশি তরুণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তবে সেই পরিকল্পনাগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও ফলদায়ক কি না, তা দেখার বিষয়। উচ্চশিক্ষার আমূল সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশ এভাবেই চলতে থাকবে, যেখানে বিপুল সংখ্যক তরুণ পড়তে ও লিখতে পারে এবং মৌলিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু মানসম্পন্ন চাকরি পাওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি থেকে যায়, যার ফলে তারা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করতে পারে না। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে একশ্রেণির শিক্ষিত তরুণদের আবির্ভাব ঘটবে যারা নিজেদের ভালো কর্মসংস্থানের যোগ্য বলে মনে করবে এবং কেউ কেউ তা পাওয়ার জন্য চরম পদক্ষেপও নিতে পারে। সংঘবদ্ধ সহিংসতা, সন্ত্রাস, ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অপরাধ এবং রাজনৈতিক মাস্তানি বিশ্বের সেসব জায়গায় ঘটেছে যেখানে চরমভাবে ক্ষুব্ধ তরুণ রয়েছে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যুবসমাজকে ব্যস্ত রাখতে এবং তাদের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা জাগ্রত করা না গেলে বাংলাদেশেও একই ঘটনা ঘটার ঝুঁকি রয়েছে। যেসব তরুণরা বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হওয়ার এবং যারা দেশকে নতুন অর্থনৈতিক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কথা, তারাই দেশের জন্য বড় বোঝা হয়ে যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে দেশকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে পারে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ অদক্ষ তরুণদের ওপর ভর করে পোশাক কারখানা পরিচালনা করছে এবং আয়ের উৎস সৃষ্টি করছে। এর পাশাপাশি তরুণ ও কম ধনীদের নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাশ্রমের ওপরও নির্ভর করেছে। অন্যান্য দেশের জন্য এমন উন্নতির পথে থাকা যথেষ্ট হলেও বাংলাদেশের জন্য তা যথেষ্ট নয়, কারণ আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। বাংলাদেশ পরিবেশগত বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অনন্যভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত ঝুঁকির হুমকি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে জরুরিভিত্তিক পদক্ষেপ না নিলে ৭০ বছর পর বাংলাদেশ নাও টিকে থাকতে পারে।

বাংলাদেশ অতীতে চরম প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে স্বেচ্ছাশ্রম ও অদৃশ্য শক্তিকে পুঁজি করেছে। ভবিষ্যতে অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে এমনই এক অদম্য চেতনার প্রয়োজন হবে, যা অত্যন্ত দক্ষ জনশক্তির সাথে যুক্ত। এটি ঘটবে কি না তা নির্ভর করবে দেশের দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠা এবং প্রতিভা বিকাশের কতটুকু সুযোগ আছে, তার ওপর।

মাহবুব মজুমদার, ডিন, স্কুল অব ডাটা সায়েন্স, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : সংবিধান

এম. এ মতিন

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হচ্ছে, "আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ হতে হিসাব করলে ২০২১ সালের মার্চ মাসে আমাদের সংবিধানের ৫০ বৎসর পূর্তি হয়ে গেছে। তাই বিলম্বে হলেও আমরা যে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি সেটা নিতান্তই শ্লাঘার বিষয়। আমাদের সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম সংবিধান। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ইতোমধ্যে আমরা ১৭ বার সংশোধনীর নামে মূল সংবিধানের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছি।

আমাদের সংবিধান বুঝতে হলে তার পটভূমি বিবেচনায় আনতে হবে। ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবে, ভারতের দুই প্রান্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দু'টো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তটি ছিল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানেরা মুসলিম লীগকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার ফলে লাহোর প্রস্তাব কার্যকর করাই ছিল ভারতের মুসলমানদের কর্তব্য। কিন্তু অবাক করার মতো ঘটনা ঘটল। ১৯৪৬ সালে লাহোর প্রস্তাবকে অবজ্ঞা করে দিল্লিতে মুসলিম লীগ কনভেনশন দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়ে একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি করার বিধান করল। প্রয়াত আবুল হাসেম সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি করলেন যে, লাহোর প্রস্তাবের 'States' সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রস্তাব, কনভেনশন দ্বারা এটিকে 'State'- এ রূপান্তর করা যাবে না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, "S টা হচ্ছে টাইপিং মিসটেক"। লিয়াকত আলী সাহেব মূল প্রস্তাবের নথি দেখিয়ে বললেন, মূলে আসলেই S রয়েছে; অর্থাৎ দুইটি 'States'এর কথা ছিল। বিব্রত জিন্নাহ সাহেবের তখন কোনো উত্তর ছিল না। গণপরিষদে বিষয়টি দেখা হবে বলে বাংলার দাবি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হলো। একটি রাষ্ট্র হলো বটে; কিন্তু সেখানে দীর্ঘ ৯ বৎসরের মধ্যেও কোনো সংবিধান রচিত হলো না, নির্বাচন হলো না। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। স্পিকার তমিজ উদ্দিন খান সাহেব সিন্ধু চীফ কোর্টে রিট মামলা করলেন। আদালত গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়াকে অবৈধ ঘোষণা করলেন। ফেডারেল কোর্টে আপিল করা হলো। প্রধান বিচারপতি মুনীর, গোলাম মুহাম্মদ ও ইস্কান্দার মির্জার আঁতাতের ফলে সিন্ধু কোর্টের রায় বাতিল হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালে গণপরিষদ একটি শাসনতন্ত্র রচনা করল। নির্বাচন যখন হতে যাচ্ছিল তখনই ইস্কান্দার মির্জা আইয়ুব খানের সহযোগিতায় সামরিক শাসন জারি করলেন। মুহাম্মদ মুনীর ক্যালসনের তত্ত্ব প্রয়োগ করে বললেন, এটি একটি সফল বিপ্লব; তাই বৈধ। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান একটি তথাকথিত শাসনতন্ত্র দিলেন। ইয়াহিয়া খান এসে তা বাতিল করলেন। তারই দেওয়া লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে নির্বাচন হলো। বাঙ্গালি এক বাক্যে ৬ দফার পক্ষে ভোট দিল। ক্ষমতালোভী ভুট্টো সাহেব সে রায় অগ্রাহ্য করে সামরিক বাহিনীর সাথে হাত মিলালেন। বাংলা গর্জে উঠল। ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাক-বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে বাংলা স্বাধীন হলো। আমরা এক বৎসরের মধ্যে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিলাম। প্রয়াত আবুল মনসুর আহমদ বললেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাহোর প্রস্তাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়।"

প্রয়াত ড. আনিসুজ্জামান জানাচ্ছেন, "আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। ড. কামাল হোসেন খবর দিলেন, তিনি সংবিধানের খসড়া তৈরি করবেন ইংরেজিতে, আমাকে তার বাংলা করে দিতে হবে, শেষ পর্যন্ত বাংলাটাই গৃহিত হবে প্রামাণ্য ভাষা বলে। বললাম, একা পারব না একটা দল চাই। তিনি বললেন,আপনি লোক বেছে নিন।" নেওয়ামাল বাসির এবং এ কে এম শামসুদ্দীনকে নেওয়া হলো। এ তিন জন মিলে ইংরেজি ভাষ্যের বাংলা তর্জমা করলেন। এর সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। প্রয়াত আবুল মনসুর আহমদ ১৯৭২ সালের ২০ অক্টোবর *ইত্তেফাকে* লিখলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'সংবিধানের বাংলা মুসাবিদায় পরিভাষার উৎপাত'। আমরা কন্সটিটিউশনের বাংলা 'সংবিধান' মেনে নিয়েছি।

৭ অনুচ্ছেদে আমরা বলছি, "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

সপ্তম অনুচ্ছেদের পেছনের ইতিহাস দীর্ঘ। আইন এবং উচ্চতর আইন বা ন্যাচারাল আইনের ধারণা পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এন্টিগণ নামক সফোক্লিসের লিখিত ক্ল্যাসিক ড্রামায়। গ্রিসের থিবিস নামক নগর রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন ক্রিয়ন। ইদিপাসের

দুই ছেলের মধ্যে একজন ক্রিয়নের পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত হলে রাষ্ট্রীয় সম্মানে তার শেষকৃত্য পালিত হয়। অন্য পুত্র পাশের দেশে আশ্রয় নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে ক্রিয়নকে ক্ষমতাচ্যুত করার যুদ্ধে নিহত হন। এবার ক্রিয়ন ফরমান জারি করলেন যে, ইদিপাসের এই মৃত পুত্রকে কবর দেওয়া যাবে না। দিলে তা হবে রাষ্ট্রদ্রোহ। ইদিপাসের কন্যা এন্টিগণ রাতের অন্ধকারে ভাইয়ের শেষকৃত্য পালন করল। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করে এন্টিগণ দাবি করল, "আমি একটি উচ্চতর আইনের বিধান পালন করেছি মাত্র। আপনার সরকারি আইনে এটা যদি অপরাধ হয় আমার কিছুই করার নেই। আমি উচ্চতর আইনকে মানতে বাধ্য, যার বিধান হচ্ছে মৃতকে সম্মানের সাথে কবর দিতে হবে।"

খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর হামুরাবির জারি করা আইনকোষ সংবিধান নয়। ড্রাকো কর্তৃক ঘোষিত আইন যথার্থ অর্থে সংবিধান নয়; বরং কালো কানুন। ব্যক্তিক্রম হচ্ছে The code of Solon (৫৬০ খ্রিষ্টপূর্ব)। এথেন্সবাসীরা ড্রাকোনিয়ান আইন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আইনবেত্তা সলোনকে একটা উত্তম আইন-কোষ উপহার দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে তিনি রাজি হলেন এই শর্তে যে, তার রচিত আইনকোষ তাদের জাতীয় এ্যাকলেশিয়ায় (ekkelesia) পেশ করতে হবে, সেখানে আইনের ওপর আলোচনা হওয়ার পর এথেন্সবাসীরা যদি এটাকে অনুমোদন করে; তবেই এটা জাতীয় আইনকোষ হিসেবে প্রচলিত হবে। আধুনিক সাংবিধানিক সংজ্ঞায় এটাই ছিল সংবিধান। ১৭৮৭ সালের পূর্বে সোলনের এ সাংবিধানিক ব্যাখ্যা গৃহীত হয়নি। রোমানদের কমান্ড থিওরি জায়গা দখল করে রেখেছিল। আমেরিকানরা সংবিধানের যথার্থ অর্থ খুঁজে পেল। অর্থাৎ জনগণ নিজেদের জন্যে হয় নিজে অথবা তাদের মনোনীত আইনবেত্তাদের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে সরকারের অবকাঠামো এমনভাবে তৈরি করবে যেন প্রত্যেকটি অঙ্গ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। সরকার হবে সংবিধান সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান; যা সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের অন্যতম স্থপতি বিচারপতি আলবি সেচ (Albie Sachs)-এর মতে, "সংবিধান হচ্ছে একটি জাতির আত্মজীবনী।" কেউ কেউ বলছেন, "বাংলাদেশের সংবিধান বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞান।"

অষ্টম সংশোধনী মামলায় আমাদের আপিল বিভাগ সপ্তম অনুচ্ছেদকে The Pole Star নামে অভিহিত করেছেন। যতদিন এ অনুচ্ছেদ অবিকৃত থাকবে; ততদিন জাতির দিক নির্দেশনার অভাব হবে না। ইতোমধ্যে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং ষোড়শ সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে আমাদের সর্বোচ্চ আদালত আমাদের সংবিধানকে সমুন্নত রেখেছে। অসাংবিধানিক সামরিক শাসন এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠা সকল সামরিক আইন বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে আইনের গোরস্থানে পাঠানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১১ তে আমরা বলেছি, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" আমরা যখন রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলেছি অর্থাৎ রিপাবলিক বলেছি, এই একটিমাত্র কথার মধ্যে গণতন্ত্র, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারের সকল স্তরকে পরিচালিত করার অঙ্গীকার করেছি। আজ এই নির্বাচন নির্বাসনে। ত্রয়োদশ সংশোধনীকে এক কলমের খোঁচায় নির্বাসিত করেছি। অথচ আমাদের সংবিধানে ১৪২ অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনো বিধান যুগোপযোগী না হলে তাকে উন্নতর বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়; কিন্তু তাকে সমূলে উৎপাটিত করা যায় না। অষ্টম সংশোধনী মামলায় ১৪২-এর এই হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা। সেই মামলার রায়ে বলা হয়েছিল, সংবিধানের প্রস্তাবনা একটি বেসিক স্ট্রাকচার, এর কোনো সংশোধন করা যাবে না। অথচ আমরা তাই করেছি। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগকে আমরা তৃতীয় ভাগের মাথার উপর রেখেছি। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে সংবিধানের Blue print এবং সংবিধানের ছাতা। এর বাইরে যাওয়া যাবে না।

আমাদের সংবিধানে প্রথম সংশোধনীটি মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার আইনি ক্ষমতা সৃষ্টি করার মানসে আনীত। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা পাক বাহিনীর সহায়তায় খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত ছিল তাদের বেলায় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়; তার জন্যে শাসনতন্ত্রে ৪৭(ক) ধারাটি যুক্ত করা হয়। যে আইনগুলো তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না; তা হলো সংবিধানের ৩১, ৩৫(১), (৩) এবং ৪৪। মনে রাখা ভালো, এই সংশোধনীর বলেই The International Criminal (Tribunal) Act নামক আইনটি পাস হয়েছিল। তবে ১৯৫ জন পাক বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের একজনকেও আমরা বিচারের আওতায় আনতে পারিনি।

দ্বিতীয় সংশোধনীটি আনা হয়েছিল যাতে করে Preventive Detension এবং ইমার্জেন্সি আইনের বিধান করা যায়। সংবিধান রচয়িতারা ১৯৩৫ সালের গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন বলে জেনেশুনে তেমন কোনো বিধান সংবিধানে রাখেননি। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের ১৯৬৫ সালের ঘোষিত জরুরি অবস্থা ১৯৬৯ পর্যন্ত অর্থাৎ তার বিদায়কাল

পর্যন্ত বলবৎ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার বিরোধী সকল আওয়াজ স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তাই আদি সংবিধানে ইমার্জেন্সির কোনো বিধান রাখা হয়নি। দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা তাই করা হলো। অচিরেই স্পেশাল পাওয়ারস এ্যাক্ট (বিশেষ ক্ষমতা আইন) নামক কালো-কানুন প্রবর্তন করা হয়, যা আজও বাতিল হয়নি। যদিও সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন নজির এ আইনের দাঁত-নখ ভোতা করে দিয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে আদি আইনে IXA যোগ করা হলো। অনুচ্ছেদ ৩৩-এর পরিবর্তে Preventive Detention আইন সংযোজিত হলো। অনুচ্ছেদে ২৬ কে অকেজো করার জন্য ২৬(৩) দ্বারা জরুরি অবস্থা জারি করা জায়েজ করা হলো। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে যা এক হাত দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই আবার অন্য হাত দিয়ে কেড়ে নেওয়া হলো (Evolution of Bangladesh Supreme Court; Badrul Haider Chowdhury, Dhaka University, 1990, p. 79)।

তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বেরুবাড়ি সম্পর্কিত চুক্তি সংসদের অনুসমর্থন ব্যতীত বৈধ নয় বলে রায় দেওয়ার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ দুই প্রধানমন্ত্রী কোনো ভাবেই দেশের সংসদের অনুমোদন ব্যতীত দেশের এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়ে দিতে পারেন না বা হস্তান্তর করতে পারেন না।

মাত্র তিন বৎসরের মাথায় আওয়ামী লীগ সরকার চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের সকল মৌলিক অর্জনকে বিসর্জন দিল। ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। মৌলিক অধিকার স্থগিত হলো। এক দলীয় শাসনব্যবস্থা জারি হলো। চতুর্থ সংশোধনী মাত্র আধাঘন্টার মধ্যে পাস হয়ে গেল। কোনো আলোচনা বা বিতর্কের সুযোগ দেওয়া হলো না। একটি সাংবিধানিক একনায়কত্ব কায়েম হলো। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক শাসনকে মুছে ফেলা হলো। তথাকথিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু হলো। হাইকোর্ট ডিভিশনের রিট পাওয়ার কেড়ে নেওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্টসহ পুরো বিচার বিভাগকে প্রেসিডেন্টের অধীনে নেওয়া হলো। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের পথ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হলো। সংসদকে ক্ষমতাবিহীন রাবার স্টাম্প করা হলো। মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করার কোনো এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের থাকল না। স্থানীয় সরকারের ধারণাটাই বাতিল করে দেওয়া হলো। গণমাধ্যমের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো। মাত্র তিনটি পত্রিকা রেখে সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলো। অর্থাৎ সকল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু হলো।

এমনই একটি অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে তার পরিবারসহ নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন জারি হলো। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলেন। প্রথম সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী আনা হলো। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন বাতিল হয়ে গেল। বিচার বিভাগ অনেকটা ক্ষমতা ফিরে পেল। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট করার অধিকার এবং আদালতের বিচারিক রায় পর্যালোচনার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৪৪ এবং ১০২ পুনর্জীবিত করা হলো। সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সৃষ্টি করা হলো। প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়ার অনুচ্ছেদ ৮০ থেকে বাতিল এবং রেফারেন্ডামের প্রভিশন সংবিধানে সংযোজিত হলো। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংবিধানে যোগ করা হলো। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে সেখানে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস কথাটি স্থাপিত হলো। পঞ্চম সংশোধনী মামলায় পুরো সংশোধনীটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে ভালো কাজগুলো কনডোন (Condone) করে দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার সাহেবকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঘোষিত সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়। ইতোমধ্যেই সংশোধনীটি বাতিল করা হয়েছে। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশনকে প্রায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। অষ্টম সংশোধনী মামলায় আমাদের আপিল বিভাগ তা বাতিল ঘোষণা করে। মৃতপ্রায় সুপ্রিম কোর্ট নতুন জীবন লাভ করে। নবম সংশোধনীর মাধ্যমে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট একই সময়ে হওয়ার বিধান দেওয়া হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা ফেরত আসায় নবম সংশোধনীটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে নারীদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এরশাদ শাসনের অবসান ও শাহাবুদ্দিন সাহেবকে অস্থায়ী সরকারের প্রধান করার ব্যবস্থা করা হয়।

ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অভিশংসনের বিধান দ্বারা সংসদকে ক্ষমতায়িত করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে এ সংশোধনীটি বাতিল করে দিয়ে বিচারপতিদের তথা সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দিয়ে সে ক্ষমতা আবার সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে ফেরত দিয়েছেন। এটি একটি বড় অর্জন। তবে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে

প্রধান বিচারপতিকে নির্বাসন দেওয়া হলো; তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সপ্তদশ সংশোধনীটি সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কিত। মোটামুটি একটি গতানুগতিক সংশোধনী।

আমাদের সংবিধান ৫০ বৎসরের মাথায় ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে; কিন্তু আমরা একটি যথাযথ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারিনি। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের অনেকগুলো অনুচ্ছেদকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। কিছু বিধান দ্বারা একটি সজীব সংবিধানকে নির্জীব করে দেওয়া হয়েছে। একটি সংসদ আগামী দিনের সকল সংসদকে সংবিধান সংশোধনীর ব্যাপারে ক্ষমতাহীন করা পৃথিবীর কোনো সাংবিধানিক আইন দ্বারা সমর্থিত নয়। যে শিশু আজও জন্মায়নি তার অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার বর্তমান জীবিতদের কোথায়? কিন্তু তাই করা হয়েছে।

সংবিধানের দুইটি অংশ। একটি লিখিত, অন্যটি অলিখিত। দু'টো মিলেই সম্পূর্ণ সংবিধান। অলিখিত অংশকে দুইভাবে দেখা যাবে। একটি হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে এবং অন্যটি হচ্ছে ব্যাপক অর্থে। প্রথম অর্থে আসবে লাহোর প্রস্তাব, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন রায়, ইতিহাস ইত্যাদি। যেমন, অনুচ্ছেদ ৭০ বা ৩৮ বুঝতে হলে তার ইতিহাস জানতে হবে। আনিসুজ্জামান লিখছেন, "সংবিধানের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় কামাল হোসেনকে অনেক কিছু বলেছিলেন। তবে দুবার তাঁর ডাকে কামাল যখন যান, সঙ্গে আমিও ছিলাম। প্রথমবার তাঁর বক্তব্য ছিল রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ছিন্ন করার একটা বিধান থাকতে হবে সংবিধানে। ১২ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে কিছুটা বলা হয়েছিল, তবে বঙ্গবন্ধু যা চেয়েছিলেন, তা সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্ত অংশে রূপ পেয়েছিল। দ্বিতীয়বার তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান আমলে সরকার অস্থিতিশীল হয়েছিল মূলত পরিষদ সদস্যদের দলবদলের ফলে কিংবা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করে দলের বিপক্ষে ভোটদানের ফলে। এটা বন্ধ করা প্রয়োজন। নির্বাচিত সদস্য যদি দলের কোনো সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হন কিংবা কোনো ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার পদত্যাগ করা উচিত হবে কিংবা তার সদস্যপদ চলে যাবে–এমন একটা বিধান করা দরকার। তবে এমন ক্ষেত্রে তিনি উপনির্বাচনে বা পরবর্তী কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন না, সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই অভিপ্রায়ই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রকাশ পেয়েছিল" (বাংলাদেশের সংবিধান: নানা প্রসঙ্গ; আহমেদ জাভেদ সম্পাদিত)। অথবা ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর, "এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম" কথাটি সংবিধানের প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ব্যাপক অর্থে আইন জগতে যেখানে যত অর্জন হয়েছে তাকে সংবিধানের অলিখিত অংশ হিসেবে ধরতে হবে। যেমন, খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অর্থাৎ কোড অব হামুরাবি, সলন, প্লেটো, সিসারো, কৌক, ব্ল্যাকস্টোন এমনকি রাজকো পাউন্ডের তৈরি করা আইনের নির্যাসগুলো বিবেচনা করতে হবে। যেমন, কোনো লোককে না শুনে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। একই লোক বাদী, জুরি এবং বিচারক হতে পারবে না। আমাদের শাসনতন্ত্রে বেসিক স্ট্রাকচার ভঙ্গ করা যাবে না। উচ্চতর আদালতে কেইস এবং কন্ট্রোভার্সি না থাকলে জজ সাহেবরা কোনো বিষয়ে নিজ থেকে বিচারে বসবেন না। যে সব বিষয়ে বিচারকের স্বার্থ নিহিত সে বিষয়ে বিচারক নিজেকে সরিয়ে রাখবেন। আমরা একটি রিপাবলিকে বসবাস করি। অর্থাৎ আমরা মেনে নিয়েছি সকল অর্পিত ক্ষমতা হচ্ছে আমানত এবং সকল জবর দখল করা ক্ষমতা হচ্ছে স্বৈরাচার (All delegated power is trust, and all assumed power is usurpation)। Republic এর অর্থ হচ্ছে-এর নাগরিকরা জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং স্বাধীন থাকবে। তাদের জন্মগত অধিকারগুলি সমন্ধে তারা স্বাধীন এবং সমান। তারা একটি সরকার গঠন করবে এই জন্য যে, তাদের জন্মগত এবং মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা হবে। এই অধিকারগুলোর মধ্য অন্যতম থাকবে স্বাধীনতা, সম্পদ এবং নিরাপত্তার সংরক্ষণ ও সকল জুলুমের অবসান। এখানে কোনো রাজা থাকবে না; থাকবে না কোনো প্রজা। বিশেষ অর্থে সবাই রাজা। উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ শাসক হবে না। পরিবারতন্ত্র, ব্যক্তিপূজা ইত্যাদি চিরদিনের জন্য নির্বাসিত। আমাদের সংবিধানে ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদ জিন্দা থাকলে আমাদের অন্য কোনো আইনের প্রয়োজন নেই। আমরা মেনে নিয়েছি, সুশাসন মানেই স্ব-শাসন।
আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যে সমস্ত অধিকারের কথা বলা হয়েছে–এগুলোই শুধু আমাদের মৌলিক অধিকার নয়। এগুলো ছাড়াও আমাদের রয়েছে অলিখিত অধিকার, যে সব অগণন।

সময়ের চ্যালেঞ্জ

১. ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিন-তিনটি সফল নির্বাচন তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার পরও হাইকোর্টে রিট আবেদনের মাধ্যমে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। মামলাটি হাইকোর্টে খারিজ হওয়ার পর আপিল বিভাগে জনৈক আব্দুল মান্নান খান বনাম বাংলাদেশ মামলায় দীর্ঘ শুনানি হয়। ৮ জন এমিকাস কিউরির মধ্যে ৭ জনই হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করেন অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনী বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। এদের মধ্যে ছিলেন, বিচারপতি টি এইচ খান, ড. কামাল হোসেন, এম আমিরুল ইসলাম, মাহমুদুল ইসলামসহ দেশের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীগণ। শুধু আজমালুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে মত

দেন। একটি বিভক্ত রায় দেওয়া হলো। মেজরিটি জাজমেন্ট লিখলেন তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হক। মাইনরিটি রায় লিখলেন বিচারপতি এম এ ওহাব। অর্থাৎ ৪-৩ ভোটে আপিলটি গৃহিত হলো। একটি শর্ট অর্ডার দেওয়া হলো। 13th Amendment Judgement নামক গ্রন্থে (Md. Abdul Halim, Barrister at- Law, Advocate Supreme Court) রায়গুলো তুলে ধরার পর একটি মূল্যবান কমেন্টটারির মাধ্যমে মেজরিটি জাজমেন্টের অগ্রহণযোগ্যতার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং মাইনরিটি জাজমেন্টটিকে সমর্থন করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের কল্যাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শর্ট অর্ডারে ১০ম এবং ১১তম সংসদীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার বিধান রাখা হয়েছিল। ১৬ মাস পরে যখন মূল রায়টি লেখা হলো তাতে পয়েন্ট নাম্বার-৩ পুরোপুরি অনুপস্থিত। শর্ট অর্ডারের পরে পরেই এবং মূল রায় বের হওয়ার আগেই সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি বাতিল করা হলো। রায় বের হওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় প্রয়াত বিচারপতি টি এইচ খান সাহেব বলেন, "বিচারপতি খায়রুল হকের অবসরে যাওয়ার পর এবং শর্ট অর্ডারের ১৬ মাস পর এই রায় দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না; তাই অবৈধ।" প্রয়াত প্রধান বিচারপতি মাহামুদুল আমিন চৌধুরী বলেন, "শর্ট অর্ডারকে এভাবে পরিবর্তন করা একটি ফৌজদারী অপরাধ।" বাংলাদেশের অবিসংবাদিত আইন দার্শনিক মাহমুদুল ইসলাম তাঁর Constitution of Bangladesh, 3rd Edition- পৃষ্ঠা ৫৪৬-৫৫২ তে ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় তাঁর লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, "ত্রয়োদশ সংশোধনী কোন ক্রমেই সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার ধ্বংস করে না।" উক্ত গ্রন্থের প্যারা ৫.১৬৯ A এবং ১৬৯ C তে শর্ট অর্ডারের অগ্রহণযোগ্যতা সমন্ধে তিনি তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আব্দুল হালিম তাঁর কমেন্টটারিতে একই কথা বলছেন, তাঁর বক্তব্যে শর্ট অর্ডার এবং ফাইনাল অর্ডারের পরস্পর বিরোধিতা, মেজরিটি এমিকাস কিউরিদের মতামত অগ্রাহ্য করা, একটি রাজনৈতিক বিষয়কে আইনি বিষয় হিসেবে বিচার করা ইত্যাদি তুলে ধরার পর, তিনি বলেছেন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের যে সমস্ত রায় রেফার করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই বাদীর কোনো না কোনো মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ ছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় বাদী কোথাও বলেননি যে, ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা তার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। উক্ত গ্রন্থকার মেজরিটি জাজমেন্টের একটি ভয়ানক স্খলন তুলে ধরেছেন, যেখানে প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক কোনো ইস্যু না থাকলেও ফোর্থ সিডিউল ১৯৭২-এর সংবিধান যে সমস্ত বিধানকে সুরক্ষা দিয়েছে; তার বাইরে কোনো কিছুকে সুরক্ষা দিতে পারবে না বলে বিধান দিয়েছেন। একইভাবে ইস্যুবিহীন বিষয়ে নিজেই ইস্যু তৈরি করে কোনো শুনানি ছাড়া নিজেই বিধান দিয়েছেন; যা সকল সাংবিধানিক আইনে অবৈধ। এ বিষয়টি জাজেস কেইসে চূড়ান্তভাবে স্থিরিকৃত হওয়ার পরও তিনি একই ভুল করলেন।

ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়ের ফলে সৃষ্ট জাতীয় সংকট দূর করার জন্য প্রয়োজন উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করা। আমার মতে উক্ত রায় অনেক সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে, যার সংশোধন প্রয়োজন। অনেক সময় মাইনোরিটি জাজমেন্টই দেশের আইন হয়েছে। যেমন, আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টে প্লাসি বনাম ফার্গুসন মামলায় একমাত্র জাজ বিচারপতি জন মার্শাল হার্লন ডিসেটিং জাজমেন্ট দিয়ে বলেছিলেন, Our constitution is colorblind and neither knows nor tolerates classes among citizens." তার এই উক্তিটি ব্রাউন বনাম বোর্ড অব এডুকেশন মামলায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হলো। Separate but equal নামক বিধানটি চিরতরে মুছে ফেলা হলো। মাইনরিটি জাজমেন্ট বহু দেশে পরবর্তীতে মেজরিটি জাজমেন্ট হয়েছে। আমার বিশ্বাস ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার মাইনরিটি জাজমেন্ট আবার মেজরিটি জাজমেন্ট হবে।

২. বর্তমান ব্যবস্থায় অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) রাষ্ট্রপতিকে নিধিরাম সর্দার করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রাজকীয় সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে একটি ভারসাম্যহীন শাসনব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে। সুশাসনের জন্যে এর সংশোধন প্রয়োজন।

৩. আদালতের রায়ের পরও অনুচ্ছেদ ২২-এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে বিচার বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগকে এখনও আলাদা করা হয়নি। এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪. বিরাজমান সামাজিক ব্যবস্থায় আমাদের সংসদের একটি উচ্চ কক্ষ বা আপারহাউস প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের সংসদকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে রূপান্তর করতে হবে।

৫. পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনাগত জনগণের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রহিতকরণ সংক্রান্ত বিধানাবলি পুনর্বিবেচনা করে বাতিল করতে হবে।

এম. এ মতিন, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশে : নগরায়ণ

আকতার মাহমুদ

সূচনা

জনবসতির প্রচলিত ধারায় নগরায়ণ একটি অনিবার্য ঘটনা প্রবাহ। ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিকভাবে মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরেই নগরগুলোর বিকাশ শুরু হলেও উন্নত জীবনযাত্রার উপাদান, জ্ঞানচর্চা, স্বাস্থ্যসেবা, নাগরিক পরিষেবা, নগর পরিচলন ইত্যাদিও সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়েছে এইসকল ভৌগলিক পরিসরে। তবে নগর পরিচলন ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেখানেই দুর্বলতা ছিল সেইসকল নগরে বসবাস স্বাচ্ছন্দ্যের হয়নি। নগরের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত অসংখ্য নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল, যা একটি জটিল প্রক্রিয়া। নগরের জনসংখ্যা, ঘনত্ব, পরিবেশ, পরিবহণ ব্যবস্থা, আবাসন, কাজের সুযোগ, পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধাসমূহ ইত্যাদি বিষয়গুলো এক অন্যের সাথে পরিপূরকভাবে সম্পর্কযুক্ত, যে কোনোটির অপর্যাপ্ততা নগরে বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ করে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ মূলত গ্রামভিত্তিক থাকলেও, স্বাধীনতার পর থেকে হঠাৎ করে কাজের সন্ধানে ও গ্রামের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মানুষ শহরমুখী হতে শুরু করে। ১৯৭৪ সালের জরিপে নগর জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ হলেও গত অর্ধ শতকে এই সংখ্যা বেড়েছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। বর্তমানে প্রায় ৩৯.৪০ শতাংশ মানুষ দেশের নগর এলাকায় বসবাস করে। দেশের আয়তনের তুলনায় মাত্র ৭ শতাংশ এলাকায় এই নগরগুলো বিস্তৃত হলেও বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রধান চালিকা শক্তি। দেশের বার্ষিক উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ আসে নগরগুলো থেকে। দেশের আয় ক্রমেই অকৃষিজ ও সেবাখাতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই সমগ্র দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন জরুরি।

নগর ও গ্রামীণ এলাকার পরিবর্তন

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার ভৌত অবকাঠামো, বাড়িঘরসহ সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ ল্যান্ডস্কোপ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সময়ে মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বেড়েছে। একইসাথে বড় শহর কিংবা পৌর এলাকার বাইরেও গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, উপজেলা সদর ইত্যাদি এলাকা যত্রতত্র নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পাকা বাড়িঘর-অবকাঠামো গড়ে উঠছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর ও বসতি এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেখানে সেখানে শিল্প কলকারখানা স্থাপন অথবা রাস্তাঘাট নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণিগত পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে বছরে বছরে মূল্যবান কৃষি ভূমি, জলাশয়, বনভূমি, পাহাড়সহ প্রাকৃতিক সংবেদনশীল এলাকা হারাচ্ছে। কোথাও কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, গ্রামীণ এলাকায় মানুষের পেশার ধরনে পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ভূমির হাতবদল হচ্ছে এবং সাথে সাথে প্রকল্প নির্ভর ভূমিতে বিনিয়োগ বাড়ছে। কৃষি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমনি কৃষি পণ্য ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রান্তিক কৃষকদের পেশা ও জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। পেশা হিসাবে কৃষিখাত থেকে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ, নির্মাণ ইত্যাদি খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

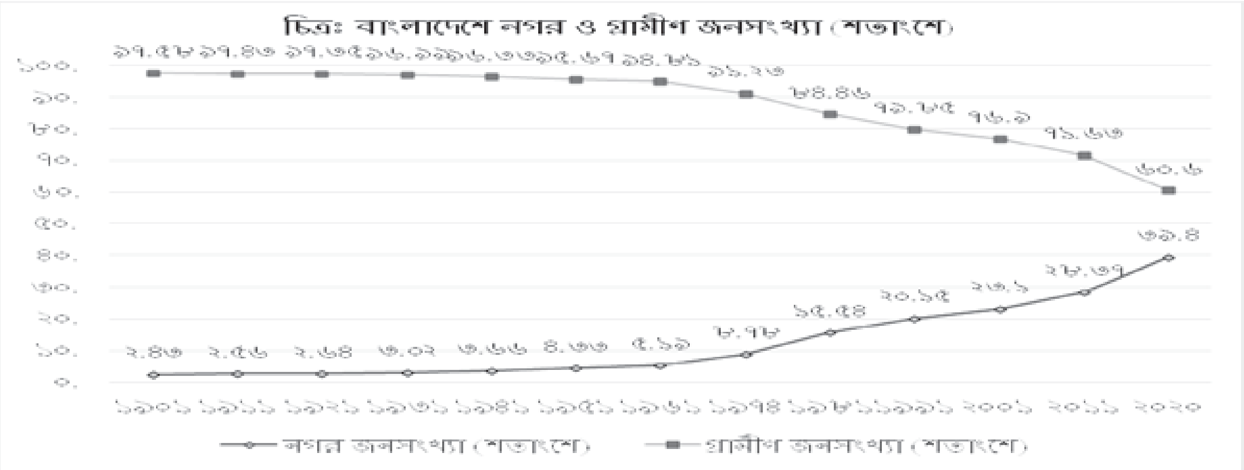

বিবিএস-এর হিসাব মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় এক শতাংশ কৃষি জমি অকৃষিজ খাতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ জনপ্রতি চাষযোগ্য জমির পরিমাণও কমছে। দেশে বর্তমানে জনপ্রতি ভূমির গড় পরিমাণ মাত্র ০.০৬ হেক্টর, যা পৃথিবীর মধ্যে প্রায় ন্যূনতম। এই ধারা আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য হুমকি স্বরূপ। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০১৬" নামে একটি আইন খসড়া করা হয়েছে, যেখানে সারাদেশের কৃষি জমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে গেলেও সারা

দেশব্যাপী একটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রয়োজন হবে। তাই অতিসত্বর কৃষি জমি, নদী-জলাশয়, বনভূমি, পাহাড় সংরক্ষণের স্বার্থে সারাদেশব্যাপী জাতীয় ভৌত/ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই সাথে সাথে প্রয়োজন হবে জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা প্রণয়ন।

সুষম উন্নয়ন ও আঞ্চলিক বৈষম্য

গত পঞ্চাশ বছর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কিংবা বাজেটের সময় উন্নয়ন কৌশল হিসাবে সরকারের তরফ থেকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে সুষম উন্নয়ন করার কথা বলা হলেও আদতে দেশে সুষম উন্নয়ন হয়নি, বরং আঞ্চলিক বৈষম্যই বেড়েছে। এই বৈষম্যের প্রমাণ মেলে, যখন দেখি দেশের মোট নগর জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শুধু ঢাকা মহানগরীতে বসবাস করে।

গত অর্ধশতকে নগর ও গ্রামীণ এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে পরিবর্তন হয়েছে দ্রুত হারে। এই সময়ে গ্রামীণ এলাকার তুলনায় নগর এলাকার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে প্রায় সাড়ে তিনগুণ। অনেক কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগরকেন্দ্রগুলোতে পাড়ি জমিয়েছে। তবে মূল কারণ কাজের সন্ধানে, উন্নত শিক্ষা আর চিকিৎসার জন্য। নগরায়ণের এই ক্রমধারা অব্যহত থাকলে আগামী ২০৪০ এর আগেই বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ নগর এলাকায় বসবাস করবে। এই আলোচনার দুটি দিক আছে।

প্রথমত, শহরমুখী এই জনস্রোতকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের নগরগুলো প্রস্তুত আছে কি না। এর উত্তর আমাদের প্রায় সকলের জানা। দেশের প্রায় সকল নগরের চিত্র একই রকম। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ এলাকা নীরবে শহুরে আদলে রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া চলছে সেখানে মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, কমিউনিটি স্পেস ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঘাটতি বা অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে গ্রামীণ এলাকাও বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় আছে?

সারাদেশে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে তার গৃহীত কৌশলের আলোকে গ্রাম ও শহর এলাকার জন্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরি করা। ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জনে একদিকে যেমন প্রয়োজন হবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি-কর্মসংস্থান সহায়ক অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সহায়ক অবকাঠামো, আত্মনির্ভরশীল কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি; ঠিক তেমনি প্রয়োজন হবে কৃষি জমি, বনভূমি, জলাশয়, নদী সুরক্ষায় বাস্তবসম্মত উন্নয়ন পরিকল্পনা। এই ধরনের টেকসই উন্নয়নে উপজেলাগুলোতে দক্ষ নগর পরিকল্পনাবিদসহ অভিজ্ঞ লোকবলের সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

নগরগুলো কি সেই স্রোতকে স্থান করে দিতে প্রস্তুত ছিল?

সারাবিশ্বের নগরগুলোকে এখন সত্যিকার অর্থে 'ইঞ্জিন অব গ্রোথ' এবং 'ম্যাগনেট অব হোপ' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র আর আশার চুম্বকের টানে মানুষ অব্যহতভাবে গ্রাম থেকে শহরমূখী হয়েছে। শহরগুলোতে বিদ্যমান অসম কাজের সুযোগের কারণে সবচেয়ে বড় চাপ পড়ে বড় শহরগুলোর ওপর। ঢাকা শহরে প্রতিবছর প্রায় পাঁচ লক্ষ নতুন মানুষ যোগ হতে থাকে। ইউরোপিয়ান কিছু বড় শহর ছাড়া বাকী শহরগুলোর কোনটিতে মোট জনসংখ্যা ৫ লক্ষ হবে না।

আমাদের নগর উন্নয়ন সব সময় প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মী ছিলো। কখনোই পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়ন হয়নি। নগরের স্থানীয় সরকার অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভাগুলোতে স্বপ্নবাজ নেতৃত্ব দেখা যায় না। যারা একটা দীর্ঘমেয়াদী স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে। একটি নগরের সম্ভাব্য সমস্যাকে সমাধানের পথ খুঁজে বের করে তার প্রস্তুতি নেয়া এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নগরের উন্নতি করার চিন্তা এখানে কমই করা হয়। ঢাকা শহরের কথাই ধরা যাক। সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানী ঢাকাকে ঘিরে অব্যাহতভাবে কেন্দ্রমুখী উন্নয়ন দর্শন একটি বিরাট সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক

কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান, দক্ষ শ্রমিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, নাগরিক সুবিধা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা গড়ে উঠেছে। ঢাকামুখী মানুষের অভিবাসন দিন দিন বেড়েছে। ফলে ঢাকা শহরের পারিসরিক বৃদ্ধি যেমন ঘটেছে, তেমনি শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েছে অসহনীয়ভাবে। এত অধিকসংখ্যক মানুষের জন্য এ শহরের পরিকল্পনা, উন্নয়ন অথবা সেবাদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো প্রস্তুত ছিল না, আজো নয়। ফলে ঢাকা শহর কখনই সমস্যার আবর্ত থেকে বের হতে পারে না। ইউএন হ্যাবিট্যাটের ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে সাড়ে ৪৪ হাজার মানুষ বাস করে। পৃথিবীর সব মেগাসিটির মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ ঘনত্বের শহর। এখানে অল্প জায়গায় অনেক মানুষ বাস করে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ভারতের মুম্বাই, যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩১ হাজার ৭০০ জন। এছাড়া জনসংখ্যার বিবেচনায় পৃথিবীর আরো বেশকিছু শহর আছে, যেগুলোর সংখ্যা ঢাকার চেয়ে বেশি কিন্তু ঘনত্ব অনেক অনেক কম।

বড় শহরগুলোতে নাগরিক সুবিধার অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থাপনা

ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হলেও দেশের মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ অবদান রাখে–এই কথা যেমন সত্য, তেমনি দুর্বল নগর শাসন ও অপরিকল্পিত উন্নয়নে বাসযোগ্যতার সূচকে ঢাকা বিশ্বে তলানির দিকে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বড় শহরগুলোর অবস্থা প্রায় একই ধরনের। একটি ভালো শহর হতে গেলে যেসব নিয়ামক একটি শহরে থাকে, তার অনেক কিছুই অনুপস্থিত অথবা অপ্রতুল আছে আমাদের এ শহরে। তবে যে বিষয়গুলোর অভাব প্রকটভাবে সবার উপর আসবে, তার মধ্যে আছে পরিবহন ব্যবস্থার দুরবস্থা, জল নিষ্কাশনের দুর্দশা, নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মানসম্মত আবাসনের অভাব, সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানের অভাব, মানসম্পন্ন অবকাঠামোর অভাব, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ অপ্রতুল নাগরিক পরিষেবা ইত্যাদি। শহরে খোলা ময়দান, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান ও সবুজের অভাব মানুষের বিনোদন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ভীষণভাবে ব্যাহত করেছে, যার কারণে শহর তার আকর্ষণ হারিয়েছে। পাড়ামহল্লায় পটের পর পট শুধু উঁচু উঁচু দালানই দেখা যায়, যা একদিকে যেমন এলাকার জনসংখ্যা আর ঘনত্বকে বাড়িয়েছে, তেমনি আবাসিক এলাকাগুলোকে নিরানন্দময় করেছে।

দেশের নগরগুলোর গণপরিসর উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ধরন খেয়াল করলে দেখা যাবে এখানে নগরের প্রায় সকল পরিসরেই ক্ষমতাবান, সক্ষম ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির অভিপ্রায় প্রাধান্য পেয়েছে। এখানকার রাস্তাঘাট, পরিবহণ ব্যবস্থা কিংবা সর্বজনীন স্থানগুলো সক্ষম শক্তিশালী পুরুষের জন্য তৈরি হয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য উপযোগী শহর তৈরি হয়নি। এখানে মালিকানাবিহীন যৌথ-পরিসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দর্শন ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। ফলে আমাদের শহরাঞ্চলে নগরজীবন কখনো আরামদায়ক হয়ে গড়ে উঠেনি।

ভালো একটি গণপরিবহণ ব্যবস্থার অভাব

একটি সুশৃঙ্খল গণপরিবহণের অনুপস্থিতি, ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যানবাহন ও পরিকল্পিত পরিবহন অবকাঠামোর অভাব ঢাকার মানুষের গতিবেগ ঘণ্টায় সাত কিলোমিটারে নামিয়ে দিয়েছে, যা হাঁটার গতিবেগের চেয়ে একটু বেশি। আমাদের পরিকল্পনাগুলো পদচারী ও গণপরিবহন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণীত হলেও বাস্তবে ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে গড়ে ওঠেনি। ঢাকা শহরের অনেক বহুমাত্রীয় সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে পরিবহন ব্যবস্থা চলছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অল্প পরিমাণ রাস্তা, অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ ও তার স্তর বিন্যাস, সুশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, প্রধান সড়কের বেশির ভাগ স্থান ব্যক্তিগত গাড়ির দখলে থাকা, শহরের মোট সড়কের মাত্র পাঁচ-ছয় ভাগ রাস্তা প্রধান সড়ক, যা গণপরিবহন চলার উপযোগী ইত্যাদি।

খাস জমি দখল ও জলাবদ্ধতা

বর্তমানে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। খাল বিল দখল আর পরিকল্পিতভাবে ড্রেন নির্মানের অভাব ও অব্যবস্থাপনার কারণে দিন দিন এই শহরের পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা কমে আসছে। বর্তমানে ঘণ্টায় ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিতেও জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। এ শহরের জন্য নানা সময় ড্রেনেজ স্টাডি ও মহাপরিকল্পনা তৈরি হলেও যথাসময়ে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এছাড়া রাজউকের ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ড্যাপ অনুযায়ী শহরের ভূমি ব্যবহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে না পারার কারণে ঢাকা শহরের আশপাশের জলাভূমি, নিম্নভূমি, খাল ইত্যাদি বেদখল হয়েছে এবং বর্ষা মৌসুমে পানি ধারণের স্থান কমে গেছে। ফলে জলাবদ্ধতার প্রকোপ বেড়েছে। এই ক্ষেত্রে ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া ঢাকা শহর ভবিষ্যতে বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

সাশ্রয়ীমূল্যে আবাসন

গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ আবাসনকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ঢাকা শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মানসম্পন্ন আবাসনের ব্যবস্থা নেই। তারা শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাদের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আবাসনে উপেক্ষিত হয়। নগর নীতিমালা কিংবা জাতীয় আবাসন নীতিমালাতে কিছু দিকনির্দেশনা থাকলেও তার বাস্তবায়ন খুব সামান্যই দেখা যায়। সামাজিক আবাসন বা সাশ্রয়ী আবাসনের উদ্যোগ নেয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তার সফল বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। তাই সারাদেশে ১৯৯৩ সালে আবাসনের ঘাটতি ছিল ৩১ লক্ষ, ২০০০ সালে সেটি দাঁড়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ আর আজ

এই ঘাটতির পরিমাণ ৬৫ লক্ষ। শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতেই শতকরা ৩৫ ভাগ মানুষ বাস করে নিম্নবিত্ত বস্তি ও অনানুষ্ঠানিক বসতিতে।

কেমন হওয়া উচিত আমাদের আগামী দিনের নগরাঞ্চল

একটি ভালো শহর তৈরি করতে হলে যেকোনো শহরের একটি ভিশন থাকে এবং সেই ভিশন অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা থাকতে হবে। শহরের উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজ হবে সমন্বিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তার ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা, অবকাঠামো তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা প্রদান করা। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) এবং 'নিউ আরবান এজেন্ডা' অনুযায়ী নগর ও গ্রামীণ বসতি উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন

আমাদের রাস্তাঘাটে, গণপরিসরে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, তাদের ব্যবহার উপযোগী অবকাঠামো, পরিবহণ ব্যবস্থা, গণপরিসর, পাবলিক বিল্ডিং ইত্যাদি হচ্ছে না। গত কয়েকবছর ধরে এই আলোচনা নগর উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্তদের মাঝে বারে বারে এসেছে। সে অনুযায়ী বেশি কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ি ও কাজের জায়গাতে নারীদের বহুমাত্রীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্তব্য পালনের কারণে 'নগর প্রতিবেশে' একজন পুরুষের তুলনায় নগরের কাছে একজন নারীর চাহিদা ও নগর পরিসরে নারীর সম্পৃক্ত হওয়ার ধরন অপেক্ষাকৃত অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আলাদা। নগরের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় আসে না। তাছাড়া নগর উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প ডিজাইন, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বেশির ভাগ কাজে নারীর সংখ্যা কম থাকায় নারী ব্যবহারবান্ধব নগর কাঠামো তৈরি হয় না। ফলে রাস্তাঘাট, ফুটপাত, মার্কেট, শপিংমল, পরিবহন ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট, পার্ক, উন্মুক্ত স্থানসহ সব গণপরিসর নারীদের ব্যবহার উপযোগিতা সীমিত ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। গণপরিসর ও নাগরিক সুবিধাগুলো ডিজাইন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনা করা হলে সেটা সকলের জন্য ভালো শহর হবে। শহরের গণপরিবহণ ও গণপরিসরের উন্নয়ন, পরিচালনের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যেন তা নগরে বসবাসরত সকল শ্রেণিপেশার মানুষের কাছে সহজে ব্যবহার উপযোগী হয়।

অভিঘাত সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের নগর ও গ্রামীণ বসতি বন্যা, উপকূলীয় ঘূর্ণীঝড়, নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বড় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় বাংলাদেশ। তার সাথে যুক্ত হয় জলাবদ্ধতাসহ মানব সৃষ্ট নানা রকমের দুর্যোগ। আধুনিক নগর পরিকল্পনায় ও উন্নয়নে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' পূরণে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। তাই দেশের সকল নগর ও গ্রামীণ বসতি উন্নয়নে অবকাঠামো থেকে শুরু করে সকল ধরনের উন্নয়নে 'অভিঘাত সহনশীলতার' ধারণাটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে।

সংবেদনশীল মানবিক শহর ও উন্নয়ন দর্শন

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা পরিকল্পনার দার্শনিক অবস্থান ভিন্ন হতে পারে কিন্তু শহরকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদা প্রায় অভিন্ন। মানুষ তার ঘরের ভেতরের জায়গাটি যেমন সাজানো গোছানো ও আরামদায়ক আশা করে, ঠিক তেমনি তাঁর বসবাসের এলাকা এবং শহরের সর্বজনীন স্থানগুলোও সাজানো গোছানো ও আরামদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান ঘর থেকে শুরু করে বাইরের পরিবেশ সকল কিছুর ওপর নির্ভর করে। নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একটি জটিল বিষয় হলেও প্রারম্ভিক বিষয়টি খুব সরল সাদাসিদা। আর সেটি হলো সকল মানুষের কর্মকাণ্ডকে সমান গুরুত্ব দেওয়া। একটি শহর অবশ্যই মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে চলাফেরার, বসার, দাঁড়ানোর, দেখার, শোনার অথবা কথা বলার উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করবে। মানুষের এই সকল মৌলিক কাজগুলো, যা তার সংবেদশীল মন ও আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত। তখনই একটি শহর ভালো হতে পারে, যখন শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সময় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়। এই সকল উপযুক্ত স্থান তৈরির জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত থাকতে হবে ঘর থেকে পাড়া-মহল্লা, পাড়া মহল্লা থেকে শহর পর্যন্ত।

বিশেষ কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ ঘর থেকে বাইরে বের হয়। তার কাজটি সময় মতো শেষ করার জন্য নগরে কার্যকর অবকাঠামো থাকতে হবে। আবার অনেকে আছেন, যারা ধীর পায়ে শহরকে উপভোগ করতে চান, সূর্যাস্ত দেখতে চান, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলতে বা দৌড়াদৌড়ি করতে চায়, অনেকে নির্মল বায়ু সেবন করতে কিংবা বিকেলের হাঁটাহাঁটি করতে চান। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশের কতকিছু দেখে, পুরানো কোনো বন্ধুর সাথে দৈবাৎ দেখা হয়ে যাবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সামাজিকীকরণ হয়। সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু যতই বড় হতে থাকে ক্রমান্বয়ে তার দৃষ্টি সীমাও বাড়তে থাকে। এই দেখার মধ্য দিয়ে সে প্রতিদিন

পৃথিবীকে নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করতে থাকে। তারপর থেকে শিশুটির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, স্মৃতিগুলো জমা হতে থাকে হাঁটা ও চলাফেরার মধ্য দিয়ে। সকলের চাহিদাকে মাথায় রেখে নগরকে সাজাতে হবে। এই বিবেচনা মানবিক শহর গড়ার অনিবার্যভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুশৃঙ্খল গণপরিবহণ ব্যবস্থা

প্রতিটি বড় শহরে আধুনিক নগর পরিকল্পনার ধারণাকে সমুন্নত রেখে গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। কার্যকর গণপরিবহণ উপযোগী অবকাঠামো নির্মান করতে হবে। "জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম পরিবহণ নীতিমালা"র আলোকে মানুষ-কেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে। ব্রাজিলের কুরিটিবা, কলম্বিয়ার বোগোতা শহরের জনবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার পূনর্গঠন বহুলভাবে আলোচিত উদাহরণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার অবশ্যই কমাতে হবে। বাড়াতে হবে গণপরিবহণ, প্রশস্ত-নিরাপদ ফুটপাত, নিরাপদ সাইকেল লেন নেটওয়ার্ক। একটি কার্যকর, বিশ্বস্ত ও আরামদায়ক গণপরিবহণ ব্যবস্থাই পারে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে।
ঢাকা শহরের জন্য সংশোধিত পরিবহণ কৌশল পরিকল্পনা (২০১৬-৩৫) প্রণীত হয়েছে। তার আলোকে গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাবশ্যক মনে করে দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

পথচারীবান্ধব নগর ও ফুটপাত

একশ বছর আগে পৃথিবীর শহরগুলোর অবস্থা একেবারে ভিন্ন রকম ছিল। অল্প কিছু ঘোড়ার গাড়ি আর দুই একটা মোটরকার ছিল নিতান্তই আগন্তুকের মতো। নগরের রাস্তা, গণপরিসরে নগরবাসীর চলাফেরা, ঘুরাফেরা ছিল সহজ, স্বাধীন, নির্বিঘ্ন ও প্রাণবন্ত। শহরগুলোতে ছিল মূলত পাদচারীদের প্রাধান্য, শহরের রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ির আগমনের সাথে সাথে পাদচারীদের রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো পাশের দেওয়ালের দিকে। তারপর থেকে তাদের চেপে যেতে হলো ক্রমশ ছোট হতে থাকা পরিসরের মাঝে। ক্রমশ ব্যক্তিগত গাড়ি ও পার্কিং সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কৌশল শহরকে সাধারণ মানুষের জন্য অমানবিক করে তুলেছে। বর্তমানে ঢাকাসহ পৃথিবীর শহরগুলোর সংকীর্ণ ফুটপাতগুলোতে পাদচারীদের ভীড় দেখে একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, ঐ সব রাস্তায় গাড়ীতে বসে থাকা মানুষের সংখ্যা ফুটপাতের হেঁটে যাওয়া মানুষের সংখ্যার চেয়ে কম। সুতরাং নগর পরিকল্পনা কার জন্য, গাড়ি চলাচলের জন্য নাকি মানুষের জন্য। মানুষ-কেন্দ্রিক নগর পরিকল্পনা মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে করতে হয়।

আধুনিক নগর পরিকল্পনার সকল তত্ত্ব ও দর্শনে বাস্তবায়নযোগ্যভাবে পথচারীবান্ধব শহর ও জনবসতি তৈরি করার কথা বলছে। আন্তঃনগর যোগাযোগ দ্রুতগামী বাহনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ও অবকাঠামো আর অন্তঃনগর, পাড়া, মহল্লা, গণপরিসরে নিরাপদ মানবিক শহর তৈরির উপকরণ। পৃথিবীর অনেক শহর সেভাবে নিজেদের শহরকে পুনর্নির্মাণ করতে পারছে, কেউকেউ পারছে না। যারা পারছে না, আমরা তাদের দলে থাকতে চাই না।

প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, অবকাঠামো ও সেবার বিকেন্দ্রীকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আর সুন্দরবন ছাড়া পুরো দেশটাই প্রায় সমতল এবং নগরকেন্দ্রগুলো সারাদেশব্যাপী চমৎকারভাবে বিন্যস্ত আছে। বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, পৌরসভা ও উপজেলাকে নিয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনা করার মাধ্যমে সমগ্র দেশের উন্নয়নকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। পরিকল্পনার স্তর অনুযায়ী অন্যান্য শহরগুলোতে কাজের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। এ সুবিধাগুলোর অভাব মানুষকে ঢাকার দিকে ধাবিত করে। এটা যদি অঞ্চলভিত্তিক করা যায় তবে ঢাকাকে ঘিরে চাপটা থাকবে না। ঢাকা থেকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন কাজকে বিকেন্দ্রীকরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কেবল ঢাকা নয় সারা দেশ নিয়ে কাজ করতে হবে।

ঢাকার আঞ্চলিক পরিকল্পনা হতে পারে এ শহরের সহজ যোগাযোগের দূরত্বে থাকা নগর কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সফল যোগাযোগ তৈরির মাধ্যমে। টঙ্গী, গাজীপুর, শ্রীপুর, কাপাসিয়া, মাধবদী, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর, ধামরাই, সাভার ইত্যাদি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় নগরকেন্দ্র। সমন্বিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা করে এসব নগর কেন্দ্রের সঙ্গে সড়ক ও রেলের মাধ্যমে ঢাকাকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এতে নগরগুলো পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হবে এবং মাঝের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা যাবে।

সরকারের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

গত এক দশকে (২০১০-২০২০) সত্যিকার অর্থে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে। এসময় সারাদেশব্যাপী 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১', দেশের ১০০টি স্থানে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি' ও শতবর্ষের 'ডেল্টা প্ল্যান' এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের কাজও চলছে।

এসময় এমন সব মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা সারাদেশের ভুমি ব্যবহার ও মানুষের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করবে। যদিও কিছু কিছু মেগা প্রকল্প নিয়ে দেশের অনেক বিশেষজ্ঞের উদ্বেগ আছে। এইসব প্রকল্প নিয়ে উন্মুক্ত বিতর্ক হতে পারতো কিন্তু তেমনটা হয়নি।

নগরায়ণে সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ

এটা অনস্বীকার্য যে, সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশেও নগরায়ণ একটি অনিবার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অনুচ্ছেদ ১১.২ বলা হয়েছে, উন্নত দেশে রূপান্তরের এই যাত্রায় নগরগুলোই হবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি। কারণ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ নগরে বাস করবে এবং ৮০ শতাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নগরেই সংঘঠিত হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খুব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে দেশের নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা ও ৪৯৫টি উপজেলা) কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ১) রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশে সকল নগর এলাকাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করতে হবে। যাতে সারাদেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং বড় শহরমুখী মানুষের অভিগমনের ধারা কমে আসবে। ২) মহানগরী, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ সকল নগর এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরি করতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩) স্থানীয় এই সকল পরিকল্পনার সাথে আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ৪) উন্নত নাগরিক সুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন নাগরিক জীবন নিশ্চিত করতে নগরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এবং সর্বোপরি, ৫) জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন নিশ্চিত করে এবং জবাবদিহিমূলক স্থানীয় নগর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামে নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করা

মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ক্রমশই কমে গিয়ে সেখানে সেবা ও শিল্প খাত প্রধান হয়ে উঠেছে। বর্তমানে কৃষি খাতের অবদান মোট দেশজ উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের কম হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষিক্ষেত্রের অবদান অপরিহার্য। কর্ম সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য কারণে মানুষ শহরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে কেন উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ তৈরি করা হবে না? এ বিষয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি নির্দেশনায় দেখা যায়, "সারা দেশে ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন বন্ধে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে। জনগণের অর্থ সাশ্রয় ও কৃষি জমি রক্ষায় উপজেলাগুলোতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাস্তা ও চলাচলের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। মাস্টারপ্ল্যানের লে-আউটে আবাসন, হাসপাতাল, মার্কেট, স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, কৃষি-খামার, শিল্প কারখানা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে এটি করতে পারি, তাহলে জনগণ এটি গ্রহণ করবে। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা"। সরকারের "আমার গ্রাম-আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ" এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, বিশেষত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করেছে।

উপসংহার

রাজধানী ঢাকাকে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি প্রতিযোগী নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যানজট আর জলজটের শহরের ইমেজ থেকে বের হয়ে আসতেই হবে। সেক্ষেত্রে ঢাকার সমস্যা সমাধান যেমন জরুরি, তেমনি ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা শহরকে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উন্নয়ন জরুরি। এসব নগরে বিশেষত কর্মক্ষেত্র সুযোগ সৃষ্টি, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া গেলে ঢাকার ওপর চাপ কমে আসবে। যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামাজিক সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, আর্থসামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, আর্থিক সামর্থ্য ইত্যাদি বিবেচনায় এনে সঠিকভাবে শহরের অন্তর্ভুক্তিমূলক জনবান্ধব পরিকল্পনা তৈরি হবে। তবে সবকিছুর উপরে আছে একটি ভালো নগর পরিচালন পদ্ধতি। সুশাসন নিশ্চিত না করে ভালো শহর গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে দেশের নগরে বসবাসকারী মানুষের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তবেই সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

আকতার মাহমুদ, নগর পরিকল্পনাবিদ; অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশে : তৈরি পোশাক শিল্প

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

১. সূচনা

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস যে সব গুরুত্বপূর্ণ নীতিকাঠামো, কর্মসূচি এবং খাতের অগ্রগতি দিয়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তৈরি পোশাক খাত এবং এ খাত সংশ্লিষ্ট নীতি উদ্যোগ তার মধ্যে অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তিনটি 'R'এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এগুলো হলো, 'Rice (ধান)', 'RMG (তৈরি পোশাক)' এবং 'Remittance' (প্রবাসী শ্রমিকের প্রেরিত অর্থ)। এ তিন খাতের মধ্যে বিশেষত তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতি হয়েছে সরকারি নীতি সহায়তায়, বেসরকারি বিনিয়োগে, বাণিজ্য সংক্রান্ত বাজার সুবিধায় এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিশেষত নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণে।

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের অর্থনৈতিক নীতিকাঠামোতে বিভিন্ন দশকে বিভিন্নমুখী পরিবর্তন দেখা গেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতীয়করণের আওতায় পাট, ব্যাংক, টেক্সটাইল ও ইনস্যুরেন্সসহ সকল কারখানা জাতীয়করণ করা হয়েছিল। সত্তর দশকের শেষে বেসরকারি খাতে শিল্প উদ্যোগ আবার চালু হয়। ১৯৭৮-এর দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮১-এর শিল্প-নীতি এবং ১৯৮৩-এর শিল্প-নীতির মাধ্যমে একদিকে জাতীয়করণকৃত শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণ শুরু হয়, অন্যদিকে বেসরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগ আসতে শুরু করে। রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের উদ্ভব এ সময়কালে ১৯৭৮ সালে মোট ১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি দিয়ে শুরু হয়। অথচ সত্তর দশকের শেষে যখন এ রপ্তানিমুখী পোশাক খাত যাত্রা শুরু করে তখন কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে এ খাতের বিকাশ লাভ ঘটে যখন বেসরকারিকরণ এবং কাঠামো খাত সংস্কারের আওতায় দেশে ব্যাপকভাবে বেসরকারি খাতের বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে আজ তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এ খাতে মোট কারখানার সংখ্যা ৩,২৩৪টি এবং শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৯ লাখ।

২. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প ও বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহ চেইন বাংলাদেশে

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে ধারাবহিকভাবে উত্তোরত্তর তার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে। পোশাক শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে মোট রাপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১.৬ মিলিয়ন ডলার–যা সে সময়কার দেশের সর্বমোট ৮১১ মিলিয়ন ডলার রাপ্তানির মাত্র ৩.৯ শতাংশ। ১৯৮০ এর দশকের পুরোটা সময় তৈরি পোশাকের রাপ্তানি ওভেন পোশাক নির্ভর ছিল। আমদানীকৃত কাপড়, নমুনা অনুযায়ী কাটা-কাপড় সেলাই এর কাজই মূখ্য ছিল এ দশকে। এজন্য এ সময়কালের রাপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকখাতের কাজ মূলত 'টেইলারিং' কাজ হিসেবে বিবেচিত হতো। এ দশক শেষে ১৯৯০ সালে তৈরি পোশাকের রাপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ১,৯২৩.৭ মিলিয়ন ডলার–যা মোট রাপ্তানির ৩২.৫ শতাংশ।

নব্বই দশকের শুরু হতে ওভেন পোশাকের পাশাপাশি নীট পোশাকের রাপ্তানি শুরু হয়। ফলে রাপ্তানি বাড়তে থাকে উল্লেখযোগ্য হারে। এক দশকের মধ্যে রাপ্তানি ১.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫.৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। সামগ্রিক রাপ্তানিতে তৈরি পোশাকের হিসাব বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫.৬ শতাংশে। এক্ষেত্রে নীট পোশাক রাপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নীট পোশাকের রাপ্তানি বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল–এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ কাঁচামাল হিসেবে সুতা ও কাপড় ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প হিসেবে টেক্সটাইল খাতের বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। তুলনামূলক কম বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় বলে নীট পোশাক খাতে কম্পোজিট নীট কারখানা স্থাপিত হয়েছে–যেখানে একই কারখানায় আমদানীকৃত তুলা ব্যবহার করে সুতা, কাপড় এবং পোশাক তৈরি বাড়তে থাকে। অপেক্ষাকৃত বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় বলে ওভেন খাতে কম্পোজিট মিল কম দেখা যায়। তবে ওভেন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা, কাপড় এবং ডাইং সুবিধা নিয়ে টেক্সটাইল কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওভেন খাতের সীমিত অভ্যন্তরীণ মূল্যসংযোজনের কারণে নীট খাতের উচ্চ মূল্যসংযোজনের পরও সামগ্রিক মূল্য সংযোজন ৪০ শতাংশের কিছুটা উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তবে জিডিপিতে পোশাক খাতের হিস্যা উত্তোরত্তর বেড়েছে–১৯৯১ সালে ২.৭ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে তা ১০.৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কাঁচা তুলা থেকে তৈরি সুতা ও কাপড়ের ওপর নির্ভরশীল। ফলে তুলাকেন্দ্রিক কাপড়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা তৈরি হলেও অন্যান্য কাঁচামাল কেন্দ্রিক কাপড় তৈরিতে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে। এক্ষেত্রে তুলাবহির্ভূত কাঁচামাল যেমন সিনথেটিক, পলিয়েস্টার ও মানবসৃষ্ট সুতা ও কাপড় তৈরিতে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। অথচ বৈশ্বিক তৈরি পোশাকের বাজারে তুলাবহির্ভূত কাঁচামালের এক বড় বাজার রয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রাপ্তানি বাজার সীমিত সংখ্যক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। মাত্র পাঁচটি পণ্যের হিস্যা মোট পোশাক রাপ্তানির ৮০ শতাংশ। অবশ্য ধীরে ধীরে পোশাক খাতের মধ্যেই অন্তঃবহুমুখীকরণ ঘটেছে। রাপ্তানিকৃত প্রধান নীট পণ্যের মধ্যে রয়েছে–জার্সি, পুলওভার, টি-শার্ট, মেয়েদের স্যুট, জ্যাকেট, মেয়েদের অন্তর্বাস, ছেলেদের অন্তর্বাস, বাচ্চাদের গার্মেন্টস, ছেলেদের শার্ট, ট্র্যাকস্যুট এবং ছেলেদের ওভারকোট ইত্যাদি। অন্যদিকে ওভেন পোশাকের মধ্যে প্রধান পণ্যগুলো হলো–মেয়েদের স্যুট, ছেলেদের স্যুট, মেয়েদের ওভারকোট, ছেলেদের ওভারকোট, ট্র্যাকস্যুট, মেয়েদের অন্তর্বাস, ছেলেদের শার্ট, শাল, স্কার্ফ, বাচ্চাদের পোশাক, টাই, রুমাল ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পোশাক খাতের এ অগ্রগতিকে কারিগরিভাবে মধ্যম-মানের অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা চলে। এ খাত অগ্রগতিতে প্রক্রিয়াগত উন্নয়ন (Process Upgrading) অর্জন করেছে–যার ফলে কাঁচামাল উৎপাদন, সরবরাহকৃত ডিজাইন অনুযায়ী নমুনা বানানো এবং কাপড় থেকে পোশাক প্রস্তুত করতে সক্ষম। এ খাত অগ্রগতিতে পণ্য (যা Product Upgrading নামে পরিচিত) এ সীমিত সাফল্য দেখিয়েছে। নীট পোশাক তৈরিতে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন থেকে পণ্য প্রস্তুতে সাফল্য ইতিবাচক। কিন্তু ওভেন পণ্যে এ সাফল্য সীমিত। তুলা জাতীয় পণ্য উৎপাদনে সাফল্য আসলেও তুলা-বহির্ভূত পণ্যে বাংলাদেশের অগ্রগতি সীমিত।

বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে (যা Functional Upgrading নামে পরিচিত)। সীমিত বিনিয়োগ ও দক্ষ গবেষণামান সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব এবং ডিজাইনারের অভাব এ খাতকে পিছিয়ে রেখেছে। কম গবেষণালব্ধ স্বল্পমূল্যের পণ্যের কারণে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা পণ্য উৎপাদন করে খুব কম মূল্য পান (যা CM নামে পরিচিত)। পাশাপাশি গবেষণায় যে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন তা করতে অনাগ্রহ এবং খুচরা বাজারে নেটওয়ার্কের অভাবে বাংলাদেশে উদ্যোক্তারা এখন পর্যন্ত নিজেদের ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারেননি।

৩. পোশাক খাতের সামাজিক অগ্রগতি

পোশাক খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা যতটা হয়েছে, সে তুলনায় এখাতের সামাজিক অগ্রগতি খুব সীমিত। আইএলও ঘোষিত সামাজিক অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক চারটি হলো–(ক) কর্মসংস্থানের সুযোগ, (খ) শোভন মজুরি, (গ) নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং (ঘ) সামাজিক সংলাপ। এসব সূচকে অগ্রগতি বিভিন্ন মাত্রায় ঘটেছে।

৩.১. কর্মসংস্থান

সামাজিক সূচকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে কর্মসংস্থানের দিক থেকে। তৈরি পোশাক খাত, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের কর্মসংস্থানের সিংহভাগ দখল করে আছে। বর্তমানে এ খাতে কর্মরত শ্রমিক রয়েছে প্রায় ২৯ লক্ষ, যার মধ্যে নারী শ্রমিক ১৭ লক্ষ এবং পুরুষ শ্রমিক ১২ লক্ষ। ১৯৯১ সালে যেখানে এ খাতের হিস্যা ছিল মোট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের ২.৮ শতাংশ, ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৬ শতাংশ। ২০১০ সালে ৫২.৬৩ শতাংশ, ২০১৫ সালে ৪৭.৫ শতাংশ এবং সর্বশেষ জরিপে ২০১৯ সালে ৪২.৪ শতাংশ। এ কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য অংশ নারী শ্রমিক। ১৯৯০-এর দশকে ৯০ শতাংশ নারী শ্রমিক নিয়োজিত থাকলেও পরবর্তী দশকগুলোতে এ নিয়োজন কমতে থাকে। ২০১২ সালে নারী শ্রমিক ৬৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৫৩ শতাংশ এবং ২০২০ সালে ৫৯ শতাংশ। পোশাকখাতে উত্তোরত্তর নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে আসার ফলে সার্বিকভাবে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ কমছে। বস্তুতপক্ষে, তৈরি পোশাকখাত একমাত্র খাত যা শুধু নারীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে তা নয়, বরং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তবে নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত ভূমিকা রাখলেও–সে ভূমিকা বহুমুখী নয়। এ খাতে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিককে ১০ বছরের বেশি কাজ করতে দেখা যায় না। ত্রিশোর্ধ শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম– শ্রমিকের গড় বয়স মাত্র ২৫ বছর। নারী শ্রমিকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন সামাজিক কারণে দীর্ঘকাল কারখানায় কাজ করতে সক্ষম হয় না। অধিকাংশ নারী শ্রমিক অধঃস্তন গ্রেডে (যেমন গ্রেড ৫, ৬ এবং ৭) কর্মরত। উপরের গ্রেডগুলোতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে এ খাতে উত্তরোত্তর দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ত্রিশোর্ধ শ্রমিকের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়ছে–তাতে পুরুষের পাশাপাশি দক্ষ নারী শ্রমিকের চাহিদাও তৈরি হচ্ছে।

৩.২ শোভন কর্মসংস্থান

শ্রমিকের মজুরির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখনও অনেক পেছনে। শোভন মজুরি বলতে যা বোঝায় (চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য আয় এবং পারিবারিক সঞ্চয়) তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। তবে পোশাকখাতে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ দশকে মাত্র একবার করে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হবার ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে গিয়েছিল। সেখান থেকে সরে এসে ২০০৬ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১২ বছরে মোট তিন বার ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হয়েছে। ২০০৬ সালে যেখানে ন্যূনতম মজুরি ছিল ১,৬৬২ টাকা (সপ্তম গ্রেড এর জন্য)। ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,০০০ টাকা। ২০১৩ সালে ৫,৪০০ টাকা এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে তা ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। মজুরি কাঠামোতে আংশিক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মজুরি কাঠামোয় মূল মজুরির পাশাপাশি খাদ্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং যাতায়াত ভাতা নির্ধারিত থাকে। পাশাপাশি ২০১৮ সালে ঘোষিত মজুরি কাঠামোতে মূল্যস্ফীতির বিষয়টি মাথায় রেখে প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ হারে বেতন সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে সামগ্রিক বেতনে শ্রমিকের মূল বেতনের শতাংশ কমে আসার কারণে নীট আয়ে (ওভারটাইম রেট, গ্রাচুইটি রেট ইত্যাদি) নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

অবশ্য শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো ন্যূনতম মজুরি আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। সর্বশেষ ২০১৮ সালে শ্রমিক পক্ষের দাবি ছিল ন্যূনতম ১৬,০০০ টাকা। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও ন্যূনতম মজুরিকে বাড়িয়ে শোভন মজুরিতে উত্তরণের জন্য বলা হয়েছিল। সর্বশেষ ২০১৮ সালে নাগরিক সমাজ গবেষণা করে এ মজুরি সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা করার অনুরোধ জানিয়েছিল।

তবে শ্রমিকের মজুরি বাড়লেও তাদের ন্যূনতম জীবনমানে এখনও অপূর্ণতা রয়েছে। ৮৩ শতাংশ শ্রমিক তাদের বাসস্থানে টয়লেট এবং রান্নাঘর ভাগাভাগি করে। এতে করে প্রতিদিন তাদের বাড়তি সময় ব্যয় করতে হয় গৃহস্থালী কাজে যা অনাকাঙ্ক্ষিত। শ্রমিকঅধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সরকারি স্কুল, ক্লিনিকের অভাবের কারণে অধিকাংশ শ্রমিকের সন্তানদের ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারি ক্লিনিকের সহায়তা নিতে হয়। এতে তাদের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ হয়ে যায়। শ্রমিকঅধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিনোদনের অভাব রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাসস্থান ব্যবস্থা গড়ে ওঠায়–পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাব রয়েছে। এ সংকটের কারণে শ্রমিকের বাসা ভাড়া অত্যধিক। সামগ্রিকভাবে শ্রমিকদের আয় কিছুটা বাড়লেও তার অধিকাংশ উচ্চ বাসাভাড়া, স্কুল ফি এবং ক্লিনিক ফি ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়ে যায়।

৩.৩ নিরাপদ কর্মস্থল

নিরাপদ কর্মস্থলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তবে তা অনেক বড় ক্ষতির মূল্য দিয়ে। অনিরাপদ কর্ম পরিবেশের কারণে ১৯৯০ এর দশকে এবং ২০০০ এর দশকে বড় বড় দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বড় দু'টি দুর্ঘটনা ঘটে ২০১২ সালে তাজরীন অগ্নি দুর্ঘটনায়, যেখানে ১১২ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ঘটে, যেখানে বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম প্রাণঘাতি ঘটনায় ১,১৩২ জন শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। এরপরই বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। সরকার এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ নিয়ে কারখানায় কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ঘটানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্র্যান্ড সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়–'অ্যাকর্ড' এবং 'অ্যালায়েন্স' নামে দুটো উদ্যোগে তাদের সদস্যভূক্ত ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত সকল কারখানার সমস্যা চিহ্নিত করে তা সংস্কার করা হয়। পাশাপাশি এসব ব্র্যান্ডের বাইরের কারখানায়ও সংস্কার কাজ পরিচালিত হয়। জাতীয় উদ্যোগের অধীনে এসব কারখানা সংস্কারের কাজ চলছে–যা বর্তমানে RCC (Remediation Coordination Cell) এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। তবে এসব কারখানার সংস্কার কাজে ধীর গতি রয়েছে।

তবে এসব উদ্যোগের পরও এখনও একটি সমন্বিত নিরাপদ কর্মস্থলের কাঠামো তৈরি করা যায়নি। বর্তমানে অ্যাকর্ডের কারখানাগুলো RSC (RMG Sustainability Council) এবং অ্যালায়েন্সের কারখানাগুলো 'নিরাপন'-এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বেসরকারি উদ্যোগ সরকারি উদ্যোগের সাথে সমন্বয় বাকী রয়েছে।

৩.৪ সামাজিক সংলাপ

সামাজিক সংলাপে তৈরি পোশাক খাত সবচেয়ে পিছিয়ে। এক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে আইনি সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিক অংশগ্রহণমূলক কমিটি (Worker Participation Committee) গঠন নির্বাচনের মাধ্যমে বাড়ানো গেছে। অপরদিকে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। ২০১৩ সালে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর যদিও কিছু ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়, তবে এসব ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যকর রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় না। কারখানা পর্যায়ে Safety Committee গঠন এবং পরিচালনা বাধ্যতামূলক করার কারণে এ কমিটিগুলো পরিচালিত হতে দেওয়া যায়। তবে তা কতটুকু সক্রিয় তা প্রশ্নসাপেক্ষ।
ইপিজেড এলাকায় শ্রমিকের জন্য Workers Welfare Committee (WCC) চালু রয়েছে। আইনি জটিলতায় ইপিজেডে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন এখনও গঠন করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইন সংস্কার করে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেবার জন্য

দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে চাপ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধনের জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনুরোধ জানানো রয়েছে। একই রকম অনুরোধ রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও। বাংলাদেশ ধীরে হলেও সক্রিয় রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্প্রতি আইএলও কনভেনশন ১৩৮ (শ্রমিকের ন্যূনতম বয়সসীমা) সংক্রান্ত কনভেনশন অনুমোদন দেয়া সরকারের একটা উল্লেখযোগ্য অর্জন।

৪. উপসংহার

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া জরুরি। ৫০ বছর এ খাতের অগ্রগতি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ খাতের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন–এ খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ অর্জন হয়েছে ‘স্বল্পোন্নত দেশ’ হিসেবে প্রাধিকারমূলক সুবিধা কাঠামোর ভেতর। কিন্তু আগামী দিনে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে গেলে বিশেষত ২০২৬ সালের পরে উপরোক্ত প্রাধিকার সুবিধা সীমিত হবে অথবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আগামী দিনের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ভর করবে দক্ষতার ওপর। পাশাপাশি তা নির্ভর করবে সামাজিক সূচক এ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত হবার উপর। এছাড়াও পরিবেশগত মানদণ্ড এবং জেন্ডার সমতায় অগ্রগতি করা সবিশেষ প্রয়োজন। ফলে এ খাতের উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সামাজিক সূচকে উন্নীত করতে কাজ করার প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নীতি সুবিধা পরিবর্তন করে তা চাহিদার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়বে।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাংলাদেশে দল-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ

আলী রীয়াজ

গত এক দশকে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনীতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। এই সময়ে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ এই কারণে যে এগুলোতে নাগরিকদের এবং নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। ২০১৪ সালে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের শরিকদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে; ২০১৮ সালে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ সত্ত্বেও প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল ক্ষমতাসীনদের বিজয় নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু নির্বাচন নয়। এর মধ্য দিয়ে যে জাতীয় সংসদগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর আইনি বৈধতা থাকলেও নৈতিক বৈধতার সংকট সুস্পষ্ট। এই সময়ে নাগরিকদের সভা-সমাবেশ এবং সংগঠন করার অধিকার ক্রমাগতভাবে সংকুচিত হয়েছে। মতপ্রকাশের ওপরে বিভিন্ন ধরনের আইনি এবং আইন-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এই সময়ে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা বা পার্টি সিস্টেমে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। আপাতদৃষ্টে বিরোধী দলগুলো রাজনীতির মাঠে উপস্থিত থাকলেও তাদের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে সীমিত হয়ে আসছে এবং এমন এক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে যেখানে তাদের ভূমিকা হবে কেবলমাত্র বিরাজমান রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা প্রদান।

কোনও একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা, তাদের আদর্শিক পার্থক্য, রাষ্ট্র ক্ষমতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং দলগুলোর ক্ষমতায় যাবার কার্যকর সম্ভাবনাকেই বলা হয় দল-ব্যবস্থা বা পার্টি সিস্টেম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দল-ব্যবস্থার তিনটি রূপের কথা বলে থাকেন। সেগুলো হচ্ছে বহুদলীয় ব্যবস্থা–যেখানে বিভিন্ন দলের এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনা আছে; দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা–যেখানে অনেক দল উপস্থিত থাকলেও বাস্তবে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুটি দল বা তাদের জোটের ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনা প্রবল; ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম বা আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থা–যেখানে অনেক দল উপস্থিত থাকলেও একটি দল বা তার জোট উপুর্যপুরি নির্বাচনে বিজয়ী হয় এবং নির্বাচনে সেই দল বা জোটের পরাজয়ের বাস্তব সম্ভাবনা প্রায় নেই। এর বাইরে আছে এক-দলীয় ব্যবস্থা। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এক-দলীয় ব্যবস্থাকে পার্টি সিস্টেমের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ কেননা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ নেই এবং অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও দলের পার্থক্যই অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে দল-ব্যবস্থার (পার্টি সিস্টেম) বর্তমান অবস্থা কী এবং ভবিষ্যৎ কোন পথে সেই আলোচনার জন্য আমাদের প্রথমে গত পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার দুটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই দুটি দিক গড়ে উঠেছে সামরিক-বেসামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের দল-ব্যবস্থায় যেগুলো সহজেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে দলের সংখ্যা এবং তাদের আদর্শিক অবস্থানগত বৈচিত্র। নির্বাচন কমিশনের হিসেব থেকে জানা যায়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মাত্র ১৪টি দল অংশ নিয়েছিল। তারপর থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের একটি শর্ত হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তখন পঞ্চাশটিরও বেশি দল সরকারের সাথে নিবন্ধিত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে ২৯টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে; ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা ৭৫-এ পৌঁছায়। পাঁচ বছর পর দাঁড়ায় ৮১-তে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধনকে আবশ্যক করে তোলে। মোট ১১৭টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়, যার মধ্যে ৩৯টি দল কমিশনের অনুমোদন পেয়েছিল। ২০১৩ সালের আগস্টে, কমিশন ৪৩টি আবেদন থেকে আরও নয়টি দলের আবেদন অনুমোদন করে। তারপর জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে এই তালিকায় আরও কয়েকটি দলকে যুক্ত করা হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯টিতে। উল্লেখ্য, এই তালিকার বাইরে বেশকিছু দল রয়েছে যারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি এবং নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে তাদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনও নেই। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অজ্ঞাত কারণে অনেক দলকে অনুমোদন দেয়নি। সুতরাং, বাংলাদেশে মোট দলের সংখ্যা এই তথ্যগুলো যা দেখায় তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের সাংগঠনিক শক্তি, কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতার ওপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম গোষ্ঠী হচ্ছে সেই সব দল যাদের নির্বাচন করার মতো এমন সংগঠিত সাংগঠনিক কাঠামো আছে; এ ছাড়াও আছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক-আদর্শিক অবস্থান এবং তৃণমূল পর্যায়ে উপস্থিতি। এই মানদণ্ডে এবং ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত চারটি নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বিচার করলে এই ধরনের দল আছে মাত্র কয়েকটি। কিন্তু যে দেশে নির্বাচনে অর্থ ও পেশীশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেখানে শুধুমাত্র নির্বাচনী সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দলগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা যথাযথ হবে না, সঠিক চিত্রও পাওয়া যাবে না। কিছু কিছু দলের এমন শক্তি আছে যারা জনপ্রিয় আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুলে ধরতে

পারে। এরা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদের একত্রিত করার ক্ষমতা রাখে, রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই গোষ্ঠীর তালিকাটি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির তালিকা থেকে আলাদা হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে আছে এমনসব দল যাদের জনগণের মধ্যে সমর্থন নেই বললেই চলে। এই দলগুলিকে প্রায়শই 'নাম-সর্বস্ব' রাজনৈতিক দল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। একজন সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একটি ছোট অফিস এবং একটি টেলিফোন একটি দল গঠনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত। তাদের অস্তিত্ব তাদের দলের নিজস্ব লেটারহেডগুলোতেই সীমাবদ্ধ। বড় জোর সংবাদপত্রের পাতায় তাদের খুঁজে পাওয়া যায়।

আকার, সংগঠন এবং প্রভাবের পার্থক্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো মতাদর্শের একটি বিস্তৃত পরিধি প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে আছে র‍্যাডিক্যাল বাম থেকে র‍্যাডিক্যাল ডান, কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী থেকে শুরু করে কট্টর ইসলামপন্থী। এর মাঝামাঝি রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমস্ত ধরনেরই প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। এগুলো সমাজে উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার প্রকাশ ঘটায় এবং দল-ব্যবস্থার বৈচিত্রকে তুলে ধরে। এগুলো বাংলাদেশের মানুষের রাজনীতিতে আগ্রহেরও প্রমাণপত্র।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের দল এবং দল-ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো হচ্ছে–রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অভাব, আদর্শিকভাবে দলগুলোর ক্রমাগত দক্ষিণপন্থী অবস্থান গ্রহণ, ইসলামপন্থী দলগুলোর সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি, দলগুলোর ভাঙ্গন এবং জোট গঠনের প্রবণতা। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একক দলের আধিপত্য সৃষ্টির চেষ্টা। এই শেষোক্ত প্রবণতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যা বিস্তৃতভাবে আলোচনার দাবি করে, কেননা এটি বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশে যেসব দল রাজনীতিতে প্রভাবশালী তাদের মধ্যেকার আদর্শিক পার্থক্য এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিরোধ সত্ত্বেও যে কতক বিষয়ে মিল দেখা যায় তার অন্যতম হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রহীনতা। এই গণতন্ত্রহীনতার প্রকাশ ঘটে দলগুলোর প্রধানের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দলের নেতৃত্বে আসীন হওয়ার জন্যে পারিবারিক যোগাযোগ এবং দলগুলোর ভেতরে এক ধরনের পারিবারিক আধিপত্য-এর বিষয়গুলোতে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল যে দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়েই আছে তা নয়, গত দেড় দশকে এই প্রবণতা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার লাভ করেছে। দলের ভেতরে গণতন্ত্রহীনতার বিষয়টি ১৯৯০-এর দশকের শেষ থেকেই আলোচিত হতে থাকে এবং ২০০০ সাল থেকেই গবেষকরা এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা-সমর্থিত সরকারের সময় তা বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসে। কিন্তু এইসব আলোচনা বিভিন্ন কারণেই কোনও ফল দেয়নি। দলগুলোর ভেতরে যে কোনো ধরনের গণতন্ত্র উপস্থিত নেই সেটি আরও বেশি প্রকটিত হয় দলগুলোর সম্মেলনের সময়। দেখা যায় যে, দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ ছাড়াই নেতা নির্বাচিত হন এবং তাও হয় দলের প্রধানের ইচ্ছে-অনুযায়ী। নিয়মিতভাবে দলের সম্মেলন অনুষ্ঠান না হওয়াও অনেক দলেই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। দলের প্রধানরা কয়েক দশক ধরেই এই আসনে আসীন আছেন। প্রধান প্রধান দলের গঠণতন্ত্রগুলোতেও দলের প্রধানের হাতে অসীম ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জবাবদিহির কোনও ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।

গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দক্ষিণপন্থী যাত্রার লক্ষণ তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রকাশিত। প্রথমত দক্ষিণপন্থী দলের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, দ্বিতীয়ত বামপন্থী দলগুলো দুর্বল হয়েছে, তৃতীয়ত প্রধান দলগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে আরও বেশি রক্ষণশীল অবস্থান নিয়েছে। এর পেছনে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যেমন কাজ করেছে তেমনি কাজ করেছে বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রভাবের অবসান এবং দেশে দেশে নিও-লিবারেল আদর্শের বিস্তার প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু তার বাইরেও দেখা যায় যে, যে সমস্ত আদর্শ এক ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার কথা বলতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখন সেই বিষয়ে আর উচ্চকণ্ঠ নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ইশতেহারগুলোতেও যে ধরনের অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলা হয়েছিল সেগুলো এখন আর দলগুলোর ইশতেহারে থাকে না, উপরন্তু বৈশ্বিক পুজিবাদের সঙ্গে কী করে খাপ খাইয়ে নিতে হবে সেই বিষয়ে দলগুলোর আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিষয়ে তাঁদের অবস্থানের পরিবর্তনের একটি দিক হচ্ছে ধর্মকে রাজনৈতিক আদর্শের জায়গায় স্থাপন করা। তার আলোকেই সামাজিক বিষয়ে দলগুলো তাদের অবস্থান গ্রহণ করে।

ধর্মের এই রাজনৈতিক উপস্থিতির একটি দিক হচ্ছে ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামপন্থী দলগুলো

সবই এক ধরনের নয় এবং তাদের ভেতরে বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিরাজমান। কিন্তু মোটা রেখায় যারা ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশে ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনেই প্রথম ধর্ম-ভিত্তিক দল অংশ নেয়। এর মধ্য দিয়েই তিনটি পরিবর্তনের সূচনা হয়। আর দুটি পরিবর্তন হচ্ছে নির্বাচনের বাইরে রাজনীতিতে ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে কথিত সেক্যুলার দলগুলোর জোট গঠন এবং সমঝোতা। নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা ছিল দুটি। ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ১৭-তে, ১৯৯৬ সালে আরেকটি দল যুক্ত হয়। ২০১১ সালে সামান্য কমে এসে দাঁড়ায় ১১-তে, এবং ২০০৮ সালে তা হয় ১০টিতে। সব ইসলামপন্থী দল নির্বাচনে অংশ নেয় না, নির্বাচনে ভালো ফলাফলও করে না; অনেকেরই নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন নেই। কিন্তু এই সংখ্যা যে বেড়েছে তা বোঝা যায় ২০১৮ সালের হিসেবে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলের এক-চতুর্থাংশ দলই ছিল ইসলামপন্থী দল। নিবন্ধিত ১০টি দলের মধ্যে ছয়টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিল এবং দুটি ছিল বিএনপির সঙ্গে। দুটি দল কোনো জোটের সঙ্গে ছিল না। আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকদের জোটে সংযুক্ত ছিল ৬১টি ইসলামপন্থী দল, বিএনপির সঙ্গে ছিল পাঁচটি দল। এই হিসেবে এক সময়কার বৃহত্তম ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীকে ধরা হয়নি।

এসবের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি। ২০০১ সালে বিএনপি'র নেতৃত্বে যে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় ছিল তার দুই শরিক ছিল জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্য জোট। ২০০৭ সালে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে–২০০৬ সালে–আওয়ামী লীগ লিখিতভাবে খেলাফত মজলিশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছিল যাতে কার্যত খেলাফতের এজেন্ডাই গৃহীত হয়। ইসলামপন্থী দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামীর উত্থান এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক এজেন্ডাকে পরিবর্তন। যদিও গোড়াতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে হেফাজতের বিরোধ দৃশ্যমান হয়েছিল, খুব স্বল্প সময়েই এই দুই পক্ষে এক ধরনের সমঝোতায় পৌঁছুতে সক্ষম হয়। জামায়াতে ইসলামীর বিকল্প হিসেবেই হেফাজতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে। ২০২১ সালে এসে হেফাজতের সাংগঠনিক শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়লেও সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের আদর্শ যে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে তা বলাই বাহুল্য।

যদিও বাংলাদেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি বিভিন্ন সময়ে দলের ভাঙ্গনের কারণে সাংগঠনিকভাবে সামান্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অন্য দলের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনো সময় ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়েছে। এই সব ভাঙ্গনের কারণ হিসেবে আদর্শিক মতপার্থক্যকে সামনে নিয়ে আসা হলেও দলের নেতৃত্বের প্রশ্নই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান কারণ। ১৯৭৬ সালের পর থেকেই এই প্রবণতা দৃশ্যমান হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিএনপি গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বিভিন্ন দলে ব্যাপক আকারে ভাঙ্গনের রাজনীতির সূচনা হয় এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদের সময়েও তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় পরিপোষণের জন্যেই ঘটেছে তা নয়। গত এক দশকে আবারও ক্ষমতাসীনদের উদ্যোগে বিরোধী দলে ভাঙ্গনের চেষ্টা লক্ষ করা গেছে।

দল ভাঙ্গনের এই প্রবণতার বিপরীতে আরেকটি প্রবণতাও গত পঞ্চাশ বছরে দেখা গেছে; তা হচ্ছে জোট গঠন। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে জোট গঠনের এই ধারা স্বাধীনতার আগে থেকেই ছিল, তবে তা আরও বেশি করে বিস্তার লাভ করে স্বাধীনতার পরে। জোট গঠনের এই ধারা সব সময়ই টিকেছে তা নয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৯২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৩২টি জোটের আবির্ভাব হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই ৩০ দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। জোট রাজনীতির দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। একটি হচ্ছে ছোট দলগুলোর নিজেদের মধ্যে জোট তৈরি করে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং বড় দলের সঙ্গে দর-কষাকষির চেষ্টা করা। আরেকটি হচ্ছে একটি বড় দলকে কেন্দ্র করে অনেক দলের জোট। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বড় দলগুলো অনেক সময়ই জোট গঠন করেছে যাতে করে তুলনামূলকভাবে ছোট দলগুলো প্রতিপক্ষের শিবিরে যোগ না দেয়। ছোট দলগুলোর মধ্যেকার জোটগুলো প্রধানত আদর্শ এবং কর্মসূচিভিত্তিক হলেও বড় দলকেন্দ্রিক জোটগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধার ঐক্য। এর বাইরে আমরা বিভিন্ন ইস্যুতে জোট গঠনের ঘটনাও দেখেছি।

এই সব প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে একক দলের আধিপত্য সৃষ্টির চেষ্টা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দলগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্থান এবং পতনের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে কারণে এই বিষয়ে নজর দেয়া অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা বোঝার জন্যে এটি অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে এ যাবত যে ১১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে সাতটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থার আওতায়, এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত একটি সংসদ সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি এবং এক দলীয় ব্যবস্থা চালু করেছিল। বাকি চারটি নির্বাচনের মধ্যে একটি সংসদ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি বাতিল করে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। দলগুলোর অবস্থা বোঝার জন্যে এই নির্বাচনগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি–১৯৭৩, ১৯৭৯-১৯৮৬, এবং ১৯৯১-২০১৮।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেবল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই পেয়েছিল তা নয়, ২৯৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আছে। কিন্ত এটাও ঠিক যে, কারচুপি না হলেও আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। এই নির্বাচনের পরে, এমনকি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে একদলীয় ব্যবস্থা চালুর আগেও, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে একাধিপত্য তৈরি করতে চায়। এই প্রবণতার পরিণাম হচ্ছে ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রতিষ্ঠা। আইনগতভাবে এই দলের বাইরে আর কোনো দলেরই অস্তিত্ব ছিল না। অনেক দল তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে বাকশালে যোগ দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই নতুন দলকে 'জাতীয় দল' বলে বর্ণনা করেছিল। আওয়ামী লীগও আলাদা করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখেনি।

১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে জিয়াউর রহমান এবং হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জাতীয় পার্টি (জাপা) রাজনীতিতে আসে, যথাক্রমে ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই দুই দলের আয়োজিত নির্বাচনের ফল দেখায় যে, ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে দল-ব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য তৈরি করাই ছিল লক্ষ্য। বিএনপি ১৯৭৯ সালে ২০৭টি আসনে, জাতীয় পার্টি ১৯৮৬ সালে ১৫৩ আসনে এবং ১৯৮৮ সালে ২৫১ আসনে বিজয়ী হয়েছিল। এই দুই সময়েই অর্থাৎ জিয়া এবং এরশাদের শাসনামলে আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষমতাসীন দল এমন এক দল-ব্যবস্থা তৈরি করতে চাইছে যাতে উপর্যুপরি নির্বাচনে তার বিজয় নিশ্চিত হয়, কিন্ত রাজনীতিতে বিরোধী দল উপস্থিত থাকে।

একক দলের আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেম, এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল কেবল নির্বাচনে কারচুপি এবং সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না, বরং রাজনৈতিক এজেন্ডা এবং পাবলিক পলিসির উপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বাকশাল এক নতুন আদর্শের কথাই বলেছে, পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলাম এবং সেক্যুলারিজমের মধ্যে বিরোধকে সামনে আনা, রাষ্ট্র ধর্ম চালু করা তার প্রমাণ।

১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের পতন এই ধরনের দল-ব্যবস্থা পরিবর্তনের সূচনা করে। ততদিনে পার্টি ব্যবস্থায় তিনটি পরিবর্তন দেখা গেছে : দলগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন (বিশেষ করে ১৯৭৬ সালের পরে); জোট গঠন (বিশেষ করে ১৯৮২ সালের পরে); এবং ইসলামী দলগুলোর পুনরুত্থান (১৯৭৬ সালের পরে)। ১৯৯০ সালে যখন একটি গণঅভ্যুত্থান এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করা হয়, তখন মতাদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশের পার্টি ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে ওঠে। প্রধান দলগুলোর বিভক্তি এবং বিভিন্ন জোট তৈরি হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯১ সালের নির্বাচন দেখিয়েছিল যে দেশ কার্যত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করছে। অন্যান্য দলের উপস্থিতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র প্রাপ্ত ভোটের হারই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ১৯৯১ সালে বিএনপি'র ৩০.৮% এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৩০.১%; ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে এই দুই দলের পাওয়া ভোট ছিল ৩৩.৪% এবং ৩৭.৪%; ২০০১ সালে নির্বাচনে এই হার দাঁড়ায় ৪১.৪% এবং ৪০.০২%।

২০০১ সালের নির্বাচনে ভোটের দিক থেকে ভারসাম্য থাকলেও বিএনপি'র প্রাপ্ত আসন সংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি এবং চার-দলীয় জোটের আসন সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশের ওপরে থাকায় বিএনপি'র মধ্যে এক ধরনের 'একক দলের আধিপত্যশীল ব্যবস্থার'ঝোঁক তৈরি হয় যার পরিণতিতেই ২০০৬ সালের রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি আসন সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ করলেও দলের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৩৩.২%, যা তার আগে পাওয়া ভোটের চেয়ে খুব কম নয়। এই হার অবশ্য আওয়ামী লীগের চেয়ে ১৬% কম ছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে দেখা যায় যে, আরও দুটি দল– জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী–১২% ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ তখনও বাংলাদেশের রাজনীতি একক দলের আধিপত্যশীল ব্যবস্থার অনুকূলে নয়, বরঞ্চ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এবং এই দুই দলকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দলের উপস্থিতি ছিল। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটি ক্ষমতার একটি ভারসাম্য তৈরি করে, দুর্বলভাবে হলেও এক ধরনের 'চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স'-এর তাগিদ বহাল রাখে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই ঘটনা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে, বিশেষ করে ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে 'আধিপত্যশীল দল-ব্যবস্থা' মানসিকতা পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করতে পারেনি। পূর্ববর্তী ২২ বছরে ক্ষমতার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার আলোকে আসন্ন নির্বাচনে পরাজয়ের আশংকা, আধিপত্যশীল দলীয় মানসিকতা এবং বিরোধী দলের ওপরে আস্থার অভাব আওয়ামী লীগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করার দিকেই প্ররোচিত করে। ২০১১ সালে দেশের মানুষের

আকাঙ্ক্ষা, সংসদীয় কমিটির কাছে সমাজের বিভিন্ন অংশের সুপারিশ, এমনকি সংসদীয় কমিটির প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া হয়। এর একটি অন্যতম কারণ ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমাগত ক্ষয়। ১৯৯১ সাল থেকে যে ধরনের নির্বাচনী গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল তা ক্ষয় হয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্তৃত্ববাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল। বিএনপি'র কৌশলগত ভুল, অন্যান্য বিরোধী দলের এটা বুঝতে অপারগতা যে এই ধরনের দল-ব্যবস্থা একটি স্থির বিষয় নয় বরঞ্চ তা আরও বেশি খারাপের দিকে অগ্রসর হবে আওয়ামী লীগের জন্যে কাজটি সহজ করে দেয়। এই প্রেক্ষাপটেই ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলো তা বর্জন করে, কিন্তু কার্যকরভাবে তা প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি।

ইতোমধ্যে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামের সংঘটিত সহিংসতা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে সব দলের এক অবস্থানে না আসা, নির্বাচনের সময় বিএনপি'র সহিংস কার্যকলাপের ঘটনা ঘটে। ক্ষমতাসীনরা এই সব তাদের অনুকূলে ব্যবহার করে এবং শক্তি প্রয়োগের মাত্রাকে অভাবনীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। নির্বিচার শক্তি প্রয়োগকে এক ধরনের বৈধতা দেবার কাজেও ক্ষমতাসীনরা দৃশ্যত সফল হয়।

২০১৪ সালের নির্বাচনে চল্লিশটি নিবন্ধিত দলের মধ্যে মাত্র ১২টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। এই দলগুলো ছিল ক্ষমতাসীনদের সহযোগী এবং জোটের অংশ। এই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল প্রায় ২২ শতাংশ। ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পরে এই নির্বাচনের ফলাফল বিষয়ে আর কোনো ধরনের উপসংহারের সুযোগ ছিল না। নির্বাচনের আগে ও পরে আওয়ামী লীগ জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিকে জোর করে এবং প্রলোভনের মাধ্যমে নির্বাচনে শরিক করেছিল। এই কাজে প্রতিবেশী ভারতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও ছিল।

নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা ও নৈতিক বৈধতার জন্য জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল, যদিও এই দলের সদস্যরাই আবার মন্ত্রীসভায়ও ছিল। বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও এই প্রয়োজনীয়তা থেকেও উদ্ভূত যে, একটি আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থার জন্য একটি বিরোধী দল প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় এমন একটি দল প্রয়োজন যা শাসক দলের জন্য আসন্ন হুমকি সৃষ্টি করে না। যে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ধরনের দল-ব্যবস্থা বা পার্টি সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করেছেন বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা বলেছেন যে, আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থা হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীনদের পরাজয় কল্পনা করা যায় না বা অদূর ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনাও থাকে সামান্যই।

ফলে ২০১৪ সালের শেষের দিকে, বাংলাদেশের পার্টি ব্যবস্থা এমন একটি অবস্থায় দাঁড়ায় যেখানে চারটি সম্ভাবনা ছিল–

● একটি আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ১৯৭৫, ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালের প্রচেষ্টাগুলোর মতই ব্যর্থ এবং দেশটি আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র দ্বি-দলীয় ভারসাম্যের পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবে।
● কৌশলগত ভুল ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণে বিএনপি দুর্বল বা ভঙ্গুর দলে পরিণত হবে এবং দেশে আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা পাবে। এই ব্যবস্থায় থাকবে একটি দুর্বল বিরোধী দল যে ক্ষমতাসীনদের অনুগত বিরোধী দল হিসেবে কাজ করবে। সেটি বিএনপি'ও হতে পারে।
● একটি নতুন ধরনের পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার ফলে যে শুন্যতার সৃষ্টি হবে তাকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন দল বিএনপির জায়গা নেবে।
● বিদ্যমান দুটি ক্ষুদ্র দলের মধ্যে একটি দল কার্যকর প্রধান বিরোধী দল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিকল্প, অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের অনুগত বিরোধী দল তৈরির পথই বেছে নিয়েছিল। ২০১৫ সালে বিএনপির আন্দোলনে ব্যর্থতার পর এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে ক্ষমতাসীন দল একটি অনুগত বিরোধী দলকে দিয়েই একটি আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমূহ দুর্বলতা এবং দিক-নির্দেশনার অভাব সত্ত্বেও দলগতভাবে বিএনপি যে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়নি, জনগণের কাছে দলের আবেদন আছে সেটা পরের বছরগুলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণেই ২০১৮ সালে বিএনপি'কে আরও বেশি প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। খালেদা জিয়ার কারাদণ্ড, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মামলা এবং তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের ওপরে নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে বিএনপি'র সামনে তিনটি বিকল্প ছিল–হয় অনুগত বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়া; নতুবা ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে মোকাবিলা করা কিংবা কেবলমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা।

২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টা যেভাবে আওয়ামী লীগের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারতো সেইভাবে তা গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে এই উপলব্ধি তৈরি হয় যে, আগামীতে ক্ষমতা সংহত ও নিশ্চিত করার জন্যে এমন এক আধিপত্যশীল পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যেখানে বিরোধী দলগুলোর ওপরে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা যায়। এই নিয়ন্ত্রণের জন্যে অনুসৃত প্রক্রিয়া হচ্ছে নিপীড়ন, কো-অপটেশন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ। একাধিপত্যের এই ধারণাই ২০১৯ সালে তৃতীয় মেয়াদে মন্ত্রীসভায় প্রতিফলিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই মন্ত্রীসভা এককভাবে আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে গঠিত, এতে জোট শরিকদের নেয়া হয়নি। ১৯৯৬, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের শরিকদের সীমিত আকারে হলেও অংশগ্রহণ ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারপরে যেভাবে শাসন পরিচালিত হচ্ছে তাতে এটা মনে করাই স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশের দল-ব্যবস্থা কার্যত একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ এমনকি সিভিল সোসাইটির একাংশের ওপরে দলের আধিপত্য এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রাষ্ট্র এবং দলের মধ্যেকার পার্থক্য এখন প্রায় অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবহার করে বিরোধী দলকে নিঃশেষিত করার এই চেষ্টায় কেবল যে বিরোধীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা নয়; একই সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রশাসনের ওপরে নির্ভরশীল একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র এবং দল একীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অবসিত হতে চলেছে; রাজনীতির ওপরে রাজনীতিবিদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়েছে। এই প্রক্রিয়া বিরাজনীতিকরণেরই লক্ষণ। এক-দলীয় ব্যবস্থার একটি অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে বিরাজনীতিকরণ। রাজনৈতিক আদর্শের ওপরে নির্ভর করে জনসমর্থন লাভ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তাকে বৈধতা দেয়ার তাগিদ এবং প্রয়োজনীয়তা এই ধরনের ব্যবস্থায় থাকে না। ফলে রাজনীতিকেই নির্বাসনে পাঠানো হয়। কিছু দেশে সাংবিধানিকভাবেই তা করা হয়েছে, কিন্তু গত দেড় দশকে সারা বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের উল্টো যাত্রার এই সময়ে অনেক দেশে আপাতদৃষ্টে ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমের মধ্যেও তা করার প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই ধরনের দল-ব্যবস্থা নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ বা ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানইজমের একটি উপাদানে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে যে দল-ব্যবস্থা গড়ে উঠছে এবং ক্ষমতাসীনরা যে দল-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছেন তার ভবিষ্যৎ কী! আরও সহজ করে বললে, বাংলাদেশে দল-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কী! সেটা কেবলমাত্র ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছে ও প্রচেষ্টার ওপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা ও আচরণের ওপরেও। বিরোধী দলগুলোর এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, বাংলাদেশের দল-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে এবং নির্মীয়মান এই ব্যবস্থায় তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হলেও তাদের ভূমিকা সীমিত আকারেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই ব্যবস্থায় দৃশ্যত গণতন্ত্র থাকলেও, গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানগুলো অনুপস্থিত। ফলে তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে গণতন্ত্রের এই সব মৌলিক উপাদানের অন্যতম–মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া। ডমিনেন্ট পার্টি সিস্টেমের বিপরীতে কার্যকর বহুদলীয় দল-ব্যবস্থার জন্যে সক্রিয় হওয়ার আর কোনো বিকল্প নেই।

আলী রীয়াজ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর,
আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশের ৫০ বছর : উন্নয়ন-বিস্ময়ের রহস্য সন্ধানে

বিনায়ক সেন

১. একটি গর্বিত জাতি

বাংলাদেশ ৫০ বছরে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রাথমিক প্রত্যাশার তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভালো সাফল্য দেখিয়েছে, যেটিকে অনেকে উন্নয়ন বিস্ময় বলে অভিহিত করেছেন। এটা কি আসলেই বিস্ময়–সেটি একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশ নিয়ে নৈরাশ্য যেমন ছিল তেমনি আশাবাদও ছিল। আশাবাদের উৎস ছিল বেশ কয়েকটা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি গর্বিত জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়। একটি গর্বিত জাতীয়তাবাদের সূচনা হলে উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের মৌলিক নীতিমালা হিসেবে সমতা বিধানের নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতি আমরা সংবিধানের মধ্যে দেখি, বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্যেও দেখি। আশাবাদের তৃতীয় উৎস ছিল, জন-আকাঙ্ক্ষা। জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মে যে একটু সুযোগ পেলেই বড় কিছু করা সম্ভব। পাকিস্তান আমলে ধারণা ছিল বাপ-দাদাদের মতোই আমাদের জীবন কাটবে। যেহেতু আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের পক্ষে আরও বড় কিছু করা সম্ভব–একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসের জন্ম দেয়। এই জন-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক সচলতার সম্ভাবনা ও তাগিদ দেখা দেয়। আশাবাদের চতুর্থ উৎস ছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সামাজিক শক্তির আবির্ভাব, যেটাকে আমরা এনজিও বা বেসরকারি সেক্টরের মুভমেন্ট বলি। পাকিস্তান আমলে এ ধরনের কোনো মুভমেন্টের অস্তিত্ব ছিল না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি এনজিও বিশেষ করে ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্যের মতো কিছু প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসব সংগঠন ত্রাণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শুরু করে পরবর্তীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। আমাদের মতো যেসব অঞ্চল–যেমন ভারতের বিহার–তারাও দেখা যায় কৃষি-প্রধান, তারাও সেচ কাজ করছে আমাদের চাষীদের মতোই; কিন্তু একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে সেখানে কোনো সুস্থ-সবল এনজিও পাওয়া যায় না। সেখানে ৯০ দশকে কিছু এনজিও গড়ে উঠলেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তারা ততটা তৎপর নয়। আমাদের দেশে এনজিও মুভমেন্টের বিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চম আশাবাদের উৎস ছিল, অন্যান্য স্বল্প-উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের ব্যুরোক্রেসির মান ও ভূমিকা তুলনামূলকভাবে অগ্রসর ছিল।

সুতরাং গর্বিত জাতীয়তাবাদ, বাহাত্তর সালের সংবিধান, উন্নয়নের জন্য সমতার নীতি গ্রহণ, জন-আকাঙ্ক্ষার বিপুল বিস্তৃতি, সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস, এনজিওদের উন্নয়নমুখী ভূমিকা এবং উন্নয়নে সিভিল ব্যুরোক্রেসির ভূমিকা–সব মিলিয়ে একটা প্রাথমিক আশাবাদের জন্ম হয় যে, এই দেশটি স্বাধীন হয়েছে এবং একটা বড় কিছু করার জন্য প্রস্তুত।

২. নানা ধরনের নৈরাশ্যবাদ

কিন্তু উপরোক্ত আশাবাদের পাশাপাশি বেশকিছু নৈরাশ্য বা হতাশাবাদও সেসময় জন্ম নেয়। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে পাঁচ প্রকারের হতাশাবাদের দেখা মিলে। এর মধ্যে কিছু কিছু হতাশাবাদ আমরা ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছি, কিছু কিছু হতাশাবাদের ছায়া এখনও রয়ে গেছে।

এই হতাশাবাদের মধ্যে প্রথমেই আসে কৃষির সফলতা নিয়ে হতাশাবাদ। এই মতের প্রবক্তারা তখন বলতেন বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতি প্রায় অসম্ভব। কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় জমির স্বল্পতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আধিক্য এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে পর্যাপ্ত রিসোর্সের অভাব। তদুপরি আমাদের জমিগুলো যেহেতু উত্তরাধিকারসূত্রে খণ্ডবিখণ্ড হতে থাকে, ফলে প্লট সাইজ এত ছোট হয়ে যায় যে সেখানে বড় ধরনের কৃষি উৎপাদন করা খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৃষি উৎপাদনের সাফল্য নিয়ে নানা মহল থেকে এক ধরনের হতাশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। ওই সময়ের লেখা বইগুলোর নাম দেখলেই সেটি বুঝা যায়: ‘Bangladesh: a Test Case for Development’; ‘Agriculture in aims’; ‘Agrarian Impasse’ ইত্যাদি। বাংলাদেশের কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ–এটাই ছিল এ লেখাগুলোর মূল বিষয়বস্তু।

কৃষি-উন্নয়ন নিয়ে হতাশাবাদের পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েও হতাশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। বলা হতো, বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল একটি দেশ এবং জনসংখ্যার আরও বিস্ফোরণ ঘটবে। ফলে যতই উৎপাদন হোক না কেন, পরবর্তীকালে সেই উৎপাদন নিঃশেষ হয়ে যাবে; মাথাপিছু জাতীয় আয়ের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি হবে না। আমাদের দেশে নারীদের অবস্থা যেহেতু ঘরকেন্দ্রিক, সেহেতু নারীদের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পরিসর খুবই সীমিত। ফলে এখানে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিস্তারের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ৩ থেকে ১-এ নামিয়ে আনা যাবে না।

তৃতীয় নৈরাশ্যবাদের উৎস ছিল শিল্প উদ্যোক্তাদের বিকাশ-সংক্রান্ত। মনে করা হতো, বাঙালিরা প্রথম প্রজন্মের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তাদের পক্ষে আধুনিক কলকারখানা চালানো সম্ভব হবে না। এ কারণে পাকিস্তান আমলে বাঙালি শিল্পোদ্যক্তা শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি এবং ১৯৭২-৭৫ সালে জাতীয়করণের দিকে জোর দেয়া হয়; কারণ পরিকল্পনাবিদরা বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালি মালিকদের পক্ষে চটজলদি বড় আধুনিক কলকারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আরও মনে করা হতো যে, আমরা কখনও শিল্প-পণ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতে পারব না। আমরা কেবল অ-শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করতে পারব। ১৯৭৬-৮০ সময়কালে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত শিল্প ঋণের ৯৬ শতাংশই খেলাপি হয়ে যায়। ফলে আশি দশকের গোড়া পর্যন্ত এই বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল যে, আমরা পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো রপ্তানিমুখী শিল্পের দিকে এগুতে পারব না।

চতুর্থ নৈরাশ্যবাদ দানা বাঁধতে থাকে সুশাসনের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। এখানে বড় আকারের নৈরাশ্যের কারণ ছিল অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা–বিশেষত ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে এক ধরনের সিভিল-মিলিটারি শাসনের রাজত্ব। এই মিলিটারি শাসন কখনও কাটবে কি না তা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে সে সময় বড় ধরনের বিতর্ক ছিল। যেমন, তালুকদার মনিরুজ্জামান লিখেছিলেন Military Withdrawal from Politics, যেখানে তিনি বাংলাদেশ থেকে মিলিটারি শাসন কখনও দূরীভূত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন।

পঞ্চম নৈরাশ্যবাদ ছিল বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা নিয়ে। ১৯৮২ সালে রেহমান সোবহান লিখলেন The Crisis of External Dependence, সেখানে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল বাংলাদেশের লাইফলাইন মূলত ডোনারদের হাতে। এরকম বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর পরিস্থিতে এদেশের এলিটদের পক্ষে স্বনির্ভর, স্বাধীন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে না। এক পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্য-দাতারা এখানকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলাফল দেখে হতাশ হয়ে পড়বে, তখন বৈদেশিক সাহায্য ক্রমশ সংকুচিত হবে এবং বাংলাদেশ যে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে কথিত হয়েছিল সেটি সত্য প্রমাণিত হবে।

৩. বাস্তবে ঘটনা হলো উল্টো

কিন্তু কার্যত আমরা কী দেখলাম? প্রাথমিক হতাশাবাদকে প্রতিহত করে বাংলাদেশ উঠে দাঁড়িয়েছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করব। প্রথম ভাগে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাফল্য। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়নে সাফল্য, এবং তৃতীয় ভাগে রয়েছে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে সাফল্য।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটি বলতে হয়–১৯৭২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল যেখানে ১০০ ডলার, সেখানে আজ তা ২,৫০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে; মানে ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা, কারণ চলতি মূল্যের হিসেবে অন্তত আমরা পার্শ্ববর্তী ভারতকে ছাড়িয়ে গেছি, যদিও আন্তঃদেশের তুলনা করা উচিত পারচেজিং পাওয়ার প্যারেটি (পিপিটি) ডলারে–সেক্ষেত্রে আমরা ভারতকে এখনও ছাড়াইনি, কিন্তু ছুঁই ছুঁই করছি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি বছর বছর প্রবৃদ্ধির যে তারতম্য তা বাংলাদেশে সবচাইতে কম। এমন অনেক দেশ আছে যে দেশে হয়ত প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের মতই অর্জিত হচ্ছে, কিন্তু সেখানে গড়ে একই হার অর্জিত হলেও এক বছর থেকে আরেক বছরের তারতম্য অনেক বেশি। কোনো সময় হয়েছে ২%, কোনো সময় হয়েছে ৮%; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই গ্রোথ ভলাইটিলিটি ১৯৯০ সাল থেকে অন্তত অনেক কম। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, বন্যাপ্রবণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উঠানামা করেনি। প্রবৃদ্ধির উঠানামা কম হওয়াটা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য স্বস্তিদায়ক।

প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ছিল প্রায় ১০ শতাংশ, ২০১৯-২০ সালে যা প্রায় ২০ শতাংশ উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। কাঠামোগত পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নির্ধারক হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং জিডিপির অনুপাত ১৯৯০ সালের তুলনায় কমে গেছে; পাকিস্তানেও ভারতের মতো অবস্থা। সে তুলনায় আমরা দ্রুত ম্যানুফ্যাকচারিং নেশনে পরিণত হচ্ছি। অনেক দেশ আছে যারা কাঠামোগত রূপান্তরের সময় একটি খাতে ভালো করেছে, কিন্তু অন্য খাতে ভালো করেনি। আমাদের দেশ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পাশাপাশি কৃষি খাতেও সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ কখনো খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে সত্তর-আশির দশকে আমরা এটার ওপর আস্থা রাখতে পারতাম না। অথচ আগে যেখানে কৃষিতে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ নিয়োজিত ছিল, এখন সেখানে ৪০ শতাংশ মানুষ নিয়োজিত। কিন্তু আমাদের মোট জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৭ কোটি। সেই একই পরিমাণ জমি দিয়ে আরও কম শ্রমশক্তি কাজ লাগিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদার যোগান দিয়ে যাচ্ছি। প্রথম দিকে কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃতি ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এটা হতে পেরেছে। পাশাপাশি অ-শস্য কৃষি খাত বিশেষত গবাদি

পশু ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও বিপুল সাফল্য আমরা দেখছি। পুষ্টির যোগান দিচ্ছে এই দুটি খাত। অর্থাৎ আমাদের দেশে উন্নয়ন হয়েছে দুটি পায়ে; এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমরা হাঁটিনি। আমরা কৃষিতেও হেঁটেছি, শিল্পখাতেও হেঁটেছি। এর পাশাপাশি শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ ১৯৭৪ সালের শুমারি অনুযায়ী ছিল ৫ শতাংশ, এখন সেটা ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শহরে জনসংখ্যার বিস্তৃতির সাথে সাথে বিভিন্ন সেবা খাতেরও বিস্তৃতি হয়েছে, যেমন ব্যাংক, বিমা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। এর ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ এ খাতে নিয়োজিত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখি রেডিমেড গার্মেন্টসে সাফল্য পেয়েছি, যেটা আমাদের মোট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ৫০ শতাংশ। পাশাপাশি ২০০০-এর পর থেকে স্থানীয় শিল্পখাতের সাফল্যও দেখা যাচ্ছে। এই শেষোক্ত সাফল্যের পেছনে পলিসি সাপোর্টের একটি বড় ভূমিকা ছিল (যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তুলনামূলক স্থিতিশীলতা এবং টাকার কিছুটা ডেলিবারেট 'অতিমূল্যায়ন')।

ইতিবাচক পরিবর্তনের তৃতীয় চিহ্নটি জনকল্যাণের ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনের শুভ প্রভাব পড়েছে মজুরির ওপর। আগে দৈনিক কৃষি মজুরি দিয়ে আড়াই কেজি চালও পাওয়া যেত না। ১৯৮২ সালের দিকে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির একটি দাবি ছিল, ক্ষেতমজুরদের যেন আড়াই-তিন কেজি চালের সমপরিমাণ মজুরি অন্তত দেয়া হয়। এখন কৃষিতে মজুরির পরিমাণ দৈনিক ৫০০ টাকা, প্রায় দশ কেজি চালের সমান। চরম দারিদ্র্যের মাত্রা ১৯৮০-৯০ দশকের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা যদি দেখি, ১৯৯০-৯১ সালে যেটি ছিল ৬০ শতাংশ, কোভিডের আগ পর্যন্ত সেটি প্রায় ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। করোনার কারণে দারিদ্র্য কিছুটা বাড়লেও তা আবার কমে এসেছে। যদিও এখনো পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় নি। একইসাথে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমাদের শিশুমৃত্যুর হার বা মাতৃমৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নতি করেছি। দারিদ্র্য ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন হয়েছে নারীদের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, শিশুদের কল্যাণের ক্ষেত্রে আমরা উন্নয়ন করেছি। মেয়েদের শিক্ষার হার ছেলেদের চাইতে বেশি, মেয়েদের মৃত্যুর হার ছেলেদের চাইতে কম, শিশু পুষ্টির উন্নতি হয়েছে, শিশু শ্রমের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে।

সাফল্যের কারণ এদেশের জনসংখ্যায় তারুণ্যের আধিক্য, যাদের একটি বড় অংশ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

৪. ইতিবাচক পরিবর্তনের পেছনে কার্য-কারণ

এই যে প্রাথমিক আশাবাদ, আবার হতাশাবাদ, এবং পরবর্তীতে ইতিবাচক পরিবর্তন–এর পেছনে রহস্য কী? এর আগের অধ্যায়ে যে তিন ধরনের পরিবর্তন বা সাফল্যের কথা বলা হলো তার পিছনে ব্যাখ্যা কী? এর সহজ সরল কোনো ব্যাখা নেই। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছে।

একটি হলো, বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে উদ্যোক্তাপ্রবণতা দৃশ্যমান। প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের মধ্যে এক ধরনের উদ্যোক্তা মনোভাব দেখতে পাচ্ছি। এটা শুধু একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যেই সীমিত না, শহরে গ্রামে, বৃহৎ শিল্প মাঝারি শিল্প, সেবা খাত, কৃষি খাত সর্বত্র এটা বিস্তৃত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহ। আমরা প্রযুক্তিবিমুখ জাতি নই। যেমন, মোবাইল ফোনের ব্যবহার গ্রামে-গঞ্জে, উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। করোনার সময় স্মার্ট ফোনের ব্যবহার আরও বেড়েছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহ সর্বস্তরে দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে যেটি আমরা কল্পনাও করিনি। যেমন, কৃষিতে বর্গা চাষের ক্ষেত্রে আগে কেবল ভাগ চাষ প্রথাই চালু ছিল। অর্থাৎ আপনি যদি জমির মালিক হন, আপনি বর্গায় দিলে ফসল উৎপাদনের পর ভাগের ফসল (সাধারণত মোট উৎপাদনের অর্ধেক) আপনাকে দিবে। কিন্তু এখন ভাগ চাষ প্রথার পরিবর্তে লিজ প্রথা চালু হয়েছে। এর ফলে কৃষিতে অনেক বহুমুখি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। গরীব কৃষকরা এমনকি ভূমিহীনেরাও এখন নগদ টাকা দিয়ে জমি চাষের জন্য লিজে নিচ্ছেন।

নারীদের প্রগতি অর্থনীতির প্রগতিকে কীভাবে ত্বরান্বিত করেছে সেটিও বলতে হয়। নারীদের উন্নয়ন বাংলাদেশের উন্নয়নের পিছনে একটি বড় কারণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। শ্রম বাজারে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বশেষ বিষয়টি হলো রেমিটেন্স এবং স্থানীয় শিল্পায়নের সাফল্য। রেমিটেন্স আমাদের স্থানীয় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। যারা প্রবাস থেকে নিয়মিত অর্থ পাঠান তাদের অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা গরীব শ্রমিক। এদেশের ভাগ্য-পরিবর্তনে গরীব জনগোষ্ঠীই বড় ভূমিকা রাখছে। সেটা কৃষি খাত থেকে শুরু করে শিল্প খাত ও রেমিট্যান্স সর্বত্র দৃশ্যমান। কিন্তু তাদের কি সেই অনুপাতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে?

৫. নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও কতগুলো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। প্রথমত, করোনা-পরবর্তী সময়ে পূর্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা ধরে রাখা যাবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ইউক্রেন-রাশিয়া পরিস্থিতি আমাদের সাফল্যকে শঙ্কার মধ্যে ফেলতে পারে। এ অনিশ্চয়তার মূলে আছে কৃষিকে আরও বেগবান করার চ্যালেঞ্জ। রেমিটেন্সের হার গত এক-দেড় বছর ধরে কমছে, এটিকে আবার ঊর্ধ্বমুখী করার অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে হবে। সুখের বিষয় হচ্ছে, এই অনিশ্চয়তার কালেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল বেশ উঁচুতে। কিন্তু করোনা ও ইউক্রেন পরিস্থিতির কারণে উন্নত বিশ্বে রিটেল সেল বেশ খানিকটা কমে গেছে, যার একটা বড় অংশই আমাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের বাজার। ফলে স্বল্পমেয়াদী সময়ে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে চাইলে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আরও উৎসাহিত করতে হবে। ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে বিদেশি বিনিয়োগের ওপর। কিন্তু বাংলাদেশ জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে পাচ্ছে। আমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো অনেক ব্যয়সাপেক্ষ এবং শুধু সরকারি বিনিয়োগে সবগুলো তৈরি করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো আমাদের সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে না। গত এক দশক ধরে এটি সামান্যই বেড়েছে। এর মূল কারণ হলো আমাদের লো ট্যাক্স জিডিপি রেশিও, যা ৭-৮ শতাংশ। এই অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্নে। এটি বাড়াতে না পারলে আমরা সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য গণপরিবহন নিশ্চিত করতে পারব না। এ ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা রাজস্ব-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের অভাব। ভারতের কেরালায় বাজেটের এক তৃতীয়াংশ লোকাল লেভেলে বরাদ্দ করা হয়। আমরা সেটি করতে পারিনি। এটি করা গেলে প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যেত এবং দরিদ্ররা সুবিধা বেশি করে পেত।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের নগরমুখী জনসংখ্যা হারের বৃদ্ধি। আমাদের এখন বড় শহর, ছোট শহর এবং গ্রাম এদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা দরকার। এটি করা গেলে মানুষ সকালে কর্মস্থলে যোগ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা আবার নিজের গ্রামে বা শহরে ফিরে যেতে পারবে। বর্তমানের মডেলটি অনেক বেশি একটি-দুটি বড় শহরকেন্দ্রিক। ঢাকাকে গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার ইত্যাদি দিকে প্রসারিত করে আরও প্রবৃদ্ধি সক্ষম করে তুলতে হবে। বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হবে ছোট-মাঝারী শহরগুলোকে।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, আমাদের উৎপাদন খাতে যার প্রভাব এসে পড়ছে। কখনও বন্যা কখনও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমাদের এখন জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু পলিসি নিতে হবে এবং মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

পঞ্চম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সুশাসন ও গণতন্ত্রায়নের সমস্যা। আমি সেই দলে পড়ি, যারা মনে করেন যে, সুশাসনের সর্বস্তরে উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষের 'চাহিদা' বাড়বে প্রকৃত সুশাসনের জন্য। এখন মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্তনিজের ভাগ্য পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত ঊর্ধ্বমুখী সচলতা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত। এ পর্যায়ে দেশ-দশ বা 'কমন গুডস' নিয়ে তার ভাবার সময় বেশি নেই। সেজন্যেই সুশাসনের জন্য 'ভয়েস' দানা বাঁধছে না। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত যখন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করবে–যখন তার অনুপাত ৩০-৩৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে–তখন একটি গুণগত পরিবর্তন আসবে এক্ষেত্রে। সেই সোপান খুব বেশি দূরে নয়।

সবশেষে বলতে হয়, আমাদের দেশটি বিশ্বের সপ্তম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ। পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হচ্ছে রাশিয়া, যেটি ভৌগলিকভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ। এরকম একটি বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে এখনও এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে। এটিকে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমার মতে, আমাদের এখন বিভাগ পর্যায়ে সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ একটি ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। আমাদের আটটি বিভাগ আটটি বিভাগীয় সরকার হিসেবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় (যেমন, অর্থ, বৈদেশিক নীতি ও প্রতিরক্ষা) নিয়ে কাজ করবে আর বেশ কিছু বিষয় থাকবে বিভাগীয় সরকারের হাতে। এ ধরনের একটি নীতিমালা নিলে আগামী দশ বছরে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের সাথে মানসই সুশাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এর জন্যে চাই বৃত্তের বাইরে গিয়ে চিন্তার সাহস ও সামর্থ্য।

বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বিআইডিএস

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ৫০ বছর

ড. মোহাম্মদ হাননান

প্রাককথা

১। ১৮০০-১৯৪৭। 'বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ৫০ বছর' কথাটি এ ধারার মূল্যায়নে একটি খণ্ডিত পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যার বয়স কমছে-কম আড়াইশত বছরেরও বেশি। ইউরোপীয় ধাঁচে এদেশে ছাত্র আন্দোলন প্রথম সংগঠিত হয়েছিল তারিখ গুণে গুণে বলা যায় ১৮৩০ সালে। তবে ১৮৩০ সালের আগেই এদেশের ছাত্রসমাজ সংগঠিত হচ্ছিল বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদিকে ঘিরে। অনেক সামাজিক সংগঠন, এমনকি শিক্ষা বিষয়ক সংগঠনও তখন বঙ্গদেশে গড়ে উঠছিল, যার প্রাণ ভ্রমরা ছিল ছাত্ররাই।[১]

এদেরই একটি দল ১৮৩০ সালে কলকাতায় 'অকটরলনি মনিউম্যান্ট' (monument) নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ থেকে ইংরেজদের 'বিজয় পতাকা'টি অপসারণ করে সেখানে ফরাসি বিপ্লবের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। এর তাৎপর্য ছিল খুব গভীর। ছাত্ররাই সে সময়ের একমাত্র গোষ্ঠী যারা ফরাসি পতাকা উড়ানোর মাহাত্ম্য জানত। ভারতবর্ষ 'জয়' করেছে ইংরেজরা, এটা ছাত্ররা কখনো মানতে পারেনি। আর বাংলা-ভারতের তো সে সময় কোনো পতাকাও ছিল না। তাই ফরাসি পতাকা। ফরাসি পতাকা তখন দেশে দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত হতে শুরু করেছে।[২] সেই ঊষাকালের ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্ররাজনীতি এভাবে শুরু হলো স্বাধীনতার স্পৃহাকে সামনে রেখে।

এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না যে, এ ছাত্ররাই পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকাটি প্রথম উত্তোলন করবে। বরং এমনটা বলাই সঙ্গত হবে যে, বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির ধারা প্রথম থেকেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই এগিয়ে গেছে। ১৮৩১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল নামে একটি পত্রিকায় একজন ছাত্রের একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল, যাতে লেখা ছিল, "একথা ইংরেজদের মনে করার অধিকার কে দিয়েছে যে তারা ভারতবর্ষ জয় করার আগে এদেশ বর্বরতায় ভরা ছিল? ... ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলে, তবেই ভারতবাসীর দুর্গতি মোচন সম্ভব হবে।"[৩]

এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, ছাত্ররা প্রথম থেকেই স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে আসছে এবং ওই সময়টা পর্যন্ত এ বিষয়ে ছাত্ররাই একমাত্র শক্তি। কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, লেখক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একদল তখন পর্যন্ত সমাজ সংস্কার নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করেছে, আরেকদল ইংরেজদের ঘনিষ্ঠজন হওয়ার মিছিলে ব্যস্ত ছিল। এর একটা খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখি, ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহীরা বিদ্রোহ করে বাংলা-ভারতে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে রক্ত দিচ্ছে, তখন কলকাতা কেন্দ্রিক সকল শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাই এর নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে, অথবা নিবন্ধ লিখেছে। মহামতি কার্ল মার্কস যখন এ সিপাহী বিদ্রোহকে এ উপমহাদেশের 'প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম'[৪] শিরোনামে অভিহিত করেন, তখন 'প্রগতিশীল' বলে একদল ইতিহাসবিদ লেখক–বুদ্ধিজীবীরও টনক নড়ে। সুতরাং বাংলা-ভারতে তখন পর্যন্ত ছাত্ররাই ছিল একমাত্র শক্তি যারা ইংরেজ বিরোধিতা, স্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি নিয়ে নিরন্তর লড়াই করে গেছে। এটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আপসহীনভাবে অব্যাহত ছিল।

তবে ১৯৪৭-পূর্ব কলকাতা রাজনীতি নিয়ে যতোটা সরগরম ছিল, ঢাকা ততোটা ছিল না। বরং তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বরিশাল, যশোর, নেত্রকোনার চেয়েও ঢাকা ছিল আপোক্ষাকৃত সরগরমহীন। কলকাতার সংবাদপত্র ও বুদ্ধিজীবীরা এমনিতেই ঢাকাকে 'দাঙ্গার শহর' বলে প্রচারণা চালাতো। কিন্তু এর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এমনকি এগুলো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট দাঙ্গাও ছিল না। ঢাকায় প্রতিবছর দাঙ্গা হতো মহররম ও জন্মাষ্টমির মিছিলকে কেন্দ্র করে। মহররমের মিছিল ছিল শিয়াদের আর তা মুসলিম সমাজের মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কিতও ছিল না। ঢাকার ছাত্রসমাজ কখনোই এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

তবে ঢাকায় অনেকবারই নেতাজি সুভাষ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মার-দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। কমিউনিস্টরা নেতাজি সুভাষ বসুকে জাপান সম্রাটের কুকুর মনে করতো। এটা ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের কমিউনিস্ট–বিরোধী করে তোলে। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ কমিউনিস্টরা পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে জাপান-জার্মান ও সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মিছিল করলে নেতাজি বসুর সমর্থকরা কমিউনিস্টদের ধাওয়া করে। এতে তরুণ ছাত্রনেতা ও লেখক সোমেন চন্দ নিহত হন।[৫] এরপর অবশ্য ১৯৪৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে দাঙ্গার শিকার হয়ে নজির আহমেদ নামে এক ছাত্র নিহত হয়েছিল। তবে এগুলো ছিল খুব ব্যতিক্রম ঘটনা।

১৯৩৬ সালে কলকাতায় জনপ্রিয় ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের নেতৃত্বে যখন শ্রীপদ্ম মনোগ্রাম ও বন্দে মাতরম সংগীতের বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্রসমাজ আন্দোলন করছে, তখনো ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজকে এ আন্দোলনে শামিল করা যায়নি। ঢাকার রাজনীতি তখন ভাগ ছিল জিন্নাহ না কি ফজলুল হক (শেরে বাংলা)–এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। ফজলুল হক কখনো মুসলিম লীগ করেননি, তাঁর আলাদা দল ছিল কৃষক প্রজা পার্টি, কিন্তু ঢাকার ছাত্রদের মধ্যে তাঁর আলাদা ভাবমূর্তি ছিল। ঢাকায় জিন্নাহও জনপ্রিয় ছিলেন, কারণ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সারা ভারতে যে পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল, তাতে ঢাকার ছাত্রসমাজ পিছিয়ে ছিল না। এ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একটা গ্রহণযোগ্যতা ঢাকার ছাত্ররাজনীতিতে প্রথম থেকেই ছিল।

প্রাককথা

২। ১৯৪৭-১৯৭১। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর ঢাকার ছাত্ররাজনীতি প্রত্যাশার ঠিক বিপরীতে অবস্থান নেয়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম লীগ এবং তাদের নেতাদের পেছনেই ছাত্রদের থাকার কথা ছিল। দল তো তখন একটিই ছিল, পাকিস্তান মুসলিম লীগ। কিন্তু ভাষা বিতর্ককে সামনে করে ঢাকার ছাত্রসমাজ এককভাবে উর্দুর বিপক্ষে এবং বাংলার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এসব ছাত্র যে সবাই রাজনীতি-সচেতন গোষ্ঠী ছিল এমনটা কিন্তু নয়, বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসাই তাদের মাঠে নামতে বাধ্য করে। পূর্ব বাংলায় তৎকালীন বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মাথায় ছিল সেসময় 'নির্বাচন'। তাঁরা চাচ্ছিলেন যে করেই হোক পূর্ব বাংলায় নির্বাচন হয়ে যাক, কোনো বাহানায় যেন পাকিস্তানিরা নির্বাচন বাতিল না করে দেয়। কিন্তু ঢাকার ছাত্রসমাজের এসব ভাবনার সময় ছিল না। তারা ছিল দৃঢ়তর একটি গোষ্ঠী, যাদের পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল বা অভিভাবকও ছিল না। ফলে ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে সংগঠিত ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজই এককভাবে নেতৃত্ব দেয় এবং সফলতাও লাভ করে। ১৯৫৪ সালে বাঙালি নেতাদের নির্বাচনে জিতিয়ে আনার পেছনেও ছাত্র সমাজের অনন্য ভূমিকা ছিল। ১৯৫৮ সালে তো সামরিক শাসন জারি হয়ে গেল। এই প্রথম এ অঞ্চলের ছাত্ররাজনীতি হোঁচট খেল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ছিল, তবে সাংগঠনিকভাবে তারা তখন রাজনৈতিক দলভুক্ত। ১৯৪৭ পরবর্তী মুসলিম ছাত্রলীগ এখন অস্তিত্বহীন। এর থেকে বের হয়ে আসা ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তখন নবউদ্যমে বলিয়ান। নতুন সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নও তখন নতুন ধারার রাজনীতি নিয়ে দৃশ্যে আবির্ভূত। এ দুই শক্তির মিলিত উত্থানে ১৯৬২ সালে পরপর তিনটি ছাত্র আন্দোলন ইতিহাসের পট ও নট পরিবর্তনে পূর্বাভাস সৃষ্টি করে। আইয়ুবের সামরিক শাসন, শাসনতন্ত্র এবং শিক্ষানীতি বাতিলের আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন সূর্যোদয়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার আগ পর্যন্ত (১৯৬২-১৯৬৬) ছাত্ররাই এ অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয়দফা ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররাজনীতিকে বিভক্ত করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছিল ছয়দফার মুখ্য প্রচারক এবং সারাদেশে তারা ছয়দফাকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের প্রচারে ছয়দফা জনমনে মুক্তির বারতা লাভ করে। তবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ছয়দফার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে ভাসানী ন্যাপের ছয়দফা বিরোধী ভূমিকার কারণে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ছয়দফা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা একে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র দলিল বলে আখ্যায়িত করে। ছয়দফা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের অবস্থান অনেকটা ভারসাম্য অবস্থায় ছিল। ছয়দফা বাঙালির মুক্তিসনদ, তবে এর কর্মসূচি অসম্পূর্ণ, এমনটাই তারা বলতো।[৩]

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী অবস্থা অনেকটা এরকমই ছিল। তারপরও গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতি ছাত্রসমাজকে একত্রিত করে, এমনকি জেনারেল আইয়ুব ও গভর্নর মোনায়েম খানের ছাত্র সংগঠন এনএসএফ-ও এ বৃহত্তর ঐক্যে অংশ নেয়। ছাত্ররা যে এগারদফা রচনা করে তাতে ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের সামরিক কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি বাংলার ছাত্রসমাজই প্রদান করে। এভাবে ছাত্ররাজনীতি দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতেই যুক্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ববর্তী এ ধারা অব্যাহত ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি নতুন ভূখণ্ড দুনিয়ার বুকে ফুটে ওঠার চিহ্নকে পরিস্ফুট করে। ছাত্রসমাজ এ সুযোগকে ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিল। যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করলো, তখন ছাত্রসমাজই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান সহায় হয়ে উঠে। ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মতো স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবসমাজই যুদ্ধ ও লড়াইয়ে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল।

মূলকথা

১। ১৯৭২-২০২২। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যে স্বাধীন দেশ দুনিয়ার মানচিত্রে ভেসে উঠলো, সেখানে ছাত্র সমাজের কাছে নতুন কর্তব্য হাজির হয়। এতকাল পাকিস্তানি শোষণ ও দখলের বিরুদ্ধে যে ছাত্রসমাজ লড়াই করেছে, তাদের কাছে স্বাধীন দেশ গঠনের দায়িত্বটি ছিল একটি পবিত্র কর্তব্য। এ প্রশ্নে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। একটি ভাগ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে, যার পুরোভাগে থাকে ছাত্ররাই। তাদের, সাইনবোর্ডে তারা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে যায় ছাত্রলীগের যে অংশ তা পরবর্তীকালে 'মুজিববাদী ছাত্রলীগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ থাকে, তবে তা হবে মুজিবের আদর্শ অনুযায়ী।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এ পরিস্থিতিতে গোলক ধাঁধায় পতিত হয়। এতকাল তারা সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিলেও নবউত্থিত সমাজতন্ত্রীদের মোকাবিলা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু'র নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সমাজের একটা ম্যান্ডেট লাভ করে, তথাপি 'এই মুহূর্তেই সমাজতন্ত্র' গরম-গরম এমন স্লোগানের কাছে তারা পিছিয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস' নামে একটি মিছিলে গুলি চললে এর প্রতিক্রিয়া মোকাবিলা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রলীগ এবং 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নামীয় ছাত্রলীগ দ্বারা তারা যুগপৎ আক্রান্ত ও সমালোচিত হয়ে 'দেশ গঠন' নামক কর্মসূচি ও স্লোগান থেকে ফিরে আসে।

এ সময় ক্ষমতাসীন মুজিববাদী ছাত্রলীগের নেতৃত্বও স্বাধীনতা বিরোধীরা নিয়ে নেয়। মুজিববাদী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয় পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতা গমিরউদ্দিন প্রধানের ছেলে শফিউল আলম প্রধান। তার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন ছাত্রলীগের একটি অংশ সশস্ত্র গ্রুপে পরিণত হয়, যার ফলে ১৯৭৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ৪ জন ছাত্র এবং ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ৭ জন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়। যদিও খুনের অপরাধে শফিউল আলম প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল,[৭] তথাপি এসময় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ছাত্ররাজনীতির এ পৈশাচিক ধারায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

সারাদেশেই তখন ছাত্ররাজনীতি একটি কুটিল প্রবাহে প্রবহমান ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংগঠনগুলোর দাপটে আন্তঃসংঘর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। বাংলাদেশে একটি নেতিবাচক পট পরিবর্তনের আগাম চিহ্ন এসবে সূচিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে এ পরিবর্তনটি স্পষ্ট হয়। ঠিক পাকিস্তানি-আদর্শে আবার বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন হয় এই সময়টায়। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি এ সময় গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় অন্য কারণে। চীনপন্থী বলে পরিচিত ছাত্র সংগঠনগুলো এবং জাসদপন্থী ছাত্রলীগ এ সময় জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এদের থেকে বাছাই করা ছাত্র নেতাদের দিয়েই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে বিএনপি-র ছাত্র সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু অকস্মাৎ জেনারেল জিয়া আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে নতুন সামরিক শাসক হিসেবে জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের আগমন ঘটে। এ সময়ও 'প্রগতিশীল' বলে কথিত ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সামরিক শাসকদের আঁতাত গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসে এ মুহূর্তগুলো এতটা কলঙ্কজনক যে সামরিক শাসকরা ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদের মতো নেতাদের মন্ত্রীত্ব অথবা দূতাবাসের 'থার্ড সেক্রেটারি'-র মতো পদের লোভ দেখিয়ে কিনে নিতে সমর্থ হয়।[৮]

এরকম পরিস্থিতিতে ছাত্ররাজনীতি আত্মহননের অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। ছাত্ররাজনীতির মতো দেশের রাজনীতিবিদদের অনৈতিক আচার, ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ দেশে এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে। বামপন্থী বলে পরিচিত কাজী জাফর আহমেদ, সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ সামরিক শাসকদের সঙ্গী হতে দ্বিধা করেনি। ফলে জেনারেল এরশাদের মতো অপ্রিয় একজন শাসক দীর্ঘ দশবছর একটানা দেশ শাসন করে গিয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি জেনারেল এরশাদকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল এবং ১৯৯০ সালে একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু লাগাতার ১৫ বছর (১৯৭৫-১৯৯০) সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়া ছাত্ররাজনীতিতে অশুভ ফল নিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রাবাস অঘোষিত 'ক্যান্টনমেন্ট'-এ পরিণত হয়। দিনের পর দিন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অস্ত্রের মহড়া ছাত্ররাজনীতিকে কলুষতার চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিরোধী ছাত্রনেতারাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় খুন, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদিতে অভিযুক্ত হয়। ১৯৮৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা মাহবুবুল হক বাবলু, সানাউল হক নীরুকে অস্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার মুক্তি দাবি করে বিবৃতি দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে নীরুর মুক্তির দাবিতে ছাত্রদল আয়োজিত অনশন ধর্মঘটেও তিনি অংশ নেন। ১৯৮৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক চিঠিতে সন্ত্রাসী ছাত্রনেতা সানাউল হক নীরু, ইলিয়াস আলী ও গোলাম ফারুক অভিকে ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে নিতে বেগম খালেদা জিয়াকে অনুরোধ করে। কিন্তু বিএনপি এ চিঠি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভি পুলিশের কাছে এক জবানবন্দিতে বলেছিল, 'রাজনৈতিক দল বিএনপি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সিনিয়র শিক্ষক তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তাকে দিয়ে অস্ত্র ব্যবহার করিয়েছে'।[৯]

ছাত্ররাজনীতির এ অবস্থার সময়ে ছাত্রদের লেখাপড়া লাটে ওঠে। ১৯৮২-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬৩ দিন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে ২৭১ দিন সরকার ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখে। ছাত্র ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দলের হরতালের কারণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকে ৯২ দিন।[১০] অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৭২ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যেই ৫২টি হত্যাকাণ্ড ঘটে।[১১] নিহতদের মধ্যে ৩৬ জন ছিল ছাত্র। নিহত ছাত্রদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা ছিলেন ১০ জনের মতো। একজন ছাত্রনেতা নিজেই তার ছাত্রাবাসের কক্ষে বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে বহিরাগত সন্ত্রাসীরাও ছিল। এদের হাতে 'টোকাই' নামে পরিচিত একজন এতিম কিশোর নিহত হয়। এ তালিকায় ছিলেন একজন রিকসাওয়ালাও। সন্ত্রাসীদের গুলিতে (২০০০ সালের ২রা জুলাই) একটি গরুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিহত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, লড়াই, খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি বেশির ভাগই ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তঃকোন্দলে সংঘটিত হয়েছে। প্রতিপক্ষের আক্রমণেও অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সরকার বিরোধী আন্দোলন করে নিহত হয়েছে অল্প সংখ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সংঘটিত ৬৩টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ৭টি স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার আমলে। এই ৭টি খুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছিল একই রাতে ছাত্রনেতা শফিউল আলম প্রধান দ্বারা। ৪টি হত্যাকাণ্ড ক্যাম্পাসে হয়েছিল সামরিক শাসক জেনারেল জিয়ার আমলে। জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও তৎকালীন সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন সংঘর্ষে নিহত হয় ১৭ জন। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, এসময়ে ক্যাম্পাসে ২৪ জন নিহত হয় বুলেটবিদ্ধ হয়ে। শেখ হাসিনা সরকারের চার বছরের (১৯৯৬-২০০০) শাসনামলে ক্যাম্পাসে ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গঠিত বিভিন্ন অস্থায়ী সরকারের আমলেও ৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। ক্যাম্পাসে নিহত ছাত্রদের মধ্যে ছিল ছাত্রলীগের ২২ জন, ছাত্রদলের ১২ জন, জাসদ ছাত্রলীগের ২ জন। এরমধ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ৬ ছাত্র নিহত হয়েছে। অপরদিকে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৮ জন নিহত এবং ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৮ জন ছাত্র নিহত হয়েছিল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১৪ জন। আবার 'কে কত বড় মাস্তান' এ নিয়ে বিতর্কে ১৯৮৭ সালে নিহত হয় ছাত্র-নামধারী ২ গুণ্ডা।

১৯৯৯ সালে ৮ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩৭ দিন ক্লাস হয়েছিল। ২৪৩ দিনের মধ্যে ২৩৬ দিনই ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে হানাহানি হয়েছে এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে রাজশাহী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও। ছাত্ররাজনীতির এ হাল দেখে ২০০০ সালে দেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অভিযোগ করেন, 'নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে'। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও এজন্য দায়ী করেছিলেন। তাঁর অভিযোগে তিনটি বিষয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ : ১. শিক্ষকরা ক্লাসরুমে শিক্ষা দেওয়ার চাইতে প্রাইভেট টিউশনিতেই বেশি আগ্রহী ২. গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা বেশির ভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন ৩. শিক্ষকরা অতিমাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এ অভিযোগ করেছিলেন ১৩ই নভেম্বর ২০০০ সালে। এ সময় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী দিবসে বক্তৃতা করছিলেন। রাষ্ট্রপতি এ সময় আরও অভিযোগ করেন, 'ছাত্রদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে"।[১২] এর আগে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১১ই নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ঢাকার নটরডেম কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও অনুরূপ অভিযোগ করে বলেছিলেন, "কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতির নামে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়ানো হচ্ছে।"[১৩]

এর একবছর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, "ছাত্রনেতারা রাজনীতিকে খুব লাভজনক পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। এর সাহায্যে ছাত্রনেতারা অল্পসময়ে

কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। যদি লেখাপড়া না করে সন্ত্রাসমুখী ছাত্ররাজনীতি করে বিত্তবান হওয়া যায়, এমনকি মন্ত্রী-এমপিও হওয়া যায়, তাহলে কষ্ট করে লেখাপড়া করতে যাবে কে?"[১৪]

এ সময় প্রকৃতপক্ষে কিছু ছাত্রনামধারী সশস্ত্র তরুণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে রেখেছিল। এরা বিভিন্ন পয়েন্টে টোল আদায় করে নিত এবং নির্মাণ কাজে চাঁদাবাজি করতো। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার সঙ্গেও তারা জড়িত থাকে। অনেক ছাত্রনেতাই দামি দামি গাড়ি হাঁকায় এবং নগরের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। এসব ঘটনা বাংলাদেশের গৌরবময় ছাত্ররাজনীতিকে কালিমালিপ্ত করে এবং ছাত্র সংগঠনগুলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সরকারি ও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা পরস্পরিক যোগসাজশে এসব অপকাণ্ডে দীর্ঘদিন থেকেই জড়িত রয়েছে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির কলুষিত চরিত্রের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অছাত্র দ্বারা ছাত্ররাজনীতি পরিচালিত হওয়া। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক শ্রেণির ছাত্রনেতা সংগঠনের নেতৃত্ব দখল করে রাখে। নিজ নিজ মূল রাজনৈতিক সংগঠন থেকে তাদের টিকিয়েও রাখা হয়। একটি দৈনিক এ বিষয়ে আলোকপাত করে এসব অপছাত্ররাজনীতির প্রতিবাদ করেছিল :

"বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্রসংগঠনগুলো একটি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। সে কারণে দেশের ছাত্রসংগঠনগুলোর গঠনপ্রণালী ও তাহার নেতৃবর্গ দেশের সর্বত্র আলোচিত হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি ইত্তেফাকে একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, প্রধান ছাত্রসংগঠনগুলির নেতৃবর্গের মধ্যে মাত্র দুই-তিনজন একটি বিষয়ে পাস করিয়া অন্য একটি বিষয়ে ভর্তি হইয়া কিংবা পুনঃ পুনঃ ভর্তি হইয়া ছাত্রদের খাতায় নাম রাখিয়াছে। অবশিষ্ট সকলে অনেক বছর আগে ছাত্রত্ব হারাইয়াছে, কিন্তু সংগঠনের নেতৃত্ব ছাড়ে নাই। ছাত্র না-হইয়াও তাহারা ছাত্রনেতা। যাহারা ছাত্র, তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইতেছে সেইসব ছাত্র না-থাকা নেতৃত্বের।

অনেকে মনে করেন, ছাত্রদের নেতৃত্বে অছাত্ররা থাকার ফলে বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতি বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত হইয়াছে। ছাত্র-রাজনীতি আর ছাত্র-রাজনীতি থাকে নাই। ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করার, আবার কোনো কোনো মহল হইতে রাজনৈতিক দলের সহিত ছাত্র-সংগঠনের সরাসরি সংস্রব ত্যাগের দাবি উঠিয়াছে। ব্যাপারটি যেহেতু এখন আর বিচ্ছিন্ন রাজনীতি নয়, ইহার সঙ্গে দলীয় রাজনীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাই বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী সকলের সম্মিলিত মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

তবে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অছাত্র অছাত্রই। তাহারা ছাত্রনেতা হইবার কোনো যোগ্যতা রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয় আইনেই থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল, যে ছাত্র হিসাবে একজন ডাকসু বা হল-সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছে, ছাত্রত্ব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে তাহার নির্বাচিত সদস্যপদ চলিয়া যাইবে। একককইভাবে ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতে রাখার জন্য নিয়মিত ছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব বহাল রাখার বিধান ছাত্রসংগঠনের গঠনতন্ত্রে থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। এই ব্যবস্থা ডাকসু, হল সংসদ ও সংগঠনতন্ত্রে না-থাকায় ছাত্রদের নেতৃত্ব অছাত্রদের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাস-সমর্থিত ছাত্র-অছাত্ররা ছাত্রনেতা হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, অতীতে ছাত্রসংগঠন ছিল রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মী তৈরির একটি পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান। বর্তমান ব্যবস্থায় ছাত্রসংগঠন ও ছাত্র সংস্থার নেতৃত্বে অছাত্র ও সন্ত্রাসীরা চলিয়া আসায় এখন হইতে আর রাজনৈতিক কর্মী তৈরি হইতেছে না। আমরা জাতীয় স্বার্থে বিষয়টি ভাবিয়া দেখার জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবকদের অনুরোধ করি। গোটা পরিস্থিতিতে ছাত্র ও অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ। তাহাদের মধ্যে যাহারা পারিতেছে সন্তানদের প্রতিবেশী দেশসহ বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিতেছে। ইহা সরকার, রাজনীতিক ও শিক্ষকদের প্রতি একটি বড় অনাস্থা এবং দেশের ভবিষ্যতের জন্য ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর।"[১৫]

দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীও এ সময় ছাত্ররাজনীতির অপব্যবহার সম্পর্কে সরব হয়ে ওঠেন। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান এসময় একটি অনুষ্ঠানে অভিযোগ করেন, "বর্তমান সময়ের ছাত্ররাজনীতি কোনো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী অস্ত্রধারী তাদের ব্যবসা কার্যক্রম চালানোর জন্য ছাত্ররাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।"[১৬]

১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এ ব্যাপারে সরব হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ছাত্ররাজনীতি যে দেশের শিক্ষা পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং ছাত্রদের অধিকারের ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা কমিশন উপলব্ধি করে এবং সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে দেয়।[১৭]

বস্তুত বিগত ৫০ বছরে ছাত্ররাজনীতি এমন সত্যতা ও বাস্তবতার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে এবং এখনো খাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে রাজনীতিকে ব্যবহার করে আসছে। অথচ এর বাইরে দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি কতকগুলো ইতিবাচক দিকে মোড় নিচ্ছিল। ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগ ছাড়িয়ে যায়।[১৮]

নতুন শিক্ষানীতি বাস্তাবায়নে ৩০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রণীত হয়।[১৯] নারী শিক্ষার হার ৩ গুণ বাড়ে এ সময়টায়।[২০] যদিও শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছিল[২১] এবং বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমে আসছিল। ১৯৯০-১৯৯৭ পর্যন্ত ছয় বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে শতকরা ১৭ ভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শতকরা ৯ ভাগ বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমে যায়। ১৯৮৯ সালে এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল শতকরা ৪১ দশমিক ৬১ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে শতকরা ২৩ দশমিক ১৮ ভাগ। ১৯৯০ সালে এসএসসি পর্যায়ে ৪২ দশমিক ৪২ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ২৪ দশমিক ৮৭ ভাগ, ১৯৯১ সালে এসএসসি পর্যায়ে ৪৩ দশমিক ১৯ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ২৪ দশমিক ৪৮ ভাগ, ১৯৯২ সালে এসএসসি পর্যায়ে ৩৬ দশমিক ২০ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ২২ দশমিক ৫২ ভাগ, ১৯৯৩ সালে এসএসসি পর্যায়ে ২৮ দশমিক ৩১ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ২৪ দশমিক ৫৯ ভাগ, ১৯৯৫ সালে এসএসসি পর্যায়ে ২৭ দশমিক ১০১ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ১৬ দশমিক ৬৯ ভাগ, ১৯৯৬ সালে এসএসসি পর্যায়ে ২৪ দশমিক ৩ ভাগ ও এইচএসসি পর্যায়ে ১৪ দশমিক ২ ভাগ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ছিল। এ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মাত্র ৬ বছরে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এসএসসি অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে শতকরা ১৭ ভাগ কমে গিয়েছিল। একইভাবে এইচএসসি অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শতকরা ৯ ভাগ কমে যায়।[২২]

অথচ এর বিপরীতে কোনো ছাত্র আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশে সংঘটিত হয়নি। ১৯৯০ সালের পর ছাত্র-শিক্ষা বিষয়ক কোনো ঘটনাতেই ছাত্ররাজনীতি বা ছাত্র আন্দোলন কার্যকর ছিল না। এ সময়গুলোতে একটি ছাত্র আন্দোলনও সংঘটিত হয়নি। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের 'সূর্যাস্ত আইন' বিরোধী আন্দোলনও কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। ছাত্রীরা নিজেরাই এ আন্দোলনের সূত্রপাত করে এবং বিজয় লাভ করে। ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রীবাসে ছয়টি আন্দোলন হয়। রোকেয়া হলের প্রভোস্ট বিরোধী আন্দোলন, শামসুন্নাহার হলে কাঁটাতারের গেট বিরোধী আন্দোলন, ফয়জুন্নেসা ও কুয়েত মৈত্রী হলে ওয়ার্ডেনের দুর্ব্যবহার বিরোধী আন্দোলনেও ছাত্র সংগঠনগুলোর বিবৃতি ছাড়া কোনো ভূমিকা ছিল না। ২০১৩ সালে 'শাহবাগ আন্দোলন' খ্যাত ছাত্র-যুব আন্দোলনেও ছাত্র সংগঠনগুলোকে এড়িয়ে ব্লগাররা নেতৃত্ব দেয় যার পরিণতি পরে বুমেরাং হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে না থাকার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে কোটা বিরোধী আন্দোলনেও সাধারণ ছাত্রসমাজই নেতৃত্বে দিয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানিয়েছে মাত্র।

বরং ছাত্র সংগঠনগুলো এসময় নানা কারণে শিক্ষা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বারবার। ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, মিছিল এবং এ জাতীয় কর্মসূচিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের সমর্থন ছাড়াই তটস্ত রেখেছে। ১৯৯৯ সালের ১৩ই অক্টোবর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য নামে চীনপন্থী বাম ছাত্র সংগঠনগুলো এবং ১৪ই অক্টোবর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একই বিষয়ে পরপর দুদিন ছাত্র ধর্মঘট ডাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ দুদিনের পূর্ব-নির্ধারিত পরীক্ষা কর্মসূচি চলমান রাখে এবং পরীক্ষাকে ছাত্র ধর্মঘটের বাইরে রাখার অনুরোধ করে। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকি যে কোনো মূল্যে পরীক্ষা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু দেখা যায়, কোনো কোনো বিভাগে ১০০%, কোনো কোনো বিভাগে ৯৮% শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। ধর্মঘটকারী ছাত্র সংগঠনগুলো পরে এ পরীক্ষা বাতিলের আহ্বান জানাতে থাকে। এসব থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো সংস্থায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে ছাত্ররাজনীতিকে পুঁজি করে যে অপরাজনীতি গত ৫০ বছরে চলছে তার মোকবেলা করতেও কার্যত তাদের কোনো উদ্যোগ এবং আগ্রহও নেই।

উপসংহার

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির দীর্ঘদিনের যে ঐতিহ্য ছিল, কালের পরিক্রমায় তা অপশক্তির কারণে মার খেতে চলেছে। একটা সময় ছিল, যখন সমাজের সচেতন গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্ররাই সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বে দিয়েছে। বর্তমানে পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী এবং সুশীল সমাজ পূর্বের তুলনায় অনেক অগ্রসরমান এবং সক্রিয়। সমাজ-রাজনীতিতে তাদের নিয়ত অংশগ্রহণ, ছাত্র সংগঠনগুলোর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে কমিয়ে দিয়েছে। এর একটা নেতিবাচক প্রভাব রাজনৈতিক দলসমূহেও পড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও এখন বড় বড় মিছিল-সমাবেশ করতে পারছে না, ফলে জনসভা, মিছিল ইত্যাদির পরিবর্তে 'মানববন্ধন', 'অবস্থান-ধর্মঘট' ইত্যাদির মধ্যে তাদের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখছে। বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি স্বমহিমায় আবির্ভূত হতে পারবে, যখন তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে ছাত্র সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরতে পারবে। সাধারণ ছাত্রসমাজ যদি রাজনৈতিক পরিচয়বাহী ছাত্র সংগঠনগুলোকে এড়িয়ে নিজেরাই বারবার রাজপথে নেমে আসে, তাহলে এদেশের ছাত্ররাজনীতির মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে।

তথ্য, সূত্র এবং টিকা

১. উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ইউরোপীয় ধাঁচে বিভিন্ন সংগঠন বাংলায় গড়ে উঠতে থাকে। এর মধ্যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, ইয়ং বেঙ্গল ইত্যাদি ছিল অন্যতম। ছাত্রনেতা ও তাঁদের পরামর্শকদের মধ্যে ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র, ডিরোজিও প্রমুখ। বর্তমানে প্রচলিত ছাত্ররাজনীতির বিষয়-আশয়ের সঙ্গে মিল না থাকলেও নৈতিকতা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় এসব সংগঠনে খোলামেলা আলোচনা হতো। এসব বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিও তারা পালন করেতো।

২. ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের প্রভাব দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর প্রতীক পতাকা হিসেবে ফরাসি পতাকাই ব্যবহৃত হতো।

৩. ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ইংরেজ সরকার কিছুদিন পর পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করে দেয়।

৪. মার্কস-এঙ্গেলস : প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭-১৮৫৯), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৪১।

৫. কমিউনিস্টরা নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুকে জাপান সম্রাটের কুকুর হিসেবে আঁকার বিষয়টি জানিয়েছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : কালি ও কলম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

৬. বিস্তারিত দেখুন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮০০-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

৭. ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধানকে সাতজন ছাত্রের খুনের দায়ে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রেফতার করলেও জেনারেল জিয়ার শাসনামলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ২৪শে আগস্ট বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে শফিউল আলম প্রধানের বিচার হয় এবং খুনের দায়ে মাত্র ১০ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি মুক্ত হন।

৮. শুধু ছাত্রনেতারা নন, দলত্যাগের মিছিলে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও হিড়িক পড়ে যায়। এমনকি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে জেনারেল জিয়ার দলে যোগদান করে। এ ব্যাপারে সকলের থেকে এগিয়ে থাকে ভাসানী ন্যাপ। মশিউর রহমান যাদুমিঞার নেতৃত্বে দলটির সকল স্তরের নেতা-কর্মীরা বিশেষ করে ছাত্রনেতারা দল বিলুপ্ত করে জেনারেল জিয়া প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি-তে যোগদান করে।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

১০. বিস্তারিত দেখুন, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৭২-২০০০, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫১২-৫২২।

১১. বিস্তারিত আরো রয়েছে, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৭২-২০০০, পূর্বোক্ত গ্রন্থে। এখানে একটি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে ১৯৭২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ৬২ জন ছাত্র নিহত হয়েছিল। নিহত ছাত্রদের নাম এতে উল্লিখিত রয়েছে।

১২. ভোরের কাগজ, ১৪ই নভেম্বর ২০০০।

১৩. দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১২ই নভেম্বর ১৯৯৯।

১৪. প্রথম আলো, ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮।

১৫. 'অছাত্র ছাত্রনেতা' শীর্ষক দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদকীয় কলাম, ৮ই মে ১৯৯৭।

১৬. ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির চতুর্থ সমাবর্তনে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান 'বাংলাদেশে সরকারি খাতের উচ্চশিক্ষার মান পুনরুদ্ধার' শীর্ষক বক্তৃতায় একথা বলেন। ৩রা জুন ২০০০।

১৭. 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রদ্ধতি' শীর্ষক বিশ্ববিদ্যারয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

১৮. 'বাংলাদেশের শিক্ষায় নতুন দিগন্ত' শীর্ষক প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মার্চ ২০০১।

১৯. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮।

২০. জাতীয় সংসদে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্য, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

২১. 'শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন' নামে একটি সংগঠনের জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-১৯৯৮ সালে ৫০ বছরের ব্যবধানে সর্বোচ্চ বেতন ও ফি বাড়ানো হয়েছিল শতকরা ১ হাজার ৬৬ ভাগ। এটা বার্ষিক ৫২৮ টাকার স্থলে ৫,৬৩০ টাকার সমপরিমাণ।

২২. বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো বেনবেইস, মে ১৯৯৭।

ড. মোহাম্মদ হাননান, লেখক ও ইতিহাস গবেষক

সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ : পরিবেশ ও জলবায়ু

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

স্বাধীনতার পর পরই একটি দেশ তার উন্নয়ন দর্শন নির্ধারণ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনে পরিবেশ উল্লেখিত থাকলেও খুব একটা প্রাধান্য পায়নি। ফলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন, পাহাড়, নদী, পানি, মাটি সবকটিই অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এ বাস্তবতা যে শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা নয়, প্রায় সমগ্র বিশ্বেই উন্নয়ন পরিবেশ বিধ্বংসী পথে এগিয়েছে। প্রায় প্রতিটি দেশই উন্নয়ন বলতে জিডিপি, মাথাপিছু আয় এবং অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির দিকেই নজর রেখেছে; স্বল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া পরিবেশের কথা কেন্দ্রবিন্দুতে বিবেচনায় আনা হয়নি।

বৈশ্বিক পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণে ১৯৭২ সালে পরিবেশ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের স্টকহোমে। স্বাধীনতার পর পরই অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা একটি সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। স্টকহোম ঘোষণাপত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং দূষণের দ্বারা পরিবেশের অবক্ষয়রোধে রাষ্ট্রনায়করা একমত হন।

স্টকহোম ঘোষণাপত্রের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ তার পরিবেশ প্রশাসনকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিবেশ রক্ষায় ১৯৭৭ সালে প্রণয়ন করে পরিবেশ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ। স্বাধীনতার আগেও পানি দূষণ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ নামে একটি আইন ছিল যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, স্বাধীনতার পূর্বেও পানি দূষণ একটা বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের পরিবেশ দূষণ অধ্যাদেশের বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরকে স্থাপন করার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর স্বল্প পরিসরে যাত্রা শুরু করে। আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশ অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে ১৯৮৯ সালে, যা পূর্ণরূপ ও আইনগত স্বীকৃতি পায় ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের মাধ্যমে। এ আইনের মাধ্যমেই শুরু হয় পরিবেশ রক্ষায় আধুনিক ব্যবস্থাপনার সূচনা। ১৯৯৫ সালের প্রণীত আইনটি ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া রিও সম্মেলনের কিছু অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করেছে।

স্বাধীনতার পর একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে দেশের সংবিধানে। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযুক্ত হয়েছে ১৮ক অনুচ্ছেদ, যেখানে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষা করাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানে পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হলেও ১৯৭১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার বেশিরভাগই নেতিবাচক। নদীমাতৃক ও সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বাতাসের দেশের মধ্যে এক নম্বর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বায়ু দূষণের ফলে দেশে প্রতিবছর দেড় লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে, গড় আয়ু কমে যাচ্ছে ৫ বছর ৪ মাস। আমাদের নদীগুলো মারাত্মক দূষণের শিকার; নদীর দেশ-পানির দেশ বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে পানিস্বল্পতা। একদিকে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে নদীর পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় পৌঁছাতে পারিনি, অপর দিকে অদূরদর্শী উন্নয়ন কার্যক্রম আমাদের মাটি, বাতাস আর পানিতে বিষ ঢালছে। জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চিহ্নিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পকে রাষ্ট্র যেন দূষণ-দখলের অধিকার প্রদান করেছে। শুধু যে নদী দূষণ করা হচ্ছে তা নয়; সাথে সাথে জলাধার ভরাটের পরিমাণের দিক থেকে রাজধানী ঢাকা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী একটি স্থান। দখল-দূষণের পাশাপাশি নদীগুলোতে চলছে আরেক তাণ্ডব–নির্বিচারে বালু এবং পাথর উত্তোলন। বালু উত্তোলন, পাথর উত্তোলন, দখল ও দূষণের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো পৃথিবীর সব থেকে দূষিত নদীর তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা নদীমাতৃক দেশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে বাড়তি সুবিধা পাওয়া একটি দেশের জন্য অগৌরবের।

স্বাধীনতার পূর্বে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ বলতে সবুজে-হলুদে আচ্ছাদিত কৃষিজমিকে বুঝতাম। বর্তমানে সেই বাস্তবতা বদলে গেছে। এখন যেকোনো মহাসড়কের পাশে, শহরের কৃষি জমিতে কেবল আবাসন প্রকল্প ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকটু সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, এভাবে চলতে থাকলে ২০৫০ থেকে ২০৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের কৃষিজমি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। ভূমি নিয়ে কাজ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কৃষি ভূমি আছে তার নব্বই ভাগ বিভিন্নভাবে দূষণের শিকার, যার মধ্যে ৪৫ ভাগ মারাত্মকভাবে দূষিত। অর্থাৎ অধিক খাদ্য ফলানোর দৌড়ে আমরা অনিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করছি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থবিরোধী। নির্বিচারে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা জিম্মি হয়েছে মুনাফালোভী কোম্পানিদের হাতে।

স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় পাহাড় বা টিলা ছিল, যার অর্ধেকেই বর্তমানে সমতল হবার পথে। অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের জোয়ারে পাহাড়ি বাস্তুসংস্থান প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। পার্বত্য এলাকার কিছু পাহাড়ছাড়া বাকি সব জেলাতেই পাহাড় কেটে সমান করে ফেলা হচ্ছে। ফলে কেবল যে পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে তা নয়; ভূমিকম্পের দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে আমাদের প্রাকৃতিক একটি রক্ষণব্যুহ আমরা হারিয়ে ফেলছি। এমনকি বারবার আইন করেও থামানো যাচ্ছে না পাহাড়ের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে আবার ক্ষমতাকেন্দ্রিক উন্নয়নের প্রদর্শন চলছে, সেখানে পাহাড় কেটে রাস্তা হচ্ছে, পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে, হোটেল হচ্ছে আর হচ্ছে সেনানিবাস, যা ঐ এলাকার প্রাকৃতিক অবয়বকে অপূরণীয় ক্ষতির মুখোমুখি করছে।

একটি দেশে তার আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বনের পরিমাণ কমতে কমতে একদম তলানিতে ঠেকেছে। বেসরকারি সূত্র মতে, দেশে বনভূমির পরিমাণ মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। যদিও বনবিভাগের হিসাব অনুযায়ী এই পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ। বনবিভাগ নানান রকম কৃত্রিম বনায়নকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বনের আবরণ ১৩ শতাংশের কাছাকাছি দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু তা কোনোভাবেই বনের আন্তর্জাতিক গৃহীত সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে না। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ২০২১ সালের রির্পোট অনুসারে বাংলাদেশে বন উজাড়ের গড় হার ২.৬ ভাগ; যেখানে বৈশ্বিক হার ১.৩ ভাগ অর্থাৎ পৃথিবীর সব দেশের চাইতে আমরা দ্বিগুণ হারে উজাড় করছি প্রাকৃতিক বন। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন)-এর হিসাব অনুযায়ী বন ও জলাশয় ধ্বংসের কারণে দেশের অন্তত ২৬৮ প্রজাতির প্রাণি চরম সংকটের মুখে পড়েছে, যার মধ্যে ৫৬ প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ইতোমধ্যে আমরা ৯% স্তন্যপায়ী হারিয়ে ফেলেছি, হাতি থেকে শুরু করে মুনিয়া পাখি কোনো কিছুই আমাদের উন্নয়নের তাণ্ডবের হাত থেকে বাদ যায়নি।

বিশ্বায়নের প্রভাবে স্বাধীনতার পরে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশ পরিণত হচ্ছে শিল্পনির্ভর দেশে। বিশ্বের অনেক দূষিত শিল্প স্থান করে নিচ্ছে আমাদের ভূখণ্ডে। উদাহরণস্বরূপ, জাহাজভাঙা শিল্পের কথা বলা যায়। শিল্পায়ণের আগ্রাসনে কৃষিজমি সংকুচিত হচ্ছে, ফলে চাপ বাড়ছে ভূগর্ভস্থ ও নদীর পানির ওপর। একইসাথে বাড়ছে ভোগবাদ। স্বাধীনতার সময় পাটশিল্প আমাদের গর্বের জায়গা ছিল কিন্তু এখন পাটশিল্প মৃতপ্রায়। আশেপাশের দেশে পাট শিল্পের নতুন জাগরণ ঘটলেও বাংলাদেশে পাটের জায়গায় পলিথিনের ব্যবহার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ গড়ে দৈনিক ২ কেজি করে প্লাস্টিক ব্যবহার করে এবং বর্তমানে এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে দেশে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য দাঁড়াবে প্রায় ১.৭ কোটি টন। ২০১৯ সালের জরিপ অনুযায়ী, বার্ষিক ৮৭,০০০ টন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। মাছের ওপর করা একটি গবেষণায় দেশের প্রায় ১৫ প্রজাতির মাছের শরীরে প্লাস্টিক পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বাদু পানির মাছে মাইক্রো প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সম্প্রতি দেশের বাজারে জনপ্রিয় ৫টি ব্র্যান্ড ও ২টি নন-ব্র্যান্ডের চিনিতে আশঙ্কাজনক মাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর পরিমাণ এতই বেশি যে, দেশের সমস্ত জনসংখ্যার দেহে শুধু চিনির মাধ্যমেই গড়ে প্রতিবছর ১০.২ টন মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা প্রবেশ করতে পারে।

স্বাধীনতার পরে দেশের পরিবেশের জন্য হুমকি হিসেবে নতুন সংযোজিত হয়েছে জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বেছে নেয়া জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে অস্বচ্ছতাকে পুঁজি করে এমনকি সুন্দরবনের পাশে সরকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প করতে যাচ্ছে, যা ইউনেসকো'র মতে বাংলাদেশের সুন্দরবনের, পাহাড়ের, বনের ও সমুদ্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে। মহেশখালীকেও ফেলা হয়েছে কয়লাবিদ্যুতের মারাত্মক ঝুঁকিতে। বায়ু দূষণের শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতেই যেন সরকার আরও ১৯টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যেগুলোর সবকটিই ঘনবসতিপূর্ণ বা কৃষিনির্ভর এলাকায়। এমন উন্নয়ন পরিবেশ রক্ষায় সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের পরিপন্থী এবং এসব প্রকল্প সরকারের একক সিদ্ধান্তেই গৃহীত হচ্ছে। জনমত যাচাই তো দূরে থাক, এমনকি বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করেই এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। দেশের রাজধানী ঢাকা ইতোমধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজধানীর শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছেছে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৮,০০০ হাজার মানুষের বসবাস! ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভারে ভারাক্রান্ত রাজধানী স্বাধীনতার সময় তিলোত্তমা নগরী হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে তা বিশ্বের সবচেয়ে অবসবাসযোগ্য নগরীর মধ্যে অন্যতম। একসময় যেখানে কৃষ্ণচূড়ার ফুটে ওঠা নগরবাসীকে বিমোহিত করত, সেখানে এখন কৃষ্ণচূড়া গাছ খুঁজতে হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বসবাসের জন্য আদর্শ একটি শহরের প্রতিটি বাসিন্দার জন্য কমপক্ষে নয় বর্গমিটার খোলা জায়গা থাকা দরকার। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০ হাজার মানুষ বাস করা ঢাকা শহরে সেই সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম, মাত্র এক বর্গমিটার। যেখানে প্রতিটি নগরীতে ২৫ ভাগ সবুজ থাকার কথা সেখানে ঢাকায় তা আছে মাত্র ২ ভাগ। জলজট, যানজট আর হর্ণের তীব্র শব্দের ঢাকায় অবাক করে দেওয়া কৃষ্ণচূড়া এখন আর আগুন লাগাতে পারে না, বরং প্রতিদিন ঐতিহ্যের আধার পুরনো

ঢাকায় একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অনিরাপদ এ নগরী যেন বৈষম্যের আধার। একটি বৈষম্যহীন দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম হলেও মহানগরের ৩৫ ভাগই বস্তিবাসী।

দেশের ভেতরে সৃষ্ট উপরের দুর্যোগ ছাড়াও বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে সৃষ্ট দুটো বড় বিপর্যয়ের করুণ শিকার। প্রথমটি হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে না পারার ফলে দেশের প্রধান নদীগুলোর পানি প্রবাহ আশংকাজনক মাত্রায় কমে যাওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন, যা দেশের ১/৩ ভূমি সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার মতো মারাত্মক আশংকা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার আগে এ দু'টি বিপর্যয় এতো প্রকট ছিল না।

পরিবেশ দূষণের এ ভয়াবহচিত্র আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অসংবেদনশীলতাকেই ইঙ্গিত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পেছনে প্রধান যে কারণগুলো রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা। যার ফলে পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষতির কথা নীতিনির্ধারণী মহলে তুলে ধরতে পারছে না, আর উন্নয়ন হচ্ছে বৈষম্যমূলক। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ছিল একটি বৈষম্যহীন, সাম্যভিত্তিক সমাজ, যা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পরিবেশের ক্ষেত্রেও অদূরদর্শী ও অসংবেদনশীলতার কারণে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইন হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু বিপর্যয় ও ওজন লেয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত হবার ঝুঁকি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা, অভিন্ন জলাশয়ের পানি ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিত রূপরেখা প্রণয়ন, বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় রাষ্ট্রীয় আইনের রূপরেখা প্রণয়ন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়গুলো রক্ষা করা, উন্নতবিশ্ব থেকে বর্জ্য পাচাররোধে করণীয় ইত্যাদি সংক্রান্ত।

পরিবেশ রক্ষার সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্ন্তজাতিক আইনে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। সে হিসেবে আর্ন্তজাতিক আইনের আলোকে দেশেও প্রণীত হয়েছে অনেক আইন। রাষ্ট্র সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এসব আইন বাস্তবায়ন করতে উদ্যোগী হলেও পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা যথেষ্ট ঘাটতি প্রতীয়মান। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বিষয়টিকে কেবল মাত্র বিনিয়োগের সুরক্ষা ঢাল হিসেবে কাগজে কলমে রাখা হয়।

গণতন্ত্র সংকুচিত হবার সাথে সাথে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রও সংকুচিত। আশংকার কথা, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবেশ বিধ্বংসী উন্নয়ন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলে পরিবেশবাদীরা, ন্যস্ত স্বার্থগোষ্ঠী এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থারও রোষানলের শিকার হচ্ছে।

দেশের ভিতরে সবচেয়ে দূষিত নদী, সবচেয়ে দূষিত বাতাস নিয়ে আমাদের পথচলা আর দেশের বাইরে থেকে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিন্ন নদীর একচেটিয়া পানি প্রত্যাহার দেশের পরিবেশকে মারাত্মক সংকটে ফেলে দিয়েছে। পরিবেশ রক্ষাকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করলেও রাষ্ট্র সেভাবে পরিচালিত হচ্ছে বলে উপরের দেওয়া তথ্যে তা প্রতীয়মান হচ্ছে না। সরকারের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনার উল্লেখ থাকলেও স্বাধীনতার সময় কোনো নদী, বন, পাহাড় যেমন ছিল বর্তমানে সেরকম আছে তা বলা যাবে না। বাংলাদেশের এমনকি পরিবেশ রক্ষায় পৃথক আদালতও রয়েছে যদিও তা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে ধীরগতির আদালত; সেখানে বছরে মাত্র সাতটি পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশ রক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

জিডিপির বৃদ্ধির প্রক্রিয়া যেমন কোনোভাবেই দেশের মানুষের সুস্থ পরিবেশের দাবিকে অবমূল্যায়ন করতে পারে না, তেমনি পরিবেশের অবক্ষয়রোধ করা না গেলে সংবিধানে স্বীকৃত জীবনের অধিকারও (Right to Life) অর্থহীন হয়ে পড়ে। আগে উন্নয়ন পরে পরিবেশ রক্ষা, উন্নত বিশ্বের আত্মঘাতী দর্শন জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। সরকারকে তাই উন্নয়ন নয় বরং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সরকার চাইলে ১০০টি কারখানা স্থাপন করতে পারে কিন্তু ১টি নদী বা ১টি পাহাড় সৃষ্টি করা যাবে না। দূষণ ও উন্নয়ন যে সমার্থক নয় তা বিভিন্ন দেশের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম থেকে আমরা শিখতে পারি।

যেহেতু পরিবেশের ক্ষতি অপূরণীয় এবং প্রায়শই সংশোধন অযোগ্য তাই উন্নয়নের দর্শনে জনমতকে প্রাধান্য দিতে হবে, যাতে উন্নয়ন পরিবেশবান্ধব ও সাম্যভিত্তিক হয়। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে পরিবেশ রক্ষাকে নিছক প্রতিশ্রুতি নয় বরং দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারে পরিণত করতে হবে। তবেই সোনার বাংলার প্রকৃত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, পরিবেশ আইনজীবী সমিতি

বাংলাদেশে ধর্ম, গণতন্ত্র ও জঙ্গিবাদ : কীভাবে এই পর্যায়ে এলাম?

মোবাশ্বার হাসান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপনের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে। যেমন, কয়েক কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে নিয়ে আসা। আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অনেক উন্নয়নশীল দেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো অর্জন আমাদের আছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালে সেটি দাঁড়িয়েছে ৪৭ দশমিক ২ বিলিয়নে। আমাদের এসব অর্জন নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, নিক্কেই এশিয়া টাইমস, ব্লুমবার্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রশংসিত হয়েছে। 'উজ্জ্বল ও উদীয়মান বাংলাদেশের গল্প' অক্সফোর্ড এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের সুশীল সমাজ এবং শিক্ষাবিদদের সমর্থন পেয়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমআইটি প্রেস বাংলাদেশের ৫০ বছর নিয়ে 'ইনোভেশন, টেকনোলজি, গভর্ন্যান্স : গ্লোবালাইজেশন' জার্নালে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

তবে এই 'উজ্জ্বল বাংলাদেশের' মধ্যে কিছু ঘাটতি রয়েছে। এটি আসলে দেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্রের আংশিক প্রদর্শন। এই গল্পে সমসাময়িক বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অনুপস্থিত। প্রথমত, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার উত্থান এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, যা প্রায়শই সহিংস চরমপন্থার চেহারা নিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাজনীতিতে কর্তৃত্বপরায়ণতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদের বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করেছে। আর ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, আইন প্রণেতা এবং এমনকি কিছু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যও প্রকাশ্য বিবৃতিতে সরকারি দলের বিরোধীদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক বৈধ রাজনৈতিক মতামত ও অভিব্যক্তিকে কখনো কখনো 'সন্ত্রাসবাদ' বা ইসলামবাদী সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সে কারণে, যখন ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশি নাস্তিক ব্লগার, লেখক এবং এদের প্রকাশকেরা আক্রান্ত ও হামলা এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছিল, তখন আমরা দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সংগঠনগুলো থেকে খুব কম প্রতিক্রিয়া দেখেছি। কারণ এই তত্ত্বে বিরোধীদলীয় সহিংসতা এবং ইসলামপন্থী সহিংসতাকে এক করে ফেলা হয়েছে। এর ফলে বর্তমান সরকারের স্বৈরাচারী শাসনকে ন্যায্যতা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

তবে, হলি আর্টিসান সন্ত্রাসী হামলার পর, সরকার জঙ্গিবাদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। সরকারি সংস্থাগুলো একটি অভূতপূর্ব ও আক্রমণাত্মক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করে। এই সময়ে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে আটক এমন কয়েকটি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। এতে সরকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমনে ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। তবে মানবাধিকারের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে। এছাড়াও, এই সময়ে একটি বা দুটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাও ছিল, যা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নজর এড়িয়ে যায়নি।

২০০৮ সাল থেকে দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুপস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নজীরবিহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান তিনটি অংশকে সাহায্য করেছে। তারা হচ্ছে আমলা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ব্যবসায়ী। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান কর্তৃত্ববাদকে ন্যায়সঙ্গত করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক আখ্যানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে সমস্যাটির কোনো সমাধান হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেনি। তাদের রাজনৈতিক চিন্তা ও মতামত প্রকাশের জায়গা কম। তাই তারা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কখনো কখনো চরমপন্থার আশ্রয় নেয়।

২০২২ সালে বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) প্রধান এবং খোদ র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা সম্ভবত যেসব আন্তর্জাতিক লবি সংস্থা, মুষ্টিমেয় আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ এবং সুশীল সমাজের লোকজন যে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখানো শুরু করেছিল, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে তাতে চিড় ধরবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এর ফলে গত ৫০ বছরের বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া বয়ান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নগরায়ণ, ধর্মপরায়ণতা, অসহিষ্ণুতা এবং বাংলাদেশি যুবকরা

সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে বিশ্বব্যাংক বলেছে যে, বাংলাদেশ বিশ্বকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। অনেক বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং জেফ্রি স্যাক্সের মতো বিখ্যাত অর্থনীতিবিদও এই সুরকে প্রতিধ্বনিত করেছেন। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের এক অদ্ভুত ধর্মীয়ভাবাপন্নতা ও নগরায়ণের দিকে ধাবিত করেছে। বাংলাদেশের পরিবর্তিত নগরায়ণ এবং দ্রুত ডিজিটাইজেশনও ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

একসময়কার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ও অনুন্নত অবস্থার জন্য পরিচিত দেশটি এখন দক্ষিণ এশিয়ার বাকি অংশের তুলনায় খুব দ্রুত নগরায়ণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এদেশের কৃষি খামার, মাঠ, বা পার্কগুলো ধীরে ধীরে অ্যাপার্টমেন্ট, সেতু, কারখানা এবং শপিংমলে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন একটি প্রকট সমস্যা হয়ে উঠছে। আমার 'ইসলাম ও রাজনীতি : দ্য ফলোয়ারস অব উম্মাহ (প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান ২০২০)' বইটিতে আমি কীভাবে শিল্পের উত্থান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এদেশে ধর্মীয় চেতনাকে আরও গভীর করতে ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা করেছি। উদাহরণস্বরূপ, এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৭০ সাল থেকে ধর্মীয় খাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ৬,৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে আজ পর্যন্ত, একটি ধর্মীয় ও নৈতিক সমাজ গঠনকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা আছে যে, "ধর্ম এমন একটি বিষয়, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিশে আছে এবং এটি নৈতিকতা বিকাশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব আমাদের অনেক মূল্যবোধকে ক্ষয় করেছে এবং মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়েছে, যা থামানো দরকার।"

সম্প্রতি প্রণীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শকে লালন-পালনের জন্য দেশের সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে ইসলামী এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত বই অধ্যয়নের বাড়তি সুযোগ দেওয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি প্রণয়ন করলেও ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে রেখেছে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মনিরপেক্ষতাকে (secularism) একটি ইসলামিক ধারণা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যা মানুষকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। দেশের অন্যান্য সরকারগুলোও–যেমন সামরিক শাসক এবং বিএনপি–ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল সমাজের জন্য বিনিয়োগ, প্রচার ও প্রসার করেছে।

বিএনপি নেতা এবং বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে শিল্পের উত্থান, হাজার হাজার গ্রামীণ শ্রমিককে শহরে নিয়ে আসার সূচনা করে। দিন দিন নগরায়ণ বেড়েছে, সাথে সাথে নতুন বাড়ি, নতুন কারখানা, নতুন দোকান, নতুন রাস্তা-ঘাট তৈরি হয়েছে। পোশাক রপ্তানিকারক এবং স্থানীয় শিল্পপতিসহ উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা তারা কখনই ভাবেনি যে একদিন তারা এতটা সম্পদশালী হবে। তারা এখনও নানাভাবে এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে। তাদের কেউ কেউ একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি করার আগে আল্লাহর আশীর্বাদ পেতে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ হজ করে আসেন। একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে নীতিগতভাবে ধর্ম সমর্থন করা কখনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়, তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয় বিনিয়োগে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ইসলামের উগ্র ও হিংসাত্মক দিকটি উন্মুক্ত করেছে।

এমতাবস্থায়, নগরায়ণের ফলে খেলার মাঠ এবং সামাজিক পর্যায়ে মেলামেশার জায়গা কমে যাচ্ছে, আবার সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতির কারণে বাংলাদেশ দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের সামাজিক আচরণেও পরিবর্তন এসেছে। এক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০০ সালের ৯৩,২৬১ থেকে ২০১৬ সালে ২১,৪৩,০৭০-তে পৌঁছেছে। এই ধরনের নগরায়ণ এবং ডিজিটাইজেশন-তরুণ জনসংখ্যায় ভরপুর একটি দেশের সামাজিক আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

গত তিন দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ বর্তমানে একধরনের 'তরুণ জনসংখ্যার সম্প্রসারণ (youth bulge)'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে ২৯.৬ মিলিয়ন বাংলাদেশির বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্য, যার ৪০ শতাংশের কোনো ধরনের শিক্ষা, চাকুরি বা প্রশিক্ষণ নেই। অর্থাৎ প্রায় ১১.৮ মিলিয়ন বাংলাদেশি যুবক কর্মহীন জীবন যাপন করছে। এমনকি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের একটি বড় অংশ বেকার হয়ে যেতে পারে; ২০১৪ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে প্রতি দশজন স্নাতক পাস শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঁচজন বেকার। এই বিষয়টির সাথে আরব বসন্তের আগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অবস্থার অনেক মিল আছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সরকারি বিনিয়োগের প্রভাব বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দিকে নিয়ে গেছে যেখানে নগরায়ণ, ডিজিটালাইজেশন এবং তরুণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একধরনের মিথস্ক্রিয়া তৈরি করেছে। গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সহিংসতা এবং কর্তৃত্বপরায়ণতা বোঝার জন্য সমাজের এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন এই বিষয়ে কিছু জরিপ তথ্য পরিদর্শন করা যাক :
২০০৯ সালে ৯৮% এরও বেশি বাংলাদেশি মুসলমান একটি গ্যালাপ (Gallup) জরিপে বলেছেন যে "ধর্ম তাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" কিছু জরিপে দেখা গেছে যে, ৮২% বাংলাদেশি মুসলমান শরিয়াকে দেশের সরকারি আইন করার

পক্ষে এবং ৭১ শতাংশ বলেছেন যে, তারা পারিবারিক এবং সম্পত্তির বিরোধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ধর্মীয় বিচারক চান। শরিয়া আইনের পক্ষপাতী মুসলমানদের পঞ্চাশ শতাংশ শারীরিক শাস্তিকে সমর্থন করেছিল (যেমন চোর ও ডাকাতদের হাত বেত্রাঘাত বা কেটে ফেলা) এবং ৫৫% ব্যাভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মারাকে সমর্থন করেছে। এদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে।

বাংলাদেশের আইন অনেকাংশেই শরিয়া অনুসরণ করে না এবং ৮৩% বাংলাদেশি বিশ্বাস করেন যে, শরিয়া আইন অনুসরণ না করা একটি খারাপ জিনিস। ২০০৬ সালের একটি Gallup জরিপে এটি প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অনেক বাংলাদেশি শরিয়া আইনকে রাষ্ট্রের আইনি কাঠামো হিসেবে চায়, যেখানে দেখা গেছে যে ৫২% বাংলাদেশি শরিয়াকে আইনের 'একমাত্র উৎস' হিসাবে দেখতে চায় এবং ৩৯% শরিয়াকে 'একটি উৎস' হিসেবে দেখতে চায়। এর অর্থ হলো, ২০০৬ সালে, ৯১% বাংলাদেশি চেয়েছিলেন দেশের সাংবিধানিক এবং আইনী কাঠামো ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে মিশ্রিত হোক। ওয়াশিংটন ভিত্তিক RESOLVE নেটওয়ার্কের দুটি গবেষণা সিরিজ এই দাবিটিকে আরও সমর্থন করে। ৪,০০০-এরও বেশি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে নেওয়া ডেটার ভিত্তিতে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। যদিও এই তথ্য সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এই জরিপের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যসমূহ ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং চরমপন্থার বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় পর্যায়ে ৪,০৬৭ জনের একটি জরিপ তথ্য ব্যবহার করে, গবেষক রিয়াজ এবং আজিজ দেখিয়েছেন যে ৬০% এরও বেশি উত্তরদাতারা ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে পাথর মারাকে সমর্থন করেছেন এবং ৭৮% বাংলাদেশে শরিয়ার ভূমিকাকে সমর্থন করেছেন। ফেয়ার ও আবদাল্লাহ (২০১৭) দেখিয়েছেন যে, যদিও বাংলাদেশে চরমপন্থীগোষ্ঠী এবং তাদের সহিংস কৌশলের জন্য সামগ্রিক সমর্থন কম, কিন্তু বিস্ময়কর সংখ্যক সচ্ছল এবং সুশিক্ষিত বাংলাদেশি কঠোর শরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সমর্থন করে। এ কারণেই ব্যাপক প্রচারিত শাহবাগ আন্দোলন মিডিয়ার অপ্রতিরোধ্য সমর্থন সত্ত্বেও যথেষ্ট জনসমর্থন অর্জন করতে পারেনি।

দৈনিক *প্রথম আলো* এবং অর্গানাইজেশন কোয়েস্ট (Org Quest) ২০১৩ সালের ৯ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত একটি সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষাটি ৩০টি জেলাকে সম্পৃক্ত করেছে, যার মধ্যে ৭৫০ জন শহর থেকে উত্তরদাতা এবং ২,২৫০ জন গ্রাম থেকে উত্তরদাতা রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে, ১,৪৮৮ জন মহিলা এবং ১,৫১২ জন পুরুষ। জরিপটি এমন এক সময়ে পরিচালিত হয়েছিল যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, টেলিভিশন ফুটেজে লোকেদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইতে দেখা গেছে এবং দেশের গান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চব্বিশ ঘণ্টা প্রচার করা হয়েছিল। জাতীয় দৈনিকে এমন শত শত ছবি প্রকাশিত হয়েছে। মিডিয়া-সমর্থিত একধরনের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের একটি আভা আপাতদৃষ্টিতে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। জরিপে দেখা গেছে যে, ৫৭.৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা শাহবাগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন না, ১৬.৭% বলেছেন যে, তারা শাহবাগ সম্পর্কে জানেন না এবং ২.৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা তাদের মতামত প্রকাশ করবেন না। মাত্র ২৩% বলেছেন তারা শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষে। শাহবাগের নেতৃত্বদানকারী ব্লগারদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের লেখার মাধ্যমে ইসলাম ও নবী মুহাম্মদকে বিক্ষুব্ধ করেছেন বলে প্রচারিত হলে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে তার গতি হারিয়ে ফেলে।

স্বাধীনতা, কর্তৃত্ববাদ এবং জঙ্গি সহিংসতা

বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ বিষয়টি জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কমে যাওয়া, স্বৈরাচারী আচরণ বেড়ে যাওয়া, হেফাজতে ইসলামের মতো ধর্মীয়-রাজনৈতিক ফোরামের উত্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নিম্নোক্ত ছকে বাংলাদেশে স্বাধীনতা হ্রাস এবং স্বৈরাচারী আচরণ বৃদ্ধি পাওয়ার দৃশ্যটি তুলে ধরেছে।

ইনডেক্স	র‍্যাংকিং /ক্লাসিফিকেশন	ইনডেক্স	র‍্যাংকিং /ক্লাসিফিকেশন
ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম	১৬২/১৮০	রুল অব ল ইনডেক্স	১৩৯ এর মধ্যে ১২৪তম
ফ্রিডম হাউজ	কিছুটা মুক্ত বা partly free	করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স	১৪৭/১৮০
ভি-ডেম	ইলেকটোরাল অটোক্রেসি	ডেমোক্রেসি ইনডেক্স (দি ইকনমিস্ট ম্যাগাজিন)	হাইব্রিড রেজিম

যেহেতু সরকার এখনও বিরোধীদলকে কোন স্থান দিচ্ছে না, এবং এদেশে সমালোচনামূলক রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ও ধর্মীয় অভিব্যক্তির প্রকাশ করা যায়, এর সুযোগ অনেক ইসলামপন্থীরা নিচ্ছেন। ২০১৭ সালে করা আমার একটি গবেষণায় বাংলাদেশি তরুণরা ইসলাম বলতে কী বোঝে তা বের করার চেষ্টা করেছি, কারণ বাংলাদেশি তরুণরা হোলি আর্টিসান-এর সন্ত্রাসী হামলাকে ইসলামের কাজ বলে অভিহিত করেছিল। আমি নিজে দেখেছি, ভালো মুসলিম বনাম খারাপ মুসলিম নিয়ে তরুণদের মধ্যে প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা চলছে, এবং অন্তত একটি ঘটনা পাওয়া গেছে যেখানে ভালো মুসলমান হওয়ার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে একজন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে মারা গেছে।

বিভিন্ন গবেষণায় বাংলাদেশে উগ্রবাদের কারণ হিসেবে কর্তৃত্ববাদ, মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, মতপ্রকাশে বাধা দেওয়া, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা, ও ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকা, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের বিস্তার, পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া ও কট্টরবাদীর সাথে সম্পর্কে জড়ানো, বৈশ্বিক ধর্মীয় উগ্রবাদের বিস্তার, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কম জানা, ইন্টারনেট লিটারেসি না থাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কিছু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা জঙ্গিবাদ এবং স্বৈরাচারের মধ্যে সমন্বয়ের একই ধরনের প্রবণতা খুঁজে পেয়েছে, যদিও তারা তাদের ফলাফল সরকারের কাছে প্রকাশ করেনি, কারণ সরকার তার স্বৈরাচারকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য 'সন্ত্রাস' কার্ড ব্যবহার করছে। এছাড়াও আমরা দেখেছি, পরলোকগত লেখক মোশতাক, কার্টুনিস্ট কিশোর এবং সাংবাদিক শহিদুল আলমের মতো উদারপন্থী বক্তা এবং ভাষ্যকারদের তাদের বক্তব্যের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, যা ধর্মীয় দলগুলোর বেশিরভাগই উপভোগ করেছিল। এই অসম ভারসাম্য ধর্মীয়ভাবে সংঘটিত সহিংসতাকে আরও গভীর করতে সাহায্য করেছে এবং আমরা সেই ২০১৩ সাল থেকেই বিভিন্ন জাল ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের উপর নিয়মিত আক্রমণ দেখেছি। এর অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান সম্পূর্ণরূপে স্বৈরাচারীকরণের সাথেই নিহিত, তবে এটা বলতে চাই যে, কর্তৃত্ববাদ এবং জঙ্গিবাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে এবং এর জন্য বাংলাদেশকে তার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মোবাশ্বার হাসান, এডজাংক্ট ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনি

"৩৯ বছর যাবৎ জনগণের
সেবায় নিয়োজিত"

স্বাধীনতা

- কোন প্রকার নিজস্ব চার্জ বা কর্তন ব্যতিরেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনে সম্পূর্ণ সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়
- নূন্যতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সঞ্চয়ে দুই মাস অন্তর মুনাফা ৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা

*শর্ত প্রযোজ্য

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক
www.nblbd.com www.facebook.com/NationalBankLimited

বিস্তারিত জানতে

স্বাধীনতা

- কোন প্রকার নিজস্ব চার্জ বা কর্তন ব্যতিরেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনে সম্পূর্ণ সঞ্চয় উত্তোলন করা যায়
- নূন্যতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সঞ্চয়ে দুই মাস অন্তর মুনাফা ৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা

*শর্ত প্রযোজ্য

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক
www.nblbd.com www.facebook.com/NationalBankLimited
বিস্তারিত জানতে

NexusPay
Means Everything

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-এর
NexusPay ও রকেট

ROCKET রকেট
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং
টাকার রকেট

এর মাধ্যমে ইউটিলিটি বিলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও টিউশন ফি পরিশোধ করা যায় যখন তখন, যেকোন স্থান থেকে

অ্যাপ ডাউনলোড করুন

Google play | App Store

For biller list please visit: **https://app.dutchbanglabank.com/DBBLWeb/MobileBiller**

বিস্তারিত জানতে আমাদের যেকোন শাখায়
যোগাযোগ করুন অথবা ডায়াল করুন

16216

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা যে কোন ফোন থেকে

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক
আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী

Trust
Sristi
Major Features
• Only for female customers
• Higher interest rate
• Monthly interest payable
• Interest payable on daily balance
• Free SMS & Internet Banking
EMPOWERING
WOMEN
Trust Bank
A Bank for Financial Inclusion
16201
TrustBankLtdBD
www.tblbd.com

সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসায়
জন্মান্ধ শিশু চোখের আলো ফিরে পায়

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের জন্মান্ধ শিশুর (০-৮ বছর)
চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ব্যাংক এশিয়া

জন্মান্ধ শিশুর চিকিৎসা সহায়তা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে
যোগাযোগ করুন ব্যাংক এশিয়ার যে কোন শাখা ও এজেন্ট পয়েন্টে

ডায়াল করুন: ০১৩১৩ ৪৪৭৭২৫, ০১৭৮৭৬৬৮৬৮২
ভিজিট করুন: www.bankasia-bd.com

ব্যাংক এশিয়া

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

facebook.com/shujan.bd | shujan.org || votebd.org